মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:

২১শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩২২। [১ম সংখ্যা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ .

২১শ ভাগ]　　　বৈশাখ, ১৩২২।　　　[১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ দেবতা, তোমার নিকট কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, হঠাৎ কিছুই হয় না। পৃথিবীর ভূকম্প ঝটিকা প্রভৃতি কিছুই তোমার নিকট আকস্মিক নহে, কিন্তু আমরা এ সকলই হঠাৎ জানিতে পারি এবং মহাবিপদ গণিয়া অন্ধকার দেখি। যে মহা ভূকম্পন তোমার নিত্যকালের জ্ঞানের অন্তর্গত কার্য্য, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যেন ইহা তোমার প্রেমস্বরূপের বিরুদ্ধ ঘটনা। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোড়িত করিয়া য়ুরোপের যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, যাহাতে মানুষের এতকালের অর্জ্জিত নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া মনুষ্যস্বভাবের পশুভাব সকলের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা দর্শন করিয়া সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত ও সমস্ত সাধু সজ্জন মর্ম্মাহত হইতেছেন। সকলের অন্তরে মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে—হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল, এতকাল যে প্রেমরাজ্যের আগমনের কথা শুনিয়াছিলাম তাহা কি মিথ্যা হইয়া গেল! তুমি মঙ্গলময়, প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে থাকিয়া তাহার মঙ্গল কর এবং সকল প্রকার অন্যায়, অসত্য, অপ্রেমকে পরাজিত করিয়া তুমি এখানে শীঘ্রই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে এই সকল আশার কথা কি কবির কল্পনামাত্র? আমরা নিরাশ হই, অন্ধকার দেখি; কিন্তু তুমি আপনার প্রেমানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বলিতেছ, কিছু ভয় নাই—এসকল মানবস্বভাবের মহাকম্পন ও অগ্ন্যুদগীরণ আমার ইচ্ছায় হইতেছে। আমি মানবস্বভাবের গভীরতার ভিতর হইতে স্বর্গের শোভা বাহির করিব, তাই এই আপাতভয়ঙ্কর ঘটনা সকল ঘটাইতেছি। পৃথিবী সত্যই আমার রাজ্য ও নরনারী সত্যই আমার সন্তান। হে দেবতা, তোমার অশব্দ বাণী শুনিয়া প্রাণে আশা হয় বটে, কিন্তু তুমি আমাদের অন্তর দেখিতেছ—পৃথিবী শ্মশান হইতে চলিয়াছে।

তোমার পুত্রগণের অন্তরে পশুভাব প্রধান হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। কোটি মাতা, লক্ষ লক্ষ প্রণয়িনী স্ত্রী, ভ্রাতৃবৎসলা ভগ্নী, বৃদ্ধ পিতা, অসহায় বালক বালিকা বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, দেবতা, কৃপা করিয়া তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সম্বরণ কর—কালানলসন্নিভ এই যুদ্ধানল নির্ব্বাপিত কর। য়ুরোপে শান্তিবারি বর্ষণ কর—পৃথিবীকে আশ্বস্ত কর। মা দয়াময়ী জননি. তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। নিজমুখে একবার বল, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

যুদ্ধ ও মাতৃজাতি।

মহাপ্রলয়ের কালাগ্নির ন্যায় যে যুদ্ধ য়ুরোপে উপস্থিত হইয়া শ্রীসম্পদ্‌শালী গ্রাম, নগর, প্রদেশ সকলকে সত্য সত্য শ্মশানে পরিণত করিতেছে, ইহাই নাকি মানবজাতির মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। দেশে অধিক দিন শান্তি থাকিলে নরনারী আরামপ্রিয় স্বার্থপর ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ না হইলে শান্তির মূল্য, প্রতিবেশীর সহিত গভীর সম্বন্ধ, আপনার প্রকৃত বল এ সকল কিছুই নাকি বুঝিতে পারে না। বিপদ উপস্থিত হইলে মানুষের অনেক বিষয়ে প্রকৃত দৃষ্টি খোলে এবং লুক্কায়িত শক্তি প্রকাশিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক উন্নতির ইতিহাসে ভূমিকম্প যেমন যুগে যুগে নূতন অবস্থা আনয়ন করিয়া উপকার করিয়াছে, অর্থাৎ এক এক মহাভূমিকম্প হইয়া সমতল ক্ষেত্র পর্ব্বত হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত সমুদ্র হইয়াছে, এমন কি সমুদ্রের গভীরতা পর্ব্বতের উচ্চতায় পরিণত হইয়াছে—সেইরূপ মহাযুদ্ধ সকল মানব স্বভাবের মহাকম্পন—এই মহাকম্পনে অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির হইয়া পড়ে ও হয়ত পূর্ব্বে যে শক্তি প্রকাশিত ছিল তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। সময়ে সময়ে এইরূপ মহাব্যাপার না হইলে পৃথিবী পুরাতন হইয়া যাইত, উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ হইত।

আমরা এ সকল মতামতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তবে বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের যেরূপ ব্যবহার হইতেছে এবং পৃথিবীর শান্তি রক্ষার উপায় যেরূপে নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, শান্তিরক্ষা করিতে হইলে শত্রুদমন করিতে দিবানিশি সশস্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে। সকল জাতিই যদি সকল স্থানে যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে ভয়ে কেহ আক্রমণ করিবে না এবং যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইবে। কিন্তু একথা কে না বুঝিতে পারে যে, সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করা প্রয়োজন হইলে সেই অবস্থায় উন্নতি চেষ্টা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ; এবং যে জাতি গোপনে গোপনে যত অধিক শক্তি লাভ করিতে পারিবে, সেই সাহস করিয়া অপেক্ষাকৃত

দুর্ব্বল প্রতিবেশীর রাজ্য আক্রমণ করিবেই। সশস্ত্র হইয়া কে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে?

যদি হেগনগরের মন্ত্রণা ও মধ্যবর্ত্তী সভা এরূপ নিয়ম করিতে পারিত যে, আর কোন দেশ স্থায়িভাবে সৈন্য রাখিতে পারিবে না, যদি কোন দেশ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সকল তাহার বিরুদ্ধ হইতে দৃঢ়নিষ্ঠ হইত—যদি সকল দেশকে আপনাদের দেশ জ্ঞান করিয়া এক দণ্ডবিধি সকল হত্যাকার্য্যে প্রয়োগ করা হইত, তাহা হইলে হয়ত যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেশের প্রধান মন্ত্রী সকল সে সত্য দর্শন করেন নাই। যিশুখ্রীষ্ট যে বলিয়া গিয়াছেন, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, কেহ এক গণ্ডে আঘাত করিলে তাহাকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিও, সে সকল উপদেশ ও পরামর্শ আজ পর্য্যন্ত বাতুলের প্রলাপমাত্র হইয়া রহিয়াছে। শাক্যসিংহ যে শান্তির কথা বলিয়া গেলেন—যে মৈত্রীতে জীবন যাপন করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন, তাহা কেবল উপদেশ দানের জন্য রাখা হইয়াছে, কার্য্যত পৃথিবীতে যিশুখ্রীষ্ট, কি শাক্যসিংহ, কি চৈতন্য ইঁহাদের কাহারও স্থান হয় নাই। ইঁহাদিগের জীবন ও শিক্ষা সকলই আজ পর্য্যন্ত বিফল হইয়া রহিয়াছে। যে বাইবেল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জর্ম্মনসৈন্য ঈশ্বরের নিকট শত্রু বিনাশের শক্তি প্রার্থনা করিতেছে, সেই বাইবেল হস্তে করিয়া ইংরাজ ফরাসী বেলজিয়ান্‌সৈন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জয় ভিক্ষা করিতেছে।

এখন ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত, ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রেরিতগণ নির্ব্বাসিত, এখন নীতি অগ্রাহ্য, এখন মানুষের স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলিও পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এত কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া যে সভ্যতা লাভ করা হইয়াছিল, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণকায় কাফ্রী গৌর বর্ণে চিত্রিত হইয়া য়ুরোপীয় পোষাক পরিধান করিয়া সেই দেশের লোক বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন; কিন্তু সময় আসিল, বর্ণ ধুইয়া গেল, বস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া ছিন্ন হইয়া গেল—সে যে কৃষ্ণকায় আফ্রিকার কাফ্রী, তাহা সকলে দেখিয়া ফেলিল। সেইরূপ অহঙ্কারী ক্রোধী লোভী হিংসুক মানুষগুলি দুই চারিটা জ্ঞানের কথা শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে প্রেমিক, বৈরাগী, নিরহঙ্কার বলিয়া পরিচয় দিতেছিল—সময় আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, কাকের ময়ূরপুচ্ছে শোভিত হইবার মত অবস্থা তাহাদিগের—বর্ত্তমান সময়ের সভ্যগণ অন্তরে প্রকৃত বর্ব্বর।

যে দুই পক্ষে যুদ্ধ হইতেছে তাহার মধ্যে জর্ম্মনপক্ষ যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সকলেই জানে; এবং মনে হয়, এই এক সাংঘাতিক পাপে জর্ম্মনজাতির ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হইবে। এখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, আজও [illegible]
কোথায় দেখা যাইতেছে না, তাহা দেখিয়া [illegible]

মাতৃজাতি একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া আছেন। এলা উইল কক্‌স্ নামক এক নারী কবি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকে যুদ্ধ ও নারীজাতি বিষয়ক একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, যদি যুদ্ধ করাই মানুষের জীবনের কার্য্য হয়, যদি মানুষের প্রাণ নাশ করিয়াই পৃথিবীতে গৌরব লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষালয়ে ধর্ম্মালয়ে প্রেমের প্রশংসা কেন করা হয়? আমরা মাতা, আমরা সন্তানগণকে শিক্ষা দান করি, প্রাণনাশ করা উচিত নয়—সকলকে ভালবাসা উচিত; অথচ দেশ তাহাদিগকে বলিতেছে, যত পার মানুষ মার! যদি এই ব্যবহারই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে কেন শিশুকাল হইতেই সন্তানদিগকে ব্যাঘ্রবৃত্তি শিক্ষা দান করি না? ফলে যুদ্ধ নৃশংসতা, মাতৃশিক্ষার বিরোধী, নীতি ও ধর্ম্মের বিপরীত।

এক যুদ্ধে উভয় পক্ষের মাতৃগণের মনে যে কি অপরিসীম দুশ্চিন্তা, ভাবনা-যন্ত্রণা হয়, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? বর্ত্তমান যুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় দুই কোটি সৈন্য উভয় পক্ষ হইতে প্রাণ দিতে ও প্রাণ নাশ করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। এই দুই কোটি সৈন্যের মধ্যে অন্তত এক কোটির মাতা জীবিত আছেন, এই এক কোটি মাতা আপন পুত্রের জন্য কি ভাবনা ভাবিতেছেন, কত ক্লেশ পাইতেছেন তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। যদি অন্তরের গভীর যাতনার পরিমাণযন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী দেখিতে পাইত যে, মাতৃজাতির মনে পর্ব্বতসম উচ্চ সমুদ্রের ন্যায় গভীর যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, ও তাহা পৃথিবীর কোন অগ্নি অপেক্ষা অল্প তপ্ত নয়। যদি মাতৃজাতি আপনার দেশের জন্য আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে সমর্পণ না করিতেন, যদি তাঁহারা অন্তরে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইতেন, তাহা হইলে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি বা ন্যায়রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ হইতেই পারিত না। এজন্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এই মহাযুদ্ধে মাতৃজাতি যত সাহায্য দান করিয়াছেন, এত আর কেহ করে নাই এবং তাঁহারা যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, এত কেহ করে নাই।

যখন আমরা মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক সদ্ভাবের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন অবশ্য দেখিতে পাই যে, হিংসা, বিদ্বেষ, হত্যা প্রভৃতি আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ, অন্তরের বিকার মাত্র। মাতৃজাতির স্বভাবের দিকে দৃষ্টি করিলে এই সত্য আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হয়। যাঁহারা আপন সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা অন্যের সন্তানের প্রাণনাশ করা কখনও ইচ্ছা করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল দেশে ও কালে আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় গৌরব রক্ষা, বৈরনির্য্যাতনের ভাব এত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ইহাদের প্রাবল্যে অন্তরের স্বাভাবিক প্রীতি, সহানুভূতি ও শান্তি-
[illegible] পায় না। যুদ্ধের সময় দেশে দেশে সৈন্যে সৈন্যে যে যুদ্ধ হয়
[illegible]। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে স্বাভাবিক

প্রীতি ও তাহার বিকৃতি বিদ্বেষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্রমে অন্তরের প্রীতির ভাব অস্তমিত হয় ও হিংসা বিদ্বেষই রাজত্ব করে। এই মহা দুর্গতি দূর করিতে কোন মানুষই সক্ষম নয়—আজ পর্য্যন্ত কত মহাত্মা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া নিরাশহৃদয়ে পলায়ন করিতে হইল। ফলে যাঁহারা স্বার্থ অভিমানে পূর্ণ, যাঁহারা ক্ষমা করিতে অক্ষম, তাঁহারা শান্তি ও প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না। সংসারে মাতৃজাতি একটা পৃথক্ জাতি, এই মাতৃজাতি যদি আপনাদের অন্তরের প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে একমন হন, তাহা হইলে আজই যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। কারণ মাতৃজাতি যদি আপন আপন সন্তানগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন, তবেই যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ ক্ষান্ত করেন; কিন্তু তাহা হইবার নয়। যুদ্ধ চলিতেছে ও চলিবে, মাতৃজাতি ভয়ঙ্কর মনোবেদনা সহ্য করিয়া সন্তানগণকে যুদ্ধে পাঠাইতেছেন এবং সকল সুখ শান্তি হারাইয়া মহা ভাবনায় দিন রাত্রি কাটাইতেছেন ও পুত্রশোকে আচ্ছন্ন হইয়াও দেশের গৌরবে গৌরব বোধ করিতেছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে জয়ের আনন্দ ও গৌরব অধিকাংশ পিতৃগণই লাভ করেন ও দুঃখ দুর্ভাবনার ভার অত্যধিক পরিমাণে মাতৃজাতি বহন করেন।

সম্প্রতি এক সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম, এক জর্ম্মণ সৈন্যাধ্যক্ষ এক পরাজিত বেলজিয়ানের গৃহে সদলে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র গৃহস্বামীকে আদেশ করিলেন, তোমাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। সে ব্যক্তি অসম্মতি জানাইতে সাহস না পাইয়া নীরব রহিল, এমন সময় তাহার স্ত্রী সেনাপতির নিকটে কাতর প্রার্থনা করিল যে, আমাদের ৮টি সন্তান, তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় নাই, আমার স্বামী চলিয়া গেলে ইহারা মারা যাইবে। সেনাপতি অমনই বলিল তার উপায় আমি করিতেছি, এই বলিয়া সৈনিকগণকে আদেশ করিল, আট জনকে হাত বাঁধিয়া দাঁড় করাও। আট জনকে আট জন হাত ধরিয়া দাঁড় করাইল, সেনাপতি তাহার পাঁচ জনকে গুলি করিয়া মারিল ও বলিল, এখন মাত্র তিনটি রহিল, ইহাদের ভার তুমি লও; এই বলিয়া তাহার স্বামীকে যুদ্ধের কার্য্যে লইয়া গেল। আমরা যুদ্ধের সংবাদ অল্পই পাইতেছি। তাহার মধ্যে এরূপ পাশবিক ব্যবহারের কথা আর পড়ি নাই বটে, কিন্তু এক মায়ের দুইটি সন্তান, দুটিই যুদ্ধে হত হইয়াছে, এক মায়ের পাঁচটি সন্তান যুদ্ধে গিয়াছে, একটিমাত্র জীবিত আছে ইত্যাদি ঘটনা সর্ব্বদাই শুনিতে পাইতেছি। যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া মানুষের মনের সকল দেবভাব, সভ্যতা, ভদ্রতা দূর করিয়া দিয়াছে বলিলে কিছুই বলা হয় না, মনুষ্যকে ব্যাঘ্র ভল্লুকে পরিণত করিয়াছে ইহাই বলিতে হয়। কি মহা মোহ বা মাদকতা উপস্থিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা আনয়ন করিল তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।

যে সকল জননী নিজ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দুঃখে অশান্তিতে দিন কাটান, তাঁহাদের সন্তানগণ যখন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষের প্রাণনাশের

গৌরব করে, তখন কি তাঁহারা সেই সকল হত সৈন্যগণের মাতৃগণের দুঃখ শোকের ভাবনা না ভাবিয়া তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারেন? তাহা কখনই সম্ভব নয়। জননী যে সর্ব্বত্রই জননী, ধনী গৃহের জননী যেমন আপন সন্তানকে প্রাণসম প্রেম করেন, দরিদ্রের কুটীরের জননীও সেইরূপই প্রেম করেন। এক পক্ষের মাতৃগণ যেমন সন্তানবৎসলা, বিরুদ্ধ পক্ষের মাতৃগণও ঠিক সেইরূপ। বিধাতার ব্যবস্থাতে নারী পুরুষকে অনেক দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন; এই যুদ্ধ নামক মহা মাদকের সাঙ্ঘাতিক দুর্দ্দশা হইতে এক মাতৃজাতিই নরজাতিকে উদ্ধার করিতে পারেন। যদি গৃহে গৃহে মাতা সন্তানকে আশৈশব অহিংসা শান্তভাব শিক্ষা দেন এবং যুদ্ধের তরঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইলেই যদি উভয় পক্ষের মাতৃজাতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, তাহা হইলে অচিরে এই অসভ্য ব্যাপার পৃথিবী হইতে চির বিদায় লয়। কিন্তু তেমন দিন কি হইবে?

স্ত্রীলোকের সদ্‌গুণ।

পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ অধুনা যেরূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার পক্ষে কল্যাণকর কিনা তাহা লইয়া অনেক আলোচনা ও মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই ভারতবর্ষে আদি যুগে বেদ এবং পুরাণাদিতে নারী-চরিত্রের যে আদর্শ দেখিতে পাই, বর্ত্তমান যুগে সে আদর্শের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বেদের মধ্যে গার্গীর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা, সে যুগের স্ত্রীগণকে আমরা তপস্যা এবং সত্যের এক উন্নত আদর্শলোকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আধ্যাত্মিক সম্পদে সেখানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ নাই—উভয়েই এক সত্যলোকের সহযাত্রী। পুরাণে সেই তাপসী নারীকে আমরা সংসারে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাই। সেখানে তাঁহার আদর্শরূপ কি? একদিকে তিনি শক্তিরূপিণী, অসুরসংহারিণী, অন্যদিকে তিনি অন্নপূর্ণা সংসারপালিনী বিশ্বজননী। ভারতবর্ষ চিরদিন নারীকে শক্তি ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজা করিয়াছেন। কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের সহিত রুচি এবং শিক্ষার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ যে আদর্শ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বলোকে মানবের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবেই হইবে।

ইয়ুরোপের বিখ্যাত লেখক, মনীষী, রাস্‌কিন্ স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিতরে ভারতবর্ষের কথার প্রতিধ্বনি অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। রাস্‌কিনের "ধূলি নীতি" (Ethics of the dust) নামক একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকখানি তিনি 'গৃহলক্ষ্মী' গণকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় মানব-চরিত্রের ভিতরে তাঁহার কিরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। এই পুস্তকখানির ভূমিকায়

তিনি লিখিয়াছেন—এক সময়ে একটী গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয়ে যাইয়া বালিকাদিগকে লইয়া নানা বিষয়ে গল্প করিতেন। বালিকারা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিত এবং তাহারা অসঙ্কোচে তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিত এবং তিনি তাহার উত্তর দিতেন। পুস্তকখানি তাহারই স্মৃতি লইয়া রচিত। এক বৃদ্ধ অধ্যাপক—রাসকিন্ নিজে—তাঁহার ছাত্রীদিগকে লইয়া সন্ধ্যার অবসরে বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। বালিকাদিগের সরল ঔৎসুক্য এবং বৃদ্ধ অধ্যাপকের সরস কথোপকথনে এই পুস্তকখানিকে অত্যন্ত মনোরম করিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি স্ত্রীলোকের সদ্‌গুণ বিষয়ে যে পরিচ্ছেদটী লিখিয়াছেন, তাহাতে নারীকে তিনি কি আদর্শে দেখিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিচ্ছেদটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ;—

বৃদ্ধ অধ্যাপক একদিন তাঁহার ছাত্রীগুলিকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসিয়াছেন। আলো জ্বলিতেছে, গৃহসংলগ্ন চুল্লীতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার মৃদু উত্তাপে গৃহটি আরামদায়ক হইয়াছে এবং সেই নিভৃত কক্ষটির মধ্যে মেয়েরা তাঁহাকে ঘেরিয়া সভা করিয়া বসিয়াছে। সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল "গৃহলক্ষীর কি বিশেষ সদ্‌গুণ থাকা উচিত ;" ছাত্রীরা অধ্যাপককে ধরিয়া পড়িল এবিষয়ে নূতন কিছু বলিতে হইবে। তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—মেয়েদের প্রথম গুণ নাচিতে জানা। ছাত্রীদলের মধ্যে মহা আপত্তি উঠিল, এমন গম্ভীর বিষয় লইয়া এরূপ ব্যঙ্গ করাতে সকলেই অধ্যাপকের উপর বিরক্ত হইল। তখন অধ্যাপক তাহাদিগকে তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন ; নৃত্য করা অর্থে ইহা নয় যে মেয়েদের বল্ (Ball)এ গিয়া নাচিতে হইবে, এ নৃত্য আনন্দের নৃত্য। নারী এমন আনন্দময়ী হইবেন যে তিনি যেখানে থাকিবেন আনন্দের উৎস সেখানে খুলিয়া যাইবে। এ আনন্দ নারী কোথায় পাইবেন? যখন তাঁহার বাহিরে ও অন্তরে তিনি কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তখনই তিনি এই আনন্দের অধিকারিণী হইবেন।

প্রশ্ন হইল—কিন্তু সকলেই অন্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে অবসাদ অনুভব করিয়া থাকে, এরূপ কেন হয়?

উত্তর হইল—অবসাদ আসিতে পারে, কিন্তু কেন আসে? হয় নিজের দোষে, না হয় অন্যের দোষে। যে দেশের তরুণ বালিকাদিগের মুখে আনন্দের হাসি নাই, সে দেশ বড় অপরাধী। যে দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপদেশে এবং কবিগণের বীণাঝঙ্কারে কেবল দুঃখের বিলাপধ্বনি বাজিতেছে, সে দেশ হাসিতে ভুলিয়া যায়। ধন্য সেই দেশ, যাহার ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও কাব্যে, সকল সুখ দুঃখের উর্দ্ধে, আনন্দের জয়ধ্বনি বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় গুণ—সুশোভনা হইতে শিক্ষা করা। ইংরাজী dressing

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ছাত্রীরা অনেকেই উত্তর করিল, dressing অর্থ উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিতা হওয়া।

অধ্যাপক বলিলেন, এইখানেই ভ্রম। যদি কেহ চিত্রকর অর্থে কেবল এই বোঝে, যে ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর চিত্র কিনিয়া ঘর সাজাইতে পারেন তিনি চিত্রকর, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই অর্থভ্রম ঘটে। সুপরিচ্ছদধারিণী অর্থে যিনি সুপরিচ্ছদ-সৃজনে নিপুণা। যিনি নিজেকে সুন্দর রাখিতে জানেন এবং অন্যকেও সুন্দর করিতে পারেন।

প্রশ্ন হইল—সুন্দর হওয়া অর্থে অন্যের চক্ষে নিজেকে সুন্দর দেখান, এরূপ ভাব ভাল কি?

উত্তর হইল—এরূপ ভাব মন্দই বা কিসে? পুষ্পগুলি যখন ফুটিয়া উঠে, সে সৌন্দর্য্য কাহার জন্য? সেই সৌন্দর্য্যের আলোকে অপরের মন মুগ্ধ হইবে, আনন্দিত হইবে। তাহাই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা। নারীও পুষ্পের মত হইবেন। তাঁহার শোভা, সজ্জা পুষ্পের মত পবিত্র, সুশোভন ও আড়ম্বরহীন হইবে। তিনি মনে মনে জানিবেন যে তাঁহার শ্রী এবং সৌন্দর্য্য তাঁহার চারিদিগের সকলের মনে আনন্দের হিল্লোল জাগাইয়া তুলিতেছে। এ জ্ঞান তাঁহার মনে গর্ব্ব আনিবে না, মোহ আনিবে না, কিন্তু গভীর নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

তৃতীয় এবং শেষ গুণ—রন্ধনে পারদর্শিনী হওয়া। রন্ধন শাস্ত্রের সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। সকল প্রকার শাক শবজি, তরি তরকারী, ফল মূল, মৎস্য মাংস, ইত্যাদি আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কোন্ বস্তুর কি গুণ, কি দিয়া কি রন্ধন করিলে রসনার উপাদেয় এবং শরীরে প্রাণসঞ্চারক হয়, তাহার শাস্ত্র জানা প্রয়োজন। পাতা লতা শিকড়ের ভিতরে কোথায় কি শক্তি রহিয়াছে, যাহাতে শরীরের ব্যাধি যন্ত্রণা দূর করিয়া দিতে পারে, সেই প্রাচীন কালের পিতৃপিতামহীগণের সহজলব্ধ চিকিৎসাজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞানকে মিলাইয়া লইতে হইবে। গৃহকর্ম্মে যত্ন, ধৈর্য্য ও উদ্ভাবনশক্তিসম্পন্না হইতে হইবে। অপব্যয়হীনা এবং সংযমশুদ্ধচারিণী হইতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে; এক বাক্যে গৃহলক্ষ্মীগণ রন্ধনে দ্রৌপদী, সেবায় অন্নপূর্ণা এবং নৈপুণ্যে সরস্বতী হইবেন।

এইগুলি বাহিরের গুণ। রাসকিন্ আধ্যাত্মিক গুণ ও শিক্ষার বিষয় অনেক লিখিয়াছেন। রাস্কিন একদিকে যেমন উদারচেতা অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শক্তি ও প্রেমের উপাসক। ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি যাহা কিছু তিনি আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার উদার-প্রেম, এবং সতেজ সত্যপরায়ণতা প্রকাশ পায়।

তিনি নারীজাতির অধ্যাত্মজীবনসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

আমি মিস্ মার্চ্চের নিকট একলা রহিয়া গেলাম। জনের হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

"মিষ্টার ফ্লেচার, আমি কি উঁহাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি?"

"না।"

"তবে তিনি চলিয়া গেলেন যে?"

আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, সুতরাং স্পষ্টই বলিলাম, "কি কারণ তাহা আমি জানি, এবং বলিতেও পারি, কিন্তু জন নিজে বলিলেই ভাল হইবে।" মিস্ মার্চ্চও কিছু বলিলেন না, বন্ধুর মত অন্যান্য অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। জন সমস্ত দিন বাড়ী ফিরিল না, আমাকে একলা আহার করিতে হইল। যাহাকে আমি ভাই ও বন্ধু বলিয়া আজ দু বৎসর ভালবাসিয়া আসিতেছি, তাহাকে কি আর সাহায্য করিতে পারি না? ভাগ্যদোষে এ অবস্থায় আমি শক্তিহীন; আমি আর তাহাকে সান্ত্বনাও দিতে পারিলাম না, এবং তাহাকে বেদনা হইতে বাঁচাইবার শক্তিও আমার ছিল না। আমার মনের অবস্থা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিতে পারিবেন। যে সকল পিতা মাতাকে তাঁহাদের পুত্রের সম্বন্ধে, ভগ্নীকে ভাইয়ের সম্বন্ধে, বন্ধুকে বন্ধুর সম্বন্ধে, এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে, তাঁহারা ধীরভাবে ইহার ভিতর দিয়া যাইতে শিক্ষা করুন; যাঁহারা কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা পুরাতন সম্বন্ধকে নূতনের যোগে আরও মধুর করিয়া তুলুন। আমি মনে মনে এই সব কথা ভাবিয়া স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিব না।

বৈকাল বেলা একটী অতি সুন্দর গাড়ী দরজায় উপস্থিত হইল এবং সহিস মিস্ মার্চ্চের নামে একখানি চিঠি দিল। সে সময় জন বাড়ী ছিল না বলিয়া আমি খুব সুখী হইলাম, এবং গাড়ী খানি কোন লোককে না লইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল দেখিয়া খুব আনন্দ হইল।

আমি জানলায় বসিয়া বাহিরের গাছ দেখিতেছি, প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল; এমন সময় দেখি জন বাড়ী ফিরিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম গিয়া দরজার কাছে দেখা করি, আবার কি ভাবিয়া ঘরের আগুন ভাল করিয়া খুঁচাইয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম।

"কি উজ্জ্বল আগুনের তেজ! তুমি খেয়েছ তো? আশা করি আমার জন্য অপেক্ষা কর নি; আমি এতদূর বেড়াইতে গিয়াছিলাম, এখন ভয়ানক ক্লান্তি বোধ হইতেছে।"

জন সমস্ত দিনের পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্যের গল্প করিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

চা খাবার পর তাহাকে আমার আরাম কেদারাতে বিশ্রাম করিতে বলিলাম; "ঠাণ্ডাতে এতদূর বেড়াইয়া নিশ্চয়ই তোমার শরীর হিম হইয়া গিয়াছে।"

"একটুও না, আমার হাত ছুঁইয়া দেখ তো।" তাহার হাত যেন জ্বলিতেছিল। "কিন্তু আমি একেবারে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি।" এই বলিয়া সে কেদারায় চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"ভাই জন, তুমি একলা বেড়াতে গেলে কেন? আমি তো সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত থাকি।"

জন হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার সে হাসি নিমেষের মধ্যে মিলাইয়া গেল। হায়! জন শুধু আমাকে লইয়া এখন আর সুখী হইতে পারে না।

আমরা উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি জানিতাম সময় হইলে সে নিজেই তাহার মনের কথা আমার কাছে বলিবে। এখন হঠাৎ বলিলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে সাহস করিতেছে না।

নয়টার সময় খাইতে বসিলে শ্রীমতী টড আসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন, তিনি সমস্ত দিন মিস্ মার্চ্চের জিনিষ পত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। কে জানিত যে মিস্ মার্চ্চের এত বড় লোক আত্মীয় আছেন। লডী কেরোলাইন মিস্ মার্চ্চকে লইয়া যাইবার জন্য যে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছিলাম। মিস্ মার্চ্চ তখন গেলেন না, কিন্তু এখন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি কাল যাইবেন।

জন ঘরের দরজা বন্ধ করিতেছিল। যতক্ষণ শ্রীমতী টড ঘরে ছিলেন ততক্ষণ সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু তিনি বাহির হইবামাত্র হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

এখন নিজেই ধরা পড়িল। প্রকৃত ভালবাসা—যাহা কল্পনা নয়—সকলেই এক সময় না এক সময় তাহার আস্বাদ পাইয়াছে, জনও তাহার ফাঁদে পড়িয়াছে। সে যে এখন মহা সংগ্রামে পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কোন উপায় করিতে পারিলাম না। দুজনেই যেন বিপদে পড়িলাম।

তারপর আমি বলিলাম, "ডেবিড!"

"কি?"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"হাঁ।"

"তুমি যদি খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বল, তাহালে হয়তো তোমার মন হালকা হইতে পারে।"

"অন্য সময়, এখন আমায় একটু বাইরে যেতে দাও, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

সে টুপিটা খুলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি সঙ্গে যাইতে সাহস করিলাম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বাহির হইলাম, ভাবিলাম যেখানে জন রোজ বেড়ায় সেখানেই আছে, কিন্তু সেখানে গিয়া পাইলাম না; হঠাৎ মনে হইল শ্রীমতী টড বলিয়াছিলেন, অন্ধকারে এই যায়গা বিশেষ নিরাপদ নহে, অনেক গর্ত্ত ও অসমতল যায়গা আছে। আমার মনে কি রকম ভয় হইল। আমি জনের নাম ধরিয়া চিৎকার করিতে করিতে পাগলের মত ছুটিলাম; হঠাৎ সেওলাতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। কে দূর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমায় উঠাইল।

"ও ডেবিড—ডেবিড!"

"ফিনিয়স—তুমি? এই ভয়ানক রাতে তুমি কেন বেরিয়েছ?"

জনের এই অবস্থাতেও আমার প্রতি ভালবাসা—আমার বাঁধ ভাঙ্গিল। আমি নিজেকে ভুলিয়া গিয়া ডেবিডের কাঁধে মাথা রাখিয়া খুব কাঁদিলাম।

আমার কান্না জনের মনে একটা বল আনিয়া দিল। জন মনের মত বন্ধু—যার ভালবাসা স্ত্রীলোকের ভালবাসা হইতে অনেক গভীর—সে ভালবাসার অধিকারী হওয়া যে কত সুখের, তাহা যেন সে বুঝিতে পারিল।

"আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু আমি আমাতে ছিলাম না। এখন অনেকটা ভাল মনে হইতেছে। চল ফিরিয়া আমরা বাড়ী যাই।"

আমাকে গরম রাখিবার জন্য আমাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া জন বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া আগুনের পাশে বসিয়া আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। জনের মুখ বিবর্ণ দেখাইতেছিল, কিন্তু সে যে অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে তাহা বেশ বোঝা গেল। সে নিজেই মিস্ মার্চ্চের কথা আরম্ভ করিল।

"ফিনিয়স, তিনি কাল যাচ্চেন?"

"মনে তো হয়। তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে চাও?"

"তিনি যদি ইচ্ছা করেন।"

"তুমি কি তাঁহাকে কিছু বলিবে?"

"কিছুই না। ওসব কথা কল্পনা করাও আমার অন্যায়।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম; এ কথার উত্তর আর কি আছে? কথাগুলি খুব শান্ত ভাবে উচ্চারিত হইল, কিন্তু সেটুকু বলিতে জনের কত শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল।

"তিনি কি তোমায় কিছু বলিয়াছিলেন? আমি আজ সকালে হঠাৎ কেন চলিয়া গেলায়, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, আমি বলিলাম, তুমি নিজেই তাহার কারণ বলিবে।"

"আমি বলিব। আমি যে গরীব, তাহা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব। আমার সব

কথা বলিব—কেবল একটী কথা ছাড়া। সে কথা তিনি কখনও জানিতে পারিবেন না।”

সে কথাটী যে কি তাহা আমি জনের কথার ধরণেই বুঝিতে পারিলাম, যে কথাটী জন উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল; তাহা যে প্রকৃত নারীর কাছে কত মূল্যবান। আমার মিস্ মার্চ্চের জন্য দুঃখ হইল, জন নিজের ভালবাসার কথা তাঁহাকে বলিবে না।

“ফিনিয়স, তুমি কি প্রকাশ না করাই ঠিক মনে কর না?”

“হয়তো—কি জানি। তুমি নিজেই ভাল বুঝিবে।”

“ইহা স্থির, আমার নীরব থাকা ছাড়া আর কোন আশা নাই।”

জনের মত অল্প বয়সের ছেলের পক্ষে ইহা কেন যে অসম্ভব তাহা আমি বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু আমার এ সব বিষয়ে হাত দেওয়াতে অপকার ও অন্যায় হইতে পারে ভাবিয়া আমি সম্পূর্ণ ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিলাম।

হঠাৎ জন বলিল “ফিনিয়স, ভাই, তুমি মনে করো না যে ইহার জন্য তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কমিয়া গিয়াছে; হয়তো তুমিও একদিন আমার অবস্থায় পড়িবে, তখন বুঝিতে পারিবে” বলিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার সমস্ত ব্যথা দূর হইয়া গেল।

সে রাত্রে আমরা যে ভাবে বিদায় লইলাম, তাহাতে মনে হইল, আমাদের বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এখন যে পরীক্ষাই আসুক, আমাদের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবে না।

তার পরদিন আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। জন আজ গম্ভীর, তার ছেলে-খেলার দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল।

আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে মিষ্টার মার্চ্চের গোরের কাছে আসিলাম। কে যেন সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। জনের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া লোকটী যে কে আমার বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল। জনের মুখ হঠাৎ সাদা হইয়া গেল। জনের ভালবাসা যে কত গভীর হইয়াছে। হায় ইহা কি শুধু অভিশাপের মত হইয়া থাকিবে?

“জন, আমরা কি অন্য ধারে যাব? তিনি বোধ হয় শীঘ্রই চলে যাবেন।”

“কখন?”

“অপরাহ্নের পূর্ব্বে। এস ডেবিড।”

জন আমার হাতে হাত দিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু একটুক্ষণ পরেই হাত ছাড়াইয়া লইল।

“ফিনিয়স, আমি পারছি না; যাবার আগে একবার ভাল করে দেখে নিতে দেও।”

আমরা আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে জন চলিতে

আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জন, আর বেড়াইতে যাইবে কি?" জন আমার কথা শুনিতে পাইল না, আমি তাহাকে একলা ছেড়ে দেওয়াই ভাল বিবেচনা করিলাম।

জন তাড়াতাড়ি নামিয়া কুটীরের দ্বারে আসিল। মিস্ মার্চ্চ গোলাপ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া একটী গোলাপ পাড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া নমস্কার করিলেন।

"সমস্ত গোলাপগুলি শুখাইয়া গিয়াছে।"

"ঐ অনেক উপরে একটী রয়েছে, পেড়ে দেব কি?"

জনকে এত সহজভাবে মিস্ মার্চ্চের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া আমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল।

"ধন্যবাদ—ঐ একটীই যথেষ্ট। আজ গোলাপ কুটীর ছেড়ে যাচ্ছি, তাই একটী সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"হাঁ শুনলাম তাই।"

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিলাম।

"মিস্ মার্চ্চ, আপনি যেখানেই থাকুন আপনার মঙ্গল হউক।"

"ধন্যবাদ, মিষ্টার ফ্লেচার।"

যেরূপ গম্ভীর ভাবে আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, তাহাতে মনে হইল যে, যেন আমরা তিনটী বৃদ্ধ—সংসারে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কথা বলিতেছি।

"আমি এখানে একেবারে একলা পড়িয়াছি। আমার আত্মীয়া লেডী কেরোলাইন বেশ ভাল লোক, তাই তাঁর কাছে গিয়া কিছুদিন থাকিব স্থির করিয়াছি।"

আমি মিস্ মার্চ্চের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করিলাম। জন চুপ করিয়া জানালায় বসিয়াছিল, কেবল এক একবার মিস্ মার্চ্চকে দেখিতেছিল; হায়! মিস্ মার্চ্চ যদি তাহার দৃষ্টি দেখিতেন।

"আশা করি আপনাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। আপনারা আমার যত উপকার করিয়াছেন, আমি কখনও সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। যদি লেডি কেরোলাইন আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, আশা করি, আপনারা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন।"

আমরা উভয়ে কোন উত্তর দিলাম না। মিস্ মার্চ্চ যেন একটু আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু জনের দিকে তাকাইয়া আবার নরম হইয়া গেলেন।

"মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আমি তো আমাদের আত্মীয়দের বিষয় বিশেষ কিছু অবগত নহি, আপনি তো তাঁহাদিগকে বেশ জানেন, তাঁহাদের সহিত আপনাদিগের আলাপ হইলে কি আপনাদের মানহানি হইবে?"

"তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতে বিশেষ উৎসুক হইবেন না।"

"কেন আপনারা বড় লোক নন বলিয়া ? নাই বা হলেন। আমার বন্ধুরা তো ভদ্রলোক।"

"মিষ্টার বার্থউড ও অন্যান্য অনেকে আমাদের ভদ্রলোক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন।"

"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"হাঁ তাহা আমারই দোষ, এ বিষয়ে আমার আপনাকে আগে জানান উচিত ছিল। আপনি আমাকে আপনার সমান ভাবিয়া সম্মান দিতেছেন, কিন্তু আমার পরিচয় ভাল করিয়া পাইলে বোধ হয় দিতে সঙ্কুচিত হইবেন। সমাজ আমাদিগকে সমান ভাবে লইবে না। আপনি উচ্চবংশের মেয়ে, আমি সামান্য ব্যবসাদার। আমি চামড়ার ব্যবসা করি, ফিনিয়সের বাবার কেরাণীমাত্র। ছয় বৎসর আগে আমি নরটনবারীতে ভিখারীর বেশে আসিয়াছিলাম। ফিনিয়স আমাকে মৃতপ্রায় পাইয়াছিল। সেদিন খুব জল পড়িতেছিল, আমি মেয়ারের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম; এমন সময় মেয়ারের বাড়ীর একটী ছোট মেয়ে এক টুক্‌রা রুটী ফেলিয়া দিল।"

মিস্ মার্চ্চ চমকাইয়া বলিলেন, "সে কি আপনি ?"

"হাঁ সে আমি। সে মেয়েটীর দয়ার কথা আমি কোন দিনও ভুলি নাই। যখনই অন্যায় করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখনি তাহার ভালবাসার কথা মনে করিয়া থামিয়া গিয়াছি। আমার যে তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হইয়াছে সেজন্য আমি সুখী, তাঁহার যে অল্প কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি সেজন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি। তাঁহার কাছে এখন বিদায় চাই, হয়তো আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না।"

মিস্ মার্চ্চ জনের কথা শুনিতে শুনিতে হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিলেন; এখন মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন সাক্ষাৎ হইবে না ?"

"আমি ও আপনি সমান পদের লোক নই, সেজন্য আমাদের একত্র মিলিতে দেখিলে লোকে নিন্দাই করিবে।"

মিস্ মার্চ্চ কোন কথাই বলিলেন না, কেবল বিদায় লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন।

"মিস মার্চ্চ, আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় আর দেখা হইবে না, আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি ? যে হাতে আমার জন্য আপনার জন্মের মত দাগ রহিয়া গিয়াছে তাহা কি দেখিতে দিবেন ?"

জন হাতখানি তুলিয়া ধরিল। মিস্ মার্চ্চ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন।

পর মুহূর্ত্তেই জন অদৃশ্য হইল।

মিস্ মার্চ্চ সেদিনই চলিয়া গেলেন, আমরা এনডারলীতেই রহিলাম।

(ক্রমশঃ)

দুঃখ ও বিপদ্‌।

(অনুবাদিত)

যখন দুঃখ ও বিপদ আসে, ভীত তাহা এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে সহজেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

দুঃখ বলিয়া কোনও বস্তু নাই। আমাদিগের অন্তরের বাহিরে বা আমাদিগকে ছাড়িয়া উহার কোনও অস্তিত্ব নাই; অজ্ঞতার ফলে অন্যান্য কষ্টের ন্যায় আমাদিগের মনের মধ্যেই উহার জন্ম, অর্থাৎ নিজের দুঃখ আমরা নিজেরাই সৃজন করি।

বুঝিবার ও বিচার করিবার শক্তির দ্বারা জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইলে মনের এই কল্পিত ভাবকে দূর করা আয়াস সাধ্য নহে।

যেমন দেখা যায় যে, একটী বালকের পক্ষে হয়ত কোন একটী অপঠিত সরল পাঠও অতি কঠিন ও দুরায়ত্ত, সে সেই পাঠ দেখিয়া ভীত হয় ও ক্রন্দন করে; কিন্তু তাহার অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীর বালকের পক্ষে উহা আর কঠিন বলিয়া বোধ হয় না, কেন না সে ঐ পাঠ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে পাঠ কঠিন নহে, কিন্তু বালকের অজ্ঞতায় উহা কঠিন হইয়াছে।

এইরূপে বুঝিবার অভাবেই জীবনে দুঃখ ও বিপদ কঠিন ও দুঃসহ বলিয়া মনে হয়।

জীবনে যে সকল কঠিন অবস্থা সমূহ আমাদিগের সম্মুখে আসে, তাহা আমাদের প্রয়োজনীয়; সেই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া আমরা নানা শিক্ষালাভ করি এবং অজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতার অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবনপথে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারি।

কষ্ট দূর করিবার ও কষ্টে পতিত হইবার অনেক পথ আছে, এক প্রকার কার্য্যের অনুসরণ ফলে বাধা বিপত্তির উদয় হয় এবং অপর কার্য্যের দ্বারা বিপদকে অপসারিত করা যায়। যেমন পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণকারী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিবার জন্য ভীত ও নিশ্চেষ্ট না হইয়া সরল পথ অন্বেষণ করে; সেইরূপ যখন কেহ এমন কোন বিপদে পতিত হয়, যাহা সহজে অতিক্রম করা যায় না, সেই সকল বিপদে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন না হইয়া ধীরভাবে নিজ চিন্তা ও কার্য্য বিচার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য অনুসরণ করিলে বিপদে অভিভূত হইতে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে যখন কেহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে এবং ঋণমুক্ত হইবার উপায় খুঁজিয়া পায় না, এইরূপ অবস্থায় ঋণী যদি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন—বুঝিবেন যে একটু আত্মত্যাগ ও বিবেচনার সহিত চলিলে ঋণজালে জড়িত হইতেন না, এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন যে, পরিমিত ব্যয়, স্বার্থত্যাগ, দীনতা ও বিবেচনার দ্বারা তিনি সহজেই বিপন্মুক্ত হইতে পারেন; এই প্রকারে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার পথে থাকিয়া তিনি যে কেবল অবস্থাকে জয় করিলেন তাহা নহে, পরন্তু জ্ঞানী ও আত্মজয়ী হইলেন।

দুঃখ ও বিপদ্ যে কোন মূর্ত্তি ধরিয়াই আসুক, একটু বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিলে সহজেই উহাদিগকে পরাজয় করা যায়। এই অবস্থায় ব্যস্ততা, ভাবনা ও দুশ্চিন্তার দ্বারা হৃদয়ের শান্তি ও অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া যায় এবং বিপদ আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে।

যখন কোন বাধা বিপত্তি বহু আয়াসেও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়, তখন তাহা ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ সাধ্যাতীত বিষয়ে কষ্ট করায় লাভ নাই। অনিবার্য্য অবস্থা ধৈর্য্য সহকারে বহন করাই কর্ত্তব্য। আমরা জীবনকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না বলিয়াই ভ্রমবশতঃ চিন্তিত ও ব্যস্ত হই এবং আপনাদের উপর অনাবশ্যক বোঝা ফেলিয়া অবশেষে জড়িত ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ি; কিন্তু সেই স্থলে জীবনকে ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে পারিলে বাধা বিপত্তিও কম ঘটে এবং ঘটিলেও সহজে দূর করা যায়।

যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত ও পবিত্র জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগের নিকট কোন দুঃখ কষ্টই প্রশ্রয় পায় না, তাঁহারা প্রসন্নভাবে সকল কষ্টকে পরাজয় করেন।

আমরা সকলেই এই বিবেচনাশক্তি দ্বারা ক্রমে ক্রমে এবং অল্প আয়াসে চরিত্রের বল লাভ করিতে পারি; কারণ এই শিক্ষা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবনের কর্ম্মের ভিতরেই নিহিত।

শ্রী আ—

পণ্ডিত বালক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক নানাবর্ণের সূত্র দিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিয়া তাহা অলঙ্কাররূপে কণ্ঠে ধারণ করিত। একদা সে মহৌষধকৃত পুষ্করিণীতে স্নান করিবার ইচ্ছায় ঐ সূত্রের অলঙ্কার গ্রীবা হইতে মোচন করিয়া একস্থানে রাখিয়া জলে অবতরণ করিল। এমন সময়ে অল্পবয়স্কা একটী নারী উহা দেখিয়া লুব্ধ হইয়া হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "অতি সুন্দর জিনিষ তো, কত দিয়া কিনিয়াছ? আমিও নিজের জন্য একটী করিব।" জিজ্ঞাসা করিল,"ইহার মাপটা কি দেখিতে পারি?" দরিদ্র স্ত্রীলোকটী সরলভাবে তাহাতে সম্মত হওয়াতে অপর স্ত্রীলোকটী তাহা পরিধান করিয়া পলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া দরিদ্র স্ত্রীলোকটী শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহার নিকটে গিয়া "আমার অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিতেছ কেন?" বলিয়া তাহার বস্ত্র ধারণ করিল। তখন দ্বিতীয়া বলিল, "আমি তোমার জিনিষ তো লইতেছি না,

আমার জিনিষ আমার গলায় রহিয়াছে।" কোলাহল শুনিয়া সেস্থানে বহু জনসমাগম হইল। মহৌষধপণ্ডিত বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময়ে বিচার-শালার সম্মুখ দিয়া ইহাদিগকে কোলাহল করিতে করিতে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কোলাহল কিসের?" তখন উভয়ের মধ্যে বিবাদের কারণ জানিয়া, আকার দেখিয়াই কে চোর এবং কে নিরপরাধী তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং সকল ব্যাপার তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আমার বিচার গ্রাহ্য করিবে কি?" তাহারা সম্মত হইল। তিনি প্রথমে যে প্রকৃত অপরাধী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অলঙ্কারটী কোন্ সুগন্ধি দিয়া লেপন কর?" সে বলিল, "আমি সর্ব্বদা সর্ব্বসংহারক নামে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ইহাতে লেপন করি।" অনন্তর প্রথমা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমার ন্যায় দরিদ্র সর্ব্বসংহারক কোথায় পাইবে; আমি ইহাতে প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের গন্ধ লেপন করি।" তখন পণ্ডিত বালক একটী জলপাত্র আনাইয়া সূত্রনির্ম্মিত ঐ অলঙ্কার তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া গন্ধব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই পাত্রের ঘ্রাণ লইয়া ইহা কোন্ সুগন্ধির গন্ধ তাহা বল।" সে ঘ্রাণপূর্ব্বক প্রিয়ঙ্গু-পুষ্পের ঘ্রাণ বুঝিয়া বলিল, "ইহা সর্ব্বসংহারকের ঘ্রাণ নয়, ইহা প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের; এই নারী মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু প্রথমা সত্য বলিতেছে।" মহাসত্ত্ব তখন সকল লোকের মধ্যে এই কথা প্রকাশ করিয়া কে অপরাধী তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। তখন হইতে মহৌষধের অদ্ভুতবুদ্ধির সকলে পরিচয় পাইল।

একদা কার্পাসক্ষেত্ররক্ষিকা একটী স্ত্রীলোক ক্ষেত্ররক্ষণকালে সেস্থানে পরিষ্কার কার্পাস লইয়া সূক্ষ্মসূত্র কর্ত্তনপূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিয়াছিল এবং গ্রামে আসিবার সময়ে মহাপুষ্করিণীতে স্নান করিবার ইচ্ছায় বস্ত্রের উপর সূত্রের গোলক রাখিয়া জলে অবতরণ করিল। দ্বিতীয়া একটী স্ত্রীলোক তাহা দেখিয়া লোভপরবশ হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাঃ, তুমি অতি সুন্দর সূতা করিয়াছ ত?" এবং বিস্মিতনেত্রে দেখিবার ভাণ করিয়া তাহার নিজের ক্রোড়ে লুক্কায়িত করিয়া প্রস্থান করিল। তখন পূর্ব্ব ঘটনার ন্যায় ইহাদের বিবাদ এবং কোলাহল মহাসত্ত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি ইহাদের আহ্বান করিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ হইল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোলক করিবার সময়ে ভিতরে কি দিয়া করিয়াছিলে?" সে উত্তর করিল, "কার্পাসের বীজ দিয়া করিয়াছি।" প্রথমা বলিল যে সে তিম্বরুবীজ ভিতরে দিয়া গোলক করিয়াছে। পণ্ডিত বালক উভয়ের উত্তর উপস্থিত সকলকে জানাইয়া গোলকের সূত্র সমস্ত খুলিয়া ফেলিলেন; তখন সকলে দেখিল যে ভিতরে তিম্বরুবীজ রহিয়াছে এবং তখন কে দোষী এবং কে নিরপরাধী তাহা সকলে বুঝিতে পারিল। মহা জনমণ্ডলী তুষ্ট হইয়া "বিবাদের মীমাংসা অতি সুন্দর হইয়াছে" বলিয়া প্রশংসাবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একদা একটী নারী পুত্রকে লইয়া, মুখধৌত করিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিতকৃত পুষ্করিণীতে যাইয়া পুত্রকে স্নান করাইয়া এবং তাহাকে নিজ বস্ত্রের উপর বসাইয়া, নিজে মুখধৌত এবং স্নান করিবার জন্য জলে অবতরণ করিল। সেইক্ষণে এক যক্ষিণী শিশুকে দেখিয়া ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া নারীবেশ ধারণপূর্ব্বক নিকটে যাইয়া বলিল, "ভাই ছেলেটীকে কি সুন্দর দেখাইতেছে! এটী কি তোমার ছেলে?" প্রথমা উত্তর করিল, "হাঁ, মা, এটী আমার।" "আমি ইহাকে একটু কোলে করি?" প্রথমা সম্মত হওয়াতে যক্ষিণী শিশুটীকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা দিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শিশুর মাতা তাহা দেখিয়া, "আমার পুত্র লইয়া কোথায় পলাইতেছিস্", বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। যক্ষিণী বলিল, "তুই আবার ছেলে কোথায় পেলি, এতো আমার ছেলে।" এইরূপে কলহ করিতে করিতে তাহারা মহাসত্ত্বের গৃহের সম্মুখ দিয়া যখন যাইতেছিল, তখন তাহাদের কোলাহল শব্দ পণ্ডিতের কর্ণে গেল। তাহাদিগকে ডাকাইয়া বিবাদের কারণ শ্রবণ করিলেন। যক্ষিণীর চক্ষের অনিমেষ এবং রক্তবর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া পণ্ডিত বুঝিতে পারিলেন যে সে নারীবেশধারিণী যক্ষিণী। বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিচার গ্রাহ্য করিবে?" সে স্বীকার করিলে পণ্ডিত ভূমিতে একটী রেখা টানিয়া তাহার উপর শিশুকে শায়িত করাইলেন এবং তাহার হস্তদ্বয় যক্ষিণীর হস্তে এবং তাহার পদদ্বয় মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, "দুইজনেই টানিতে থাক, যে টানিয়া লইতে পারিবে এ পুত্র তাহারই।" তাহারা দুই জনেই টানিতে লাগিল, কিন্তু টানাটানিতে ব্যথা অনুভব করিয়া বালকটী ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া গেল, এবং সে বালককে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন পণ্ডিত সমবেত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিশুর প্রতি কাহার মমতা অধিক হইয়া থাকে? মাতার, না যে মাতা নয় তাহার?" সকলে উত্তর করিল, "মাতার"। "তবে, এস্থলে যে শিশুকে লইয়াছে সেই মাতা, না যে শিশুকে ত্যাগ করিয়াছে?" সকলে বলিল, "যে ত্যাগ করিয়াছে।" তখন পণ্ডিত বলিলেন, "এ যে শিশুঅপহারিকা তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার নাই? এ যক্ষিণী, বালককে খাইয়া ফেলিবার ইচ্ছায় লইয়াছিল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করিয়া জানিলেন?" পণ্ডিত বলিলেন, "চক্ষের অনিমেষ রক্তবর্ণ দৃষ্টি, শরীরের ছায়ার অভাব, ভয়শূন্য ভাব এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দেখিয়া।" অনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?" "আমি যক্ষিণী।" "বালককে কেন লইয়াছিলি?" "খাইবার জন্য।" তখন পণ্ডিত বলিলেন, "মূর্খে, পূর্ব্বজন্মে পাপকার্য্য করিয়া যক্ষিণী হইয়াছিস্, আবার এজন্মেও পাপ করিতেছিস্! তুই নিতান্তই মূঢ়।" এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দান পূর্ব্বক পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে বলিলেন। শিশুমাতা পণ্ডিতকে "চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বালককে লইয়া চলিয়া গেল।

একটী লোক রথে আরোহণ করিয়া স্নানার্থ বহির্গত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইন্দ্র মর্ত্ত্যলোকে পণ্ডিতকে দেখিয়া, "মহৌষধপণ্ডিতের বুদ্ধিশক্তি প্রকাশিত করিব" এই চিন্তা করিয়া, মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ রথের পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। রথে যে বসিয়াছিল সে "বৎস, কি প্রয়োজন তোমার?" জিজ্ঞাসা করাতে ইন্দ্র উত্তর করিলেন, "তোমার পরিচর্য্যা করিতে আমি ইচ্ছুক।" এই কথায় সে সম্মত হইল এবং অবতরণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিল। ঐ সময়ে ইন্দ্র রথে আরোহণ করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। রথস্বামী ইন্দ্রকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার রথ কোথায় লইয়া যাইতেছ?" ইন্দ্র বলিলেন, "তোমার রথ অন্য কোনও হইবে, এতো আমার রথ।" এইরূপে দুইজনে কলহ করিতে করিতে বিচারশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নির্ভীক ভাব এবং চক্ষুর অনিমেষ দৃষ্টি দেখিয়া, "ইনি ইন্দ্র এবং অপর লোকটী রথস্বামী", তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহা জানিয়াও বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, "আমার বিচার গ্রাহ্য করিবে?" প্রশ্ন করাতে বিবাদী দুইজনেই সম্মত হইলেন। তখন পণ্ডিত বলিলেন, "আমি রথ চালাইতেছি, তোমরা দুইজন রথের পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া দৌড়াও। যে প্রকৃত রথস্বামী সে কখনও রথ ছাড়িবে না, কিন্তু অপর যে সে ছাড়িবে।" এই বলিয়া একটী লোককে আজ্ঞা করিলেন, "রথ চালাও।" সে রথ চালাইল এবং বিবাদী দুইজনে রথ ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। রথস্বামী কিছুদূর যাইয়াই আর দৌড়াইতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ইন্দ্র সমানে রথের সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন। পণ্ডিত তখন রথ ফিরাইয়া আনাইয়া সকলকে বলিলেন, "এই লোকটী কিছুদূর যাইয়াই রথ ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু এই লোকটী রথের সহিত দৌড়াইয়া আবার তাহারই সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিল, অথচ ইহার শরীরে বিন্দুমাত্র ঘাম নাই, এ কিছুই হাঁপাইতেছে না, ইহার দৃষ্টি নির্ভীক এবং চোখে পলক নাই, এ নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্র।" জিজ্ঞাসা করাতে ইন্দ্র নিজের প্রকৃত রূপ স্বীকার করিলেন, এবং কেন আসিয়াছেন প্রশ্ন করাতে বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার গুণ সকলের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য।" তখন পণ্ডিত তাঁহাকে পুনরায় এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ইন্দ্র নিজ শক্তি প্রদর্শন করিয়া আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক, "বিবাদ অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত" বলিয়া স্তুতিবাদ করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন।"

তখন রাজার প্রেরিত অমাত্য নিজে রাজার নিকট যাইয়া বলিল, "মহারাজ, পণ্ডিত বালক এইভাবে রথের বিবাদ মীমাংসা করিয়াছে; ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজিত, এরূপ বিশিষ্ট পুরুষকে কেন বুঝিতে পারিতেছেন না?" রাজা সেনক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, ইহাকে আনাইব কি?" সে বলিল, "মহারাজ,

এইটুকুতেই কিছু পণ্ডিত হয় না ; আরও কিছু দিন যাক, তাহাকে বিচার করিয়া দেখি।”

অনন্তর একদিন পণ্ডিতকে বিচার করিবার ইচ্ছায় বিতস্তিপ্রমাণ খদিরকাষ্ঠ লইয়া সূত্রকার দ্বারা সুচারুরূপে চতুর্দ্দিক সমান এবং চিত্রিত করাইয়া পূর্ব্বগ্রামে প্রেরণ করা হইল। ঘোষণা করা হইল, “গ্রামবাসীরা নাকি বড়ই বুদ্ধিমান্ ; এই খদিরকাষ্ঠের অগ্রভাগ কোন্ দিকে এবং মূলের ভাগ কোন্ দিকে তাহারা বলুক। না পারিলে এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।” গ্রামবাসিগণ মিলিত হইয়া তাহা জানিতে সমর্থ হইল না, তখন শ্রেষ্ঠীকে বলিল “দেখ দেখি, মহোষধ পণ্ডিত জানিলেও জানিতে পারে ; তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।” শ্রেষ্ঠী গিয়া তাহাকে ক্রীড়াস্থান হইতে ডাকাইয়া সকল ব্যাপার তাহাকে অবগত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমরা বুঝিতে পারিলাম না, দেখ তুমি পার কি না।” ইহা শুনিয়া মহোষধপণ্ডিত চিন্তা করিলেন, “কোন্ দিক অগ্রভাগ এবং কোন্ দিক মূলভাগ ইহা জানিয়া রাজার কোনও লাভ নাই, এ কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার অভিসন্ধিতে পাঠান হইয়াছে,” এবং বলিলেন, “আচ্ছা, কাষ্ঠ আন, আমি বলিয়া দিতেছি।” কষ্ঠ হস্তে লইয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন্ দিক অগ্রভাগ, কিন্তু বুঝিয়াও সকলের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত একটী জলপাত্র আনাইয়া, কাষ্ঠখণ্ডের ঠিক মধ্যভাগে সূত্র বন্ধন করিয়া, সূত্র ধরিয়া কাষ্ঠখণ্ড জলের উপরে রাখিলেন। মূলের দিক গুরুত্বহেতু প্রথম জলে ডুবিল, অনন্তর পণ্ডিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃক্ষের মূলের দিক অধিক ভারী হয়, না অগ্রভাগ?” “মূলের দিক।” “তাহা হইলে যে দিক প্রথম জলে নিমগ্ন হইয়াছে সেই দিক মূলভাগ” এই বলিয়া কোন্ দিক কি তাহা স্থির করিয়া দিলেন। গ্রামবাসীরা রাজার নিকট এই উত্তর প্রেরণ করিল। রাজা তুষ্ট হইয়া কে ইহা সিদ্ধান্ত করিল জিজ্ঞাসা করাতে ইহা শ্রীবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠীপুত্র মহোষধপণ্ডিতের কাজ জানিয়া বলিলেন, “কি হে সেনক, তাহাকে আনাইব কি?” সেনক বলিল, “দেব, আরও অপেক্ষা করুন, অন্য উপায়ে তাহার বুদ্ধি পরীক্ষা করিব।”

রাজার পূর্ব্বপুরুষপ্রাপ্ত ইন্দ্রপ্রদত্ত একটী অষ্টবঙ্কিম মণিখণ্ড ছিল। একবার তাহার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, এবং কেহ তাহার পুরাতন সূত্রও বাহির করিতে পারিল না, এবং নূতন সূত্রও প্রবেশ করাইতে পারিল না। এক দিন মণিখণ্ড গ্রামে পাঠাইয়া আজ্ঞা করা হইল, “এই মণিখণ্ড হইতে পুরাতন সূত্র বাহির করিয়া নূতন পরাইতে হইবে।” গ্রামবাসীরা তাহার কিছুই করিতে পারিল না, এবং না পারিয়া পণ্ডিতবালককে নিবেদন করিল। “চিন্তার কোনও কারণ নাই,” বলিয়া তিনি মধু আনাইয়া মণিখণ্ডের দুই পাশেরই ছিদ্র দুইটী মধু লেপন করিলেন, এবং একটী সূতা সূক্ষ্ম করিয়া তাহার মুখভাগে মধু লাগাইয়া ছিদ্রে অল্প একটু প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং পিপীলিকার গর্ত্তের

মুখে স্থাপন করিলেন। পিপীলিকাগুলি মধুগন্ধে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া মণিমধ্যস্থিত পুরাতন সূত্র খাইতে খাইতে যাইয়া নূতন সূত্রের মুখভাগ ধরিয়া টানিতে টানিতে গর্ত্তের দিকে বাহির করিয়া ফেলিল। পণ্ডিক ইহা জানিতে পারিয়া রাজার নিকট তাহা প্রেরণ করিবার জন্য গ্রামবাসীদের হস্তে দিলেন। তাহারা রাজার নিকট তাহা প্রেরণ করিল এবং রাজা সূত্রপ্রবেশ করাইবার কৌশল শ্রবণ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বহারা।

তোমায় দেবার মতন ওগো নেইক আমার কিছু,
দেউলে হিয়া কাঁপছে লাজে নয়ন করি নীচু!
সর্ব্বহারা হলাম যবে, রাজাধিরাজ এলে তবে,
খাস মহলের খাজনা বাকি তোমার দাবী বুঝি!
যাত্রা-পথে হারিয়ে গেছে চিরদিনের পুঁজি!

যে এসেছে, যে চেয়েছে করেছিলাম দান!
সর্ব্ব দুয়ার খোলা ছিল নইক সাবধান!
চলিনিক বুঝে সুঝে দেখিনিক খুঁজে খুঁজে
সারাদিবস বাজিয়ে বাঁশি কি গেয়েছি গান!
কি দিয়ে আজ রাখব প্রভু, বল তোমার মান!

আজকে চোখে অশ্রু শুধু জাগছে বুকে ভয়!
সকল খেলায় আমার হ'ল বিপুল পরাজয়!
কলজে ছেঁড়া রক্ত ছুটে রাঙা হয়ে উঠবে ফুটে,
চরণপদ্মে পড়বে লুটে হৃদয় শতদল!
অশ্রু তাহে মুক্তা হয়ে করবে ঝলমল!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আজকালকার প্রধান ভাবনা ও আলোচনার বিষয় য়ুরোপের মহাযুদ্ধ। খবরের কাগজে যত কথা প্রকাশিত হয়, তার প্রধান সংবাদ যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা। আমাদের

দেশের প্রায় সকল লোকের ব্যবসায়, বাণিজ্য, উপার্জ্জন এই মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাজার সুখে দেশের সুখ—আমাদের রাজার এই ঘোর পরীক্ষার সময়, আমাদের সকলেরই ভয় ভাবনার সময় আসিয়াছে। আমরা জানি যে, আমরা এ ব্যাপারে কিছুই করিতে পারি না, তথাপি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, ভাবিতেই হয়। তবে এক কথা নিশ্চয় যে, যুদ্ধে গত ৯ মাসে যে প্রাণনাশ, ধনক্ষয় ও সহস্র প্রকারের অনিষ্ট হইয়াছে এরূপ আর বেশী দিন হইতে পারে না, কারণ এর মধ্যেই অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে যুদ্ধ শেষ হওয়া নিশ্চয়। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি মিলিতপক্ষ অবশ্য শীঘ্র অবসন্ন হইবেন না ও তাই আশা হয় যুদ্ধে তাঁহারা যে উচ্চ ভাব ও মহৎ লক্ষ্য লইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহারই জয় হইবে। যুদ্ধের দ্বারা যতরূপ অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াও যদি শেষে প্রেমের ও ন্যায়ের জয় হয় ও ব্যক্তিগত প্রাধান্যের ইচ্ছা ও পাশবিক বলের পরাজয় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একটা স্থায়ী মঙ্গল হইবে। তাই আমরা আশা করি এই যুদ্ধে যত প্রকারের মহা অনিষ্ট হইল ভবিষ্যতে আর এরূপ যুদ্ধ হইবে না ও পৃথিবী উন্নতির পথে এক সোপান উচ্চে স্থান লাভ করিবে।

কুচবিহার সুনীতি কলেজ—বিগত ৮ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে সুনীতি কলেজের বালিকাদিগকে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয়া মহারাণী মহারাজমাতা সি, আই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয়া মহারাজবাহাদুর স্বহস্তে বালিকা-দিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে কুচবিহার ষ্টেটের মাননীয় ষ্টেট সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ কলিন, মিসেস কলিন, দেওয়ান নরেন্দ্রনাথ সেন, বারিষ্টার কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, মিসেস নারায়ণ, মিস স্পেন্সার, মিস উইল ম্যান, মিসেস এস, সি, সেন এবং আরও কতকগুলি ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। মাননীয়া নূতন মহারাণী শারীরিক কিছু অসুস্থ থাকায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। মাননীয়া মহারাজমাতা এতদুপলক্ষে বালিকাদিগকে উপদেশ-পূর্ণ কয়েকটী সারগর্ভ কথা এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া একটী ছোট-খাট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় সুনীতিকলেজ দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আত্মনিবেদন।

ভগবানের অপার করুণায় এবং বন্ধুগণের শুভ আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও সাহায্যে আমরা এবার নূতন আকারে, নূতন টাইপে, ভাল কাগজে "মহিলাকে" পরিপুষ্ট ও

সুসজ্জিত করিয়া যে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলাম, তজ্জন্য ভগবানের চরণে এবং সাহায্যকারী বন্ধুগণের নিকটে প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানা কারণে মহিলার যে অবস্থা হইয়াছিল, বন্ধুগণ সহানুভূতিহীনচক্ষে যে ভাবে মহিলার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছিলেন, মহিলা নানারূপ সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া সকলের সম্মুখে উপ-স্থিত হইতে পারিতেছিল না বলিয়া যেরূপ উপেক্ষা লাভ করিতেছিল, তাহাতে মহিলার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়াছিল। বিধাতার বিশেষ কৃপায় মহিলা পুনরায় নূতন জীবন লইয়া নবোদ্যমে নববেশে সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে; আশা করি, এবার সকলের করুণাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিবে। আর একটা কথা, পৃথিবীতে দেখি যাহারা দীন, দুঃখী, অকিঞ্চন, তাহারা সকলের করুণার অধিকারী; যাহারা সর্ব্ববিষয়ে সম্পন্ন, তাহারা কাহারও করুণার অপেক্ষা করে না; অবশ্য সকলে তাহাদের প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করে। যদি কেহ মনে করেন, আমাদের মহিলা দীনা, দুঃখিনী, ইহার বিশেষ কোন আসবাব নাই, তাদৃশ কোন পারিপাট্য নাই; তাহা হইলেও অন্ততঃ এই হিসাবে মহিলা সকলের করুণা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। অন্যপক্ষে যাঁহারা বাহিরের বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহিলার ভিতরের কোন গুণ দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিবে। দৃষ্টিভেদে গুণভেদ হয়; যাহারা শ্রদ্ধা ও করুণাপূর্ণ নয়নে সতত দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বত্র গুণের উপচয় ভিন্ন অপচয় নাই। তাই আমাদের আশা।

মহিলার বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ হইত। গত বৎসর মাত্র কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারি মাসের চারি সংখ্যা মহিলা বাহির হইয়াছিল; নানা কারণে আর বাহির করিতে না পারাতে আমরা দয়ালু গ্রাহকগ্রাহিকাগণের নিকট নিতান্ত লজ্জিত আছি; এজন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। মহিলা এতদিন বন্ধ থাকাতে মহিলার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতির ভাব বা কোনরূপ চিন্তা হয়ত অনেকের মনে নাও থাকিতে পারে; অনেকে হয়ত মহিলাকে চিরদিনের জন্য প্রাণ হইতে দূর করিয়া রাখিয়াছেন; আশা করি, মহিলার বর্ত্তমান সংখ্যা এই বিস্মৃতিকে দূর করিয়া সকলের মনে সানুগ্রহ-স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিবে। এই নূতন উদ্যমে ও নূতন আয়োজনে মহিলার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইল। সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমাদের প্রাণের মহিলা পুনরায় ভাইভগ্নীগণের সেবার্থ নব আশা উদ্যম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইল। কৃপা করিয়া গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিবেন এবং মহিলার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

আমাদের প্রাণের রক্তে পোষিতা মহিলা নিতান্ত বালিকা নহে; আজ বিশ বৎসর নানারূপে সকলের সেবা করিয়া সকলের স্নেহপ্রসাদ লাভ করিয়া আজ পরিণত বয়স্কা। যে মহিলা এতদিন সকলের সেবা করিয়াছে, তাহার শক্তিবল নিতান্ত সামান্য নহে; সে

যে সকলের নিকট সেবার একটা উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারে নাই, তাহা কি করিয়া বলি। তাহা যদি না হইত, তবে এতদিন তাহার অস্তিত্বই থাকিত না। অতএব এই বিংশতিবর্ষের অস্তিত্ব কি মহিলার কৃতকার্য্যতার যথেষ্ট প্রমাণ নহে? সত্যকথা বলিলে বলিতে হয়, যদিও মহিলা পুঞ্জীভূত গুণগ্রামের একটা দৃশ্যমান চিত্র সকলের সম্মুখে ধরিতে পারে নাই বা ধারণ করিতে চেষ্টাও করে নাই, কিন্তু নীরবতা ও লজ্জতার আবরণে মহিলাজনসুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বহির্বিকাশ হইতে অন্তরে ফুটাইয়া তুলিয়া অনেকের হৃদয়ে একটা মধুময় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে; এজন্য অনেকে এখনও মহিলার খোজ খবর রাখেন এবং মহিলার অদর্শনের জন্য প্রাণের আকুলতা ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের প্রাণের শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাদ বলেই যেন মহিলা বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতরে বেঁচে উঠিল। এই জীবন মরণের সংগ্রামস্থলে যখন মহিলার অস্তিত্বের অভিব্যক্তি আরও স্ফুটতর হইল, তখন প্রাণে আশা হয়, ভগবানের আশীর্ব্বাদে মহিলা দীর্ঘজীবী হইবে এবং আরও উচ্চতর সেবার আদর্শ দেখাইয়া গ্রাহকগ্রাহিকাগণের হৃদয়ে ঘনতর সম্পর্কে চিরস্মৃতির অমৃতময় স্থিতি লাভ করিবে।

এতক্ষণ মহিলার ভিতরের কথা বলিলাম। ইহার পার্থিব দিকের আভাসটা এখনও দিই নাই। মহিলার অতীত আর্থিক অবস্থা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে মহিলার পরিচালনে ও প্রতিপালনে নিরাশ হইতে হয়। প্রথম প্রথম মহিলার অবস্থা ভালই ছিল। মহিলার সুযোগ্য জন্মদাতা পিতা যতদিন পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন তিনি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বচ্ছল অবস্থায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আজ কয় বৎসর মহিলা সেই সুযোগ্য পিতৃদেবকে হারাইয়া নিরাশ্রয়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্। তাই এই কয় বৎসর বিধাতার প্রদত্ত প্রচার ভাণ্ডারের আশ্রয়ে থাকিয়া এবং দয়ালু গ্রাহকগ্রাহিকাগণের প্রসাদলাভে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছিল। পিতৃহীনের প্রতি অযত্নবশতঃই হউক বা যে কোন কারণেই হউক মহিলার আত্মীয়গণের সস্নেহ হস্তপ্রসারণ সঙ্কুচিত হওয়াতে তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য এই কয় বৎসর প্রচারভাণ্ডারকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে মিশন আর সে ক্ষতি বহন করিতে পারিতেছে না। তজ্জন্য আমরা মহিলার সর্ব্বাঙ্গীন ভার গ্রহণ করিয়াছি। অক্ষমতাসত্ত্বেও মহিলার পরম হিতৈষী বন্ধুগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এই দুর্ব্বহ ভার বহনে কৃতোদ্যম হইয়াছি। আশা করি, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এবং মহিলার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ উদার হস্তপ্রসারণে মহিলার জীবনধারণ ও উন্নতিকল্পে এই গুরুভার আপনারাই তুলিয়া লইবেন।

নববর্ষের নব আয়োজনে ও নব অনুষ্ঠানে পরম সিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি মহিলাকে, মহিলার লেখক লেখিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, উদ্যোক্তা, সাহায্যদাতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সং।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মাতঃ বিশ্বজননী, পৃথিবীর নরনারী সকলেই তোমার পুত্র কন্যা, তুমি আপনার অপার ধনসম্পদ্ তাহাদিগকে দান করিবে বলিয়াই সৃষ্টি করিয়াছ। আমাদের ভারতের নারী তোমার বিশেষ প্রেমের পাত্রী; ইঁহাদিগকে তুমি স্বর্গীয় কোমলতা, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, ভক্তিভাব দিয়াছ; কিন্তু তুমি দেখিতেছ ইঁহাদের এখনও অনেক অভাব রহিয়াছে, ব্রহ্মকন্যার যে সকল বিশেষত্ব তাহা এখনও ইঁহাদের লাভ হয় নাই। প্রেম দিয়া পুণ্য দিয়া কেমন করিয়া অপ্রেম অশুদ্ধতাকে জয় করিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেছেন না। ব্রহ্মকন্যার যে স্বর্গীয় তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া জগতের নরনারী তোমাকে প্রেম-পুণ্যময়ী জননীরূপে পূজা করিবে, দয়া করিয়া সেই চরিত্র তোমার ভারত-কন্যাগণকে দান কর; এই প্রার্থনা করিয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

মধুময় সংসার।

সংসার মধুময়, আজকাল একরূপ কথার কথা হইয়া গিয়াছে। মধুময় সংসারের একটা আদর্শ অনেক সময় প্রাণের ভিতরে জাগে বটে, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার পরিপূর্ত্তিতো দেখি না। এমন একটা সংসার দেখি না, যেখানে নিত্য মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে; ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী সকলেই সেই সংসারে নিত্য সুখী,

নিত্য আনন্দিত, নিত্য পরস্পরের সঙ্গে মধুর বন্ধনে বদ্ধ। অনেকেই এ জন্য আজকাল আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, নবযুগে নবভাবে পরিবার সাধনের যে একটা শুভ আশা সকলের প্রাণে জেগে ছিল, তাহা কল্পনা জল্পনা বা আকাশ কুসুমেই পরিণত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নানা প্রকার কুসংস্কার, শিক্ষাহীনতা ইত্যাদি আদর্শ-পরিবার গঠনের অন্তরায় মনে করা হইত। বর্ত্তমান যুগে তাহার অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। পরিবারে পূর্ব্ববর্ত্তী কুসংস্কার নাই বলিলেই হয়, এবং যতদূর সম্ভব নরনারী-নির্ব্বিশেষে নবশিক্ষার আলোক লাভ করিয়া মোহান্ধকারের হস্ত হইতে মুক্ত। নূতন রূপে নূতন ভাবে জীবনের অভাবাদি ক্রমে পূর্ণ করিয়া, হৃদয়ের বৃত্তি ও গুণগুলিকে সমঞ্জসী-ভূতভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া সংসারের যোগ্য ও যোগ্যা হইতে নরনারী অক্লান্তভাবে কেমন উঠিয়া পড়িয়া নিযুক্ত। এখন পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়াইয়া সকলেই কেমন পুলকিত চিত্তে ভাবিতেছেন, "আমি আমার সংসার খুব ভাল করে করিব।" কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া দুই দিন না যাইতেই ঐ ফুল্ল মুখ খানা ম্লান হইয়া যায়। অবশ্য এত আয়োজনের মধ্যেও কোন ত্রুটী আছে, তাহাতেই সব পণ্ড হইয়া যাইতেছে। জলপূর্ণ কলসীতে অদৃশ্যভাবে সামান্য একটা ছিদ্র থাকিলেও যেমন সেই ছিদ্রপথে পূর্ণ কলসীটা শূন্য হইয়া যায়, তদ্রূপ অলক্ষিত ভাবে এমন কোন ত্রুটী থাকিয়া যাইতেছে, যাহাতে আমাদের সুন্দর ক'রে সংসার সাধনের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হইতেছে।

যুগে যুগে সংসার সাধনের, পরিবার গঠনের নব নব আদর্শ, নব নব আলোক, নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে। কাল সংসার সাধনের যে আদর্শ ছিল, আজ তাহা ম্লান; কাল সংসারে যাহা সুশিক্ষা ছিল, আজ তাহা কুশিক্ষা; কাল যাহা মধুময় ছিল, আজ তাহা বিষবৎ। ক্রমবিকাশের ধারায় এইরূপ নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন সবদিকেই হইতেছে। যেমন জীবনে, তেমন সংসারে, তেমন সমাজে, তেমন মণ্ডলীতে। সে সমস্ত পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া প্রাচীনতম একটা আদর্শকে ধরিয়া থাকিলে আজকাল তাহাতে আর কুলাইবে না। তবে কি প্রাচীনকে একে-বারে পরিত্যাগ করিয়া নূতনকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে? আজকাল অনেকেরই মত এই যে, প্রাচীনে আর কোন কাজ নাই, প্রাচীনকে ছাড়, নূতনকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ কর। এক একটা সত্য জীবন ফুটিবার অনুকূল যে সব সত্য সাধন যুগে যুগে বিধাতার বিধানে পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যাহার ভিতরে কতকগুলি প্রস্ফুট জীবন এখনও জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন একটা সাধন গ্রহণ করিবামাত্রই জীবনের সমস্যা পূরণ হইবে এ কথা বিজ্ঞান তো বলিবে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, অসত্য কিছুই নাই, প্রাচীনও সত্য, নূতনও সত্য। প্রাচীনকেও গ্রহণ কর, নূতনকেও গ্রহণ কর। দুয়ের সামঞ্জস্যে জীবনের ভিত্তিভূমি

গড়িয়া তোল। প্রাচীনের ভিতরও সুন্দর জীবন, নূতনের ভিতরও সুন্দর জীবন। প্রাচীনের উপর নূতনকে ফুটাইয়া তোল; দেখিবে কেমন সুন্দর হইবে। দেখিবে তোমার জীবন সুন্দর, পরিবার সুন্দর, ধর্ম্ম কর্ম্ম সুন্দর, সবই সুন্দর মধুর হইয়া যাইবে। আজকাল সকলের নূতনের চাক্‌চিক্যের উপর এমন একটা ঝোঁক পড়িয়াছে যে, তাহাতে প্রাচীন ম্লান, অসত্য বা বিষময় মনে হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নূতনের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকাতে তাহার নবালোকে চোখের জ্যোতি এমন ঝলসাইয়া যাইতেছে যে, তাহাতে প্রাচীনের প্রতি তাকাইয়া তাহাকে আর তেমন উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে না। আমাদের দৃষ্টির ভ্রান্তিতে বস্তুতঃ ঈদৃশ অবস্থা হয়; কিন্তু সবই জ্যোতির্ম্ময়, সবই জীবনপ্রদ, সবই সাধনার অনুকূল।

প্রাচীন আদর্শ ও নূতন আদর্শ, প্রাচীন সাধন ও নূতন সাধন সমঞ্জসীভূত ভাবে জীবনে সংসারে পরিবারে গ্রহণ করিয়াও দেখা গিয়াছে, নববিধানে যে নব আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুট হয় না। সাধনের মূলে আর একটা বিষম ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। আমরা সংসারের দিকটাই অধিকতররূপে লক্ষ্য করিতেছি। সংসারের ভিতরে যে আর একটা জিনিষ আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে আদপেই পতিত হয় নাই। সেই দিকে দৃষ্টি না খুলিলে সংসার আমাদের কিছুতেই গঠিত হইবে না। ঐ যে শুনেছিলাম, সংসারে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে, ধরাধামে স্বর্গরাজ্য অবতরণ করিবে। সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি পড়েছে? আমরা যেন সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছি, কি যেন এক স্বর্গের কথা শুনেছিলাম, তাহা মনে আছে কি না আছে; তাই মন ওদিকে যাইতে চাইতেছে না। মন চাইতেছে, সংসারটাকে খুব ভাল ক'রে করিতে। সংসারটাকে ভাল ক'রে সাধন করিতে হইলে যে স্বর্গটাকে লক্ষ্য বা সাধনের ভিতর রাখিয়া প্রতিপদে অগ্রসর হইতে হয়। স্বর্গের ভিতর দিয়া সংসার, সব কাজ কর্ম্ম। ধরাধামে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নহে, স্বর্গের সাধনের মধ্য দিয়া পার্থিব সাধন। আমরা চাই সংসারটাকে ভাল ক'রে সাধন করে তাহার ভিতর দিয়া স্বর্গ লাভ করিব। কিন্তু হচ্ছে না তো। সংসারও সাধন হচ্ছে না, স্বর্গলাভও হচ্ছে না। উল্টা পথে বিপথে চলিয়াছি। স্বর্গ নিত্য, সংসার অনিত্য, অসার। নিত্যের ভিতর দিয়া অনিত্য সাধন, অসার সাধন সত্য সাধন; তাহাতে অনিত্য নিত্য হইয়া উঠে, অসার সার হইয়া যায়। অনিত্যের ভিতর দিয়া অনিত্য, অসারের ভিতর দিয়া অসার সাধন করিতে করিতে অনিত্য আরও অনিত্য হয়, অসার আরও অসার হইয়া যায়। তাহাতে মোহ বাড়ে, আসক্তি আসে, বদ্ধতা জন্মে। ইহা যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাই বলি আমাদের লক্ষ্যেও ভুল আছে, সাধনেও ভুল আছে। এই ভুলে ভুলে'ই জীবনটা ভুল হইয়া যাইতেছে; সংসার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভুল হইয়া যাইতেছে, এবং জীবন সংসার অতীব দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র শ্রীঈশা এ জন্যই দিবাচক্ষে দেখিতে পাইয়া

বলিয়াছিলেন, "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পশ্চাৎ যাহা যাহা প্রয়োজন দেওয়া হইবে।" গানেও আমরা অনেক সময় গাইয়া থাকি, "সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে।" স্বর্গই আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ। অতএব অগ্রে স্বর্গ পশ্চাৎ পৃথিবী; অগ্রে পৃথিবী পশ্চাৎ স্বর্গ নহে।

স্বর্গ অদৃশ্য অন্তরের জিনিষ, পৃথিবী দৃশ্য বহির্জ্জগতের জিনিষ। স্বর্গ অন্তঃপুর, পৃথিবী বহিঃপুর। স্বর্গটা আসল জীবন, বাহিরে তাহার অভিব্যক্তি। যেমন বৃক্ষ অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য ভাবে রস আকর্ষণ করিয়া যত সতেজ হয়, ততই বাহিরে ফল ফুলে বিভূষিত দেখা যায়। অন্তরে রস লাভ না করিলে অচিরে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। আমরা বাহিরের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মোহে এমনই আকৃষ্ট যে অন্তরের দিকে আর আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বা অবসর নাই। বাহিরের ধন জন শোভা সৌন্দর্য্য এ সব লইয়াই নিত্য মত্ত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যা মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে ধন-রত্নাদি বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন বিদুষী মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবেক। ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া কি করিব? এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে বলুন।" যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতত্বলিপ্সু, নির্ব্বাণমুক্তিলাভে অভিলাষিণী, সত্যলোক চিৎ-লোক আনন্দ লোকে গমন করিতে ইচ্ছুক, সাধ্বী সতী ধর্ম্মপরায়ণা মৈত্রেয়ীকে নশ্বর ধন রত্নের পরিবর্ত্তে অমূল্য ধন, আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব উপদেশ দান করিলেন। একদিন ভারতে এই সৌভাগ্য ছিল, মৈত্রেয়ী, গার্গীর কত কত ব্রহ্মকন্যা জীবনে সত্যপথ ধরিয়া অক্ষয় অমর জীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ সমগ্র নারীজাতির প্রতি নিত্য আসিতেছে, এবং আসিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অন্তর বাহির আছে, অন্তঃপুর বহিঃপুর আছে, স্বর্গ পৃথিবী আছে, তেমনি প্রতি সংসারে প্রতি পরিবারেও অন্তর বাহির, অন্তঃপুর বহিঃপুর, স্বর্গ পৃথিবী আছে। এই যে প্রতি সংসারে অন্তঃপুর আছে, ইহার রাণী কে? কোমলা নারী। সংসারটাকে মধুময় করিতে হইলে সংসারের দুইটা বিভাগের মধ্যে অন্তর্বিভাগের শাসনকর্ত্রী যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, তাহাই অদ্যকার বর্ণনীয়। এই কথা বলিতে অনেকগুলি কথা পাড়িতে হইল। অনেকে মনে করিতে পারেন, মহিলাগণকে অন্তঃপুরের রাণী বলাতে তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিতেই পুরুষেরা প্রয়াসী; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহাদিগকে বাহিরের আব হাওয়াতে

স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে দিতে হইবে. নতুবা অন্তঃপুরের বদ্ধ বায়ুতে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকেই চলিয়া যাইবে। বাহিরের সম্পর্কে তাঁহাদিগকে আসিতে দিয়া তাঁহাদের জীবনকে সদা সতেজ ও প্রফুল্ল রাখিতে হইবে। তবে এক বিভাগে তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য আছে। পুরুষের সঙ্গে সমভাবে দায়িত্ব বণ্টন করিয়া লইলে ঠিক খাঁটি সংসার হয় কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যদেশে আজ কাল এ বিষয়ে নারী-মহলে একটা উঠন্ত পড়ন্ত চেষ্টা হইতেছে। পুরুষেরা যে যে কাজ করেন, নারীগণও তাহা করিতে প্রয়াসী; তা' না হলে তাঁদের জীবনকে তাঁহারা হীন বলিয়া মনে করিতেছেন। আজকাল ওদেশে মহাসমরের অশুভক্ষণে ইউরোপীয় মহিলাগণের পুরুষ-গণের সমকক্ষতা লাভ করিবার একটা সুযোগও ঘটিয়াছে। পুরুষেরা যুদ্ধে গমন করাতে এবং দেশে পুরুষের সংখ্যা কমিয়া আসাতে নারীগণ পুরুষদের নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যে ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছে এবং যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে যুদ্ধ যদি আরও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে হয়ত নারীগণকেও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এদেশেও অবশ্য সময়ে সময়ে রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতি সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া যে কোমলস্বভাবা নারীগণের প্রত্যেককেই সমরপ্রাঙ্গণে নামিতে হইবে এ কথা কে বলিল? বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানের পুরুষ নারী এই দ্বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে কি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নাই? তাহা না হইলে তাঁহার এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য কেন?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অন্তরের সাধনের ভিতর দিয়া বাহিরের অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অন্তঃপুরের নারীগণের জীবনের ভিতর দিয়া সংসারের, পরিবারের, পরিবারস্থ ব্যক্তিগত জীবনের অভিব্যক্তি হয়। নারীগণ সংসারটাকে যত ভাল করে সাধন করিতে পারিবেন, পুরুষগণও তত ভাল করে সংসার সাধন করিতে পারিবেন। পুরুষেরা যদি ভাল করে সংসার সাধন করিতে অভিলাষী হন, এবং নারীগণ তদ্বিষয়ে বিমুখ হন, তবে সংসার কিছুতেই সুন্দর হয় না। পুরুষগণের শতচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। কিন্তু নারীগণ যদি ভিতরে ভাল করে বিধাতার ইচ্ছানুসারে সংসার সাধন করেন, তবে পুরুষেরা বাহিরে তদ্বিষয়ে বিরোধী হইলেও তাহাতে সংসারের বেশী কিছু আসে যায় না। সংসারসাধনের মূলশক্তি নারী। সংসারের জীবনীশক্তি তাঁহাদের সাধনের ভিতর দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাহার অভিব্যক্তি পুত্রকন্যার মধুময় জীবন। রস যতই সঞ্চিত, ততই বৃক্ষ শাখা প্রশাখায় প্রসারিত, পত্র ফল ফুলে সুশোভিত। সংসারও তেমনি নারীজীবনরসে কেমন সতেজ সজীব বিস্তৃত উন্নত এবং সুন্দর। হে ব্রহ্মকন্যা, স্বভাবের নিয়মে তোমার হৃদয় মধুভরা; তোমরা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না বটে, কিন্তু পুরুষগণ অবিশ্রান্ত সে মধু লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত। সংসারে শ্রান্ত ক্লান্ত মানব তোমার নিকট আসিয়াই তোমার মধুময় জীবনস্পর্শে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়। তুমি কি

আজ তোমার সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া কঠিন পাষাণদের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের জীবনাদর্শে ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত কোমল সরস জীবনকে নীরস শুষ্ক করিয়া ফেলিবে? তোমরা যদি নীরস কঠিন হও, সংসারের সৌন্দর্য্য একেবারেই চলিয়া যাইবে। তোমাদের স্বভাবজাত মধুময় জীবনকে যদি আরও মধুরতর মধুরতম করিতে পার, তবে তোমার সংসার কত মধুময় হবে, তোমার পুত্রকন্যা মধুময় হবে, তোমার কাজ কর্ম্ম, তোমার সেবা ধর্ম্ম কত মধুময় হবে।

অন্তরের সাধন স্বর্গের সাধন; তাই ব্রহ্মকন্যাগণের সাধনও স্বর্গসাধন হইবে। সংসারে স্বর্গের প্রতিষ্ঠাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের ভিতরে যদি ঘুণাক্ষরেও হিংসা, দ্বেষ, আসক্তি, স্বার্থপরতা মোহ, অপবিত্রতা থাকে তবে সংসার অতল নরকে ডুবিবে ইহা নিশ্চয় কথা। "অশেষ ধৈর্য্য সংযম, পদে পদে আত্মসংবরণ, অবিচ্ছেদ ক্ষমা ও সমুন্নত প্রেম বিনা পরিবার মধ্যে ধর্ম্মশ্রী ও পুণ্যালোক স্থায়ী হয় না" ইহা মনে করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে। মার রক্তমাংস দিয়া যেমন সন্তানের শরীর গঠিত হয়, তেমনি মার জীবন, চরিত্র, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি দ্বারা সন্তানের আত্মিক জীবন গঠিত হয়। ভাল মার ভাল ছেলে। তাই বড্ড ভাল ছেলে শ্রীকেশব বলিয়াছিলেন, "আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল।" নারীজাতি মাতৃবংশ। আজ যাহারা হয়ত কুমারী, তাহারাও কালে বিধাতার বিধানে সন্তান কোলে করিবে। সকলেই বড্ড ভাল মা হবে। নারী, তুমি সংসারে জীবন দিতে এসেছো। জীবন দিয়া জীবন গড়িবে; জীবনের মধু দিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তুলিবে। তাহা হইলে "সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদায় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান" এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবে। অবিশ্রান্ত তোমার হৃদয়-উৎস হইতে মধুধারা উত্থিত হউক। দুঃস্থ মানব তাহা পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হউক।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

ষোড়শ অধ্যায়।

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গিয়াছে, শীত পড়িয়াছে। আমরা নরটনবারীতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। একদিন জন এবং আমি একসঙ্গে মিথের ধার দিয়া যাইতেছিলাম, পথে মিসেস জেসপের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি মাথা নাড়িয়া অভিবাদন করিলেন।

"জন, উনি তোমায় খুব ভালবাসেন।"

"হাঁ, তোমায় বোধ হয় আগেই বলেছি যে, যখন আমরা লণ্ডনে ছিলাম তখন উঁহারা উভয়েই আমাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।"

তাঁহাদের কাছে পৌঁছিবামাত্র মহিলাটী বলিলেন, "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি আলাপ করাইয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ইনি আপনার বন্ধু। আমরা উভয়ে আপনার কথা প্রায়ই বলিতাম, আপনি একটু সবল হয়েছেন তো?"

"ওঁর কি অসুখ করিয়াছিল?"

"না ফিনিয়স! ওঁরা দয়া করে ইচ্ছা করে আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

"আর আপনি একবার দেখাও করিতে আসিলেন না। আপনার নিজের অকৃতজ্ঞতার জন্য দুঃখ হয় না কি?"

"আপনারা মনে করেন, আপনাদের দয়ার কথা ভুলে গিয়েছি?"

"তা যে যান নি তা জানি। তবে আসেন নি কেন?"

"লণ্ডনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু সে পরিচয় এখানে রাখা উচিত মনে হইল না, কেন না আপনারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, আমি যৎসামান্য গরীব ব্যবসায়ী।"

"আপনি যে মন খুলে কথা বলিলেন, সে জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ। এখন আমার মত শুনুন। আমি লোকমুখে শুনিয়াছিলাম আপনি ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি চোখে দেখিয়াছি আপনি ভদ্রলোক। এই দুটা যে পৃথক্ জিনিষ তা তো মনে হয় না। সুতরাং আপনি যদি দয়া করে মাঝে মাঝে আসেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। আপনারা কি এই পথে যাইবেন? চলুন আপনার সঙ্গে আমরা যাই। এই পথটা আমার খুব জানা আছে, আমার একটী পুরাতন ছাত্রী এখানে বার্থউডের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আপনারা কেহ কি আমার ছাত্রী উরসুলা মার্চকে জানেন?"

জনের মুখ লাল হইয়া উঠিল। মিসেস জেসপ দেখিতে পাইলেন। তিনি একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন।

আমি বলিলাম, "গত গ্রীষ্মকালে এনডারলীতে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে মিস্ মার্চের আলাপ হইয়াছিল।"

"হাঁ এখন আমার মনে পড়িতেছে, মিস্ মার্চ আমাকে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন; মিষ্টার ফ্লেচার ও তাঁহার বন্ধু জন হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইনি কি মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স?"

"হাঁ ইনিই।" জন নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। হায় আমার এতদিনের চেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে—জন তাহাকে ভুলিতে পারে নাই।

মিসেস জেসপ আমায় বলিতে লাগিলেন, "সেই বিপদের সময় যে আপনার মত সঙ্গী

তিনি পেয়েছিলেন সেজন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ।” বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল।

“মিস্ মার্চ্চ যে রকম মেয়ে, তাহাতে তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া থাকা যায় না। তিনি এখন বেশ ভাল আছেন তো?”

“আশা করি। তাঁর বয়স এই সবে আঠার বৎসর, এই সময়ের কষ্ট দুঃখ কিছুই দৃঢ়ভাবে মনে বসে না। মেয়েটী বড় ভাল। তিনি নিজের কর্ত্তব্য পূর্ণ করিয়াছেন; এখন তাঁহার জীবন আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে।”

বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। জন দ্রুতপদে চলিল।

“দাঁড়ান; মিষ্টার হ্বালিফাক্স, প্রতিজ্ঞা করুন আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিবেন, এবং আজ যেমন সত্যি কথা মন খুলে বলেছেন সেই রকম সকল অবস্থাতেই বল্‌বেন।”

দরজা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

“বড় ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে; তোমার খুব শীত করছে না?”

অনেক দিন গত হইয়াছে, এখন সে সব কথা তুলিলে আর আঘাত লাগিবে না জানিয়া বলিলাম:—“ভাই জন, তুমি যদি তোমার মনের কথা খুলে বল তাহালে অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় না কি?”

“কিছুই হাল্কা করতে পারে না। সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই, ভগবান জানেন আমি কি যাতনাই পাইতেছি। এক এক সময় মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব।”

ইহার আর কি উত্তর দেওয়া যায়। যখন জন একটু শান্ত হইল, তখন আমি বলিলাম, “হয়তো তাঁহার সঙ্গে শীঘ্র দেখাও হইতে পারে।”

“ফ্লেচার ওসব কথা বলিও না, অন্য কথা বল।”

জনের অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল। বাহিরে জন কি শান্তভাবে নিজের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া যায়, কিন্তু ভিতরে তার কি বেদনা।

“জন, তুমি এই বেদনা লইয়া কি করিয়া কাজ করিতেছিলে?”

“কাজের ভিতরই আমি সব ভুলিয়া থাকি। আর চামড়ার কারখানায় থাকিলে তাঁহার চিন্তা আসা অসম্ভব হইবে বলিয়া, সেখানেই থাকা নিরাপদ মনে করি। ফিনিয়স ভাই, তুমি জান না দিন দিন আমি কি নীচপ্রকৃতির লোক হইয়া যাইতেছি। আমি তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে তাহাও ঘটিল না। আমার এসব কথা তোমাকে না বলাই ভাল, তুমি যে নিজে দেবতা, তুমি এসব কি বুঝিবে?”

আমি তাহার হাত ধীরে ধীরে ধরিয়া বলিলাম, “ভাই জন, তুমি এখন কি করিতে চাও?”

"আমার মনে কত খেয়াল আসে। ইচ্ছা করে কোথাও চলিয়া গিয়া বড়লোক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করি। আমি যদি সমান অবস্থার লোক হইতাম, তাহা হইলে হয়তো ভালবাসা লাভ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে এই রকম লুকোচুরি না করিয়া সহজ ভাবে তাঁহাকে আমার মনের ইচ্ছা জানাইতাম।" জনের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনই হাত ছিল না। ভগবান কি তাহাদের উভয়কে মিলাইবেন না?

"হয়তো এ পৃথিবীতে আমাদের মিলন হইবে না।" জন আকাশের পানে তাকাইল। পশ্চিমে লাল মেঘ দেখা যাইতেছিল, তাহার পরপারেই নূতন চাঁদ উঁকি দিতেছিল। সে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া জনের উত্তেজিত মনও শান্ত হইয়া গেল। সে নীরব হইয়া চোক বুজিল, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

"ভাই ফিনিয়স, চল বাড়ী যাই, আমি আর তোমাকে জ্বালাতন করিব না, ভবিষ্যতে তোমার ভাল ভাই হইতে চেষ্টা করিব।"

জন আমার হাতে হাত দিল, আমরাও গৃহাভিমুখে চলিলাম। রাস্তায় সকলেই প্রায় জনকে নমস্কার করিতে লাগিল। জন যে সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বেশ বোঝা গেল। এই সময় ডাক্তার জেসপ নিজের গাড়ী থামাইয়া বলিলেন "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাড়ী আসিবেন। লেডী কেরোলাইন আপনাদের দেখিতে চান।"

"আমাকেও?"

"হাঁ জন হ্যালিফ্যাক্সকে, যিনি বীর বলিয়া লোকদের কাছে পরিচিত তাঁহাকে। আপনি যে বিদ্রোহ থামাইয়াছিলেন তাহা তো জানিতাম না। লেডী কেরোলাইন তো আপনাকে দেখিবার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছেন।" মিষ্টার জেসপ গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

বাবা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ঘোরতর সন্দিহান হইয়া বলিলেন। "জন, তুমি কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "উনি ডাক্তার জেসপ, লেডী কেরোলাইন বিশেষ ভাবে জনকে দেখিতে চান, তাহাই বলিয়া গেলেন।"

"জন, তুমি কি নিজের অবস্থা ভুলিয়া যাইতেছ? তুমি একজন সামান্য লোক হইয়া বড় লোকদের পেছনে কেন দৌড়াইতে চাও? আমি তখনি জানিতাম লণ্ডনের চাকচিক্য তোমার চোখে ধাঁধাঁ লাগাইবে।"

"আশা করি, আমি নিজেকে অন্ততঃ ভদ্রলোক বলিতে পারি।"

এই বলিয়া জন একটু হাসিয়া চুপ করিল, সে অন্য কথা ভাবিতেছিল। মিষ্টার ফ্লেচারের রাগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। "রিচার্ড বার্ণউডের মত লোকের সঙ্গে ভাব

মিশিতে চাও, সে মাতাল বদমায়েস। তার স্ত্রীর মত লোকের সহিত তোমার মিশিবার আকাঙ্ক্ষা, যে লেডী হ্যামিলটনের মত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে।"

জন চমকাইয়া উঠিল। আমাদের মত নিস্তব্ধ গ্রামও লেডী হ্যামিলটনের বদনামে ছাইয়া পড়িয়াছিল।

"মহাশয়, স্ত্রীলোকের চরিত্রের উপর হঠাৎ একটা কিছু বলিবেন না। তাহার বদনামের সঙ্গে সঙ্গে আপনারও বদনাম হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যিও হয়, তাহা হইলেও কাহাকেও বলিবেন না যে লেডী হ্যামিলটন লেডি কেরোলাইনের বন্ধু।"

এই সময় বাড়ী পৌঁছিলাম। বাবা ভিতরে আসিয়া জনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার মত গরীব লোকের বাড়ী তোমার মত লোকের উপযুক্ত নয়।"

"আপনি আমাকে অযথা বিচার করিতেছেন, তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন। ঢুকিতে আজ্ঞা হইলেই ভিতরে আসি।"

আমি জনকে ভিতরে ডাকিলাম। তাহার চেহারায় বোঝা যাইতেছিল সে কত আশা করিতেছে। সেই সময় জেল দুখানি নিমন্ত্রণ পত্র আনিয়া দিল, জন বাবার হাতে দিতে বলিল।

বাবা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ফিনিয়স, স্ত্রীলোকটীকে বল, তুমি কোনমতেই যাইতে পারিবে না।"

"আর জন ?"

"জন যা ইচ্ছা করিতে পারে ; সে যদি ইচ্ছা ক'রে মন্দ পথে যেতে চায়, তাহা হইলে কে আটকাইতে পারে ?"

"আমি তো চিরকালই স্বাধীন ছিলাম। যদি মন্দ পথে যাইতাম তাহা হইলে এত দিন কোন কালে যাইতাম। কিন্তু ভগবানের কৃপা ও আপনার দয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। মহাশয়, এখন বৃথা আমার উপর রাগ করিবেন না।"

"তোমার ব্যবহারেই রাগ হয়। নিজের সম্মান নিজে রাখ। নিজের সমান লোকদের সঙ্গে মেলা মেশা কর। আমার মত সৎ ব্যবসায়ী হইতে শিক্ষা কর।"

"আশা করি আমিও তাই। আমি কারখানাতেই থাকি কিম্বা মিসেস জেসপের বৈঠকখানায় থাকি, আমি তো সেই একই জন হ্যালিফ্যাক্স। প্রথমটাতেও আমার মানহানি হয় না, দ্বিতীয়টাতেও আমার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করে না।"

বাবার মুখ হইতে তামাকের নল পড়িয়া গেল। "তাহলে কি তুমি মনে কর, তুমি একজন বড়লোক হইয়া পড়িয়াছ এবং সকল বড়লোকদের সঙ্গে মিশিবার উপযুক্ত ?"

বাবা আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বলিলেন, "তুমি এখন ছেলেমানুষ, বুঝিতেছ না, কিন্তু এ ভাব বেশীদিন কখনও থাকিবে না।"

"কিন্তু আপনি কলাকার বিষয় কি বলেন? আমার ইচ্ছা থাকিলে আমি আপনার বিনা অনুমতিতে নিশ্চয়ই যাইতে পারিতাম। কিন্তু আমি আপনাকে সকল কথা জানাইয়া কাজ করিতে চাহি। আপনি আমার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। আশা করি, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব কখনও বৃথা বিরোধী হইব না এবং ঠকাইতে চেষ্টা করিব না।"

জনের কথায় বাবার মত লোকও নরম না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। "জন, তুমি বড়লোকদের কাছে কেন যাইতে চাও?"

"তাঁরা বড় লোক বলিয়া কি আমি যাইতে চাই? আমার অন্য কোন কারণ আছে।"

"সত্য কথা বল। তোমার কারণ কি?"

জন মুস্কিলে পড়িল।

"তুমি রাঙ্গা হইয়া উঠিলে যে? এমন কি কারণ আছে যাহা বলিতে লজ্জা হইতেছে?"

"না, লজ্জার বিষয় কিছুই না; আমি শুধু জানিতে চাই যে, লেডি কেরোলাইন সেই ছোট নির্দ্দোষ মেয়েটীর অভিভাবিকা হইবার উপযুক্ত কি না?"

"এমন কাউকে তুমি জান নাকি? আমি তখনই ভেবেছিলাম। জন, পুরুষের জীবনের অভিশাপ—'স্ত্রীলোকের' সন্ধান তুমি পেয়েছ?"

জন নীরব হইয়া রহিল। বাবার রাগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

"জন, শীঘ্র বল, তুমি বিবাহ করিতে চাও, না—।"

"মহাশয় চুপ করুন, তিনি একজন ভদ্রমহিলা।"

"আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম। সেই জন্যই ভদ্রলোক সাজিবার তোমার এত আকাঙ্ক্ষা।"

"বাবা আপনি জনকে কি করিয়া ওসব কথা বলিতেছেন।"

"তাহালে তুমিও ইহার ভিতরে আছ। তুমি আবার দ্বিতীয় বার যে জনের ভোলানতে ভুলে যাবে, তা কখনই হইতে দিব না। আমি তোমাকে চাবি তালার ভিতর বন্ধ রাখিব।"

আমার তো বাবার কথা অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু জনই শিখাইয়াছিল, ন্যায়-পরায়ণ পিতামাতার সব রকম উপদ্রবই সহ্য করা উচিত। এই সময় জন আমার হাত চাপিয়া ধরিল, আর ধীরে ধীরে বলিল, "ধৈর্য্য ধর"। "মহাশয়, ফিনিয়সের ইহাতে কোন দোষ নাই, আমারও নাই; যদি সব কথা শুনেন, তাহা হইলে নিজেই বুঝিতে পারিবেন।"

"সব খুলে বল, কাপুরুষেরাই সব বলিতে ভয় পায়।"

"ইহাতে কোন লজ্জার কথা নাই। প্রকৃত ভালবাসায় দোষের কি আছে? আমার স্বীকার করাতেও কারুর ক্ষতি নাই। তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না।"

আমরা তিন জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাবার মনেও যেন কোন পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া সহানুভূতিতে পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি খানিক পরে বলিলেন, "সে কে?"

"আপনাকে না বলাই ভাল। পৃথিবীর হিসাবে তিনি আমা অপেক্ষা অনেক উচ্চ।"

"তাহালে, আশা করি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজেকে অসুখী করিবে না।"

"তিনি যদি আমায় চান, এবং আমি যদি চেষ্টা করিয়া নিজেকে তাঁর উপযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব।"

"ভগবান্ তোমার সহায় হউন, তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিও। সে ভালবাসা যেন তোমার জীবনের অভিশাপস্বরূপ না হয়।"

এখানেই কথা বন্ধ হইল। বাবার স্বর্গারোহণের পর লোকেদের কাছে শুনিলাম, বাবা বিবাহিত জীবনে বড় অসুখী হইয়াছিলেন—যদিও আমার মা ভদ্রমহিলা ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শিকার।

রবিবার দিন ভোরের বেলায় চা পানাদি শেষ করিয়া নরেশচন্দ্র রায় যখন শিকারীর পোষাকে বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা উমা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তুমি কোথায় যাবে?" উত্তরে পিতা কহিলেন, "পাখী মারতে যাব মা।" উমা কহিল, "কেন, বাবা, পাখী মারবে, তারা তোমার কি করেছে! তাদের মেরে ফেল্‌তে তোমার কষ্ট হবে না, বাবা?" এই কথা শুনিয়া পিতা হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "দূর পাগলি, সে যে আমোদ।" পিতার কথাগুলা উমার প্রাণে গিয়া ছ্যাঁৎ করিয়া বিঁধিল। সে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। তাহার পিতা নিষ্ঠুর নহেন, অথচ এই নির্দ্দয় খেলায় তাঁর এত আনন্দ কেন? ক্ষুদ্র বালিকার নিকট সমস্ত জিনিষটা একটা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার ন্যায় জটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে দুই চারিজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে, তাঁহাদের আসিবার সময় হইয়াছে, নরেশচন্দ্র সোৎসুক-নয়নে পথের পানে চাহিয়া আছেন, কখন তাঁহারা

আসিবেন। কিছুকাল পরে দূরে মোটরকারের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দুইখানা গাড়ী তাঁহার ফটকে ঢুকিল। নরেশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিলেন। চা প্রস্তুত ছিল, চা-পানাদি শেষ হইবার পরে সকলে গিয়া মোটরকারেতে উঠিলেন। মোটরকার ছাড়িয়া দেওয়ার পরই নরেশচন্দ্রের দৃষ্টি কন্যার উপর পতিত হইল—দেখিলেন যে, সে ম্লানমুখে সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। নিমেষের মধ্যে সে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে পড়িল।

কলিকাতা সহরের সন্নিকটে কোনও ক্ষুদ্র সহরে নরেশচন্দ্র রায়ের বাস। তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর বিস্তর আয়। মনোরম উদ্যান-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে। সুসজ্জিত বাসভবন শুধু ঐশ্বর্য্য অথবা বিলাসের ক্রীড়াভূমি নহে, তাহা তাঁহার রুচির শোভনতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। দাস দাসীতে গৃহপূর্ণ অথচ কোথাও হট্টগোল নাই—সর্ব্বত্রই শ্রী ও শৃঙ্খলা একত্র বিরাজিতা।

নরেশচন্দ্র দেখিতে সুশ্রী, বয়স ছত্রিশের অধিক হইবে না। তিনি সুশিক্ষিত ও বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। উমা তাঁহার প্রথমা কন্যা। উমার পরে একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, সে অতি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। বর্ত্তমান পুত্র পরেশচন্দ্র ছয় বৎসরের বালক।

নরেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রমাসুন্দরী 'ডাকসাইট' সুন্দরী—তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর হইবে। পূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্যের প্রখরতায় যে দাম্ভিকা আছে, যে উন্মাদিনী আকর্ষণী আছে, সত্য বটে আজ ঠিক সেটা তাঁহার নাই; কিন্তু আজ যেটা ফুটিয়া আছে, সে জিনিসটা এমন একটা দুর্লভ নারীমর্য্যাদার মহিয়সী শ্রী এবং শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহা নরেশচন্দ্রকে জ্বালাময় সংসারের উত্তাপে ছায়াময় শান্তি দান করে। রমাসুন্দরীর অন্তর আরও সুন্দর। তাঁহার মুখে কেহ কখনও রূঢ় বাক্য শুনে নাই—ধনীর গৃহিণী বলিয়া তাঁহার কোনও গর্ব্ব ছিল না।

কন্যা উমা অনেকটা তাহার মায়েরই মত দেখিতে—স্বভাবও তাহার মায়ের ন্যায় নম্র। পুত্র পরেশচন্দ্র পিতার ন্যায় সবল এবং দেখিতে সুশ্রী কিন্তু বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির। ভৃত্যেরা তাহার দুরন্তপণায় অনেক সময় বিব্রত হইয়া পড়িত—যখন তাহাকে কেহই সামলাইতে পারে না, তখন একমাত্র তাহার দিদিই তাহাকে 'বাগে' আনিতে পারে।

নরেশচন্দ্র রায় নব্যতন্ত্রের যুবক। অত বড় মেয়ের বিবাহ না দিয়া ঘরে রাখিয়াছিলেন, শুধু তাহাই নহে, আবার মেম রাখিয়া ইংরাজী পড়াইতেছেন, সুতরাং ক্ষুদ্র সহরে তাঁহার চালচলন সম্বন্ধে যে একটু নাড়াচাড়া হইবে সেটা এমন বিচিত্র কি! উদার হৃদয় নরেশচন্দ্র যাহাতে নিজের এবং দেশের কল্যাণ হইবে বুঝিতেন, সেই

ধারণামত কাজ করিতেন—তিনি বিনয়ী অথচ তেজস্বী ছিলেন। লোকে কি বলিবে অথবা ভাবিবে, সে সব বিষয়ে তিনি কোন দিনই বড় একটা কাণ দিতেন না। শুভ সঙ্কল্প এবং কল্যাণ কামনার মধ্যে বিধাতার আশীর্ব্বাদ চির-বিদ্যমান থাকে, তিনি বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রের বাধা বিঘ্ন যতই প্রবল হউক না কেন, তাঁহাকে কোনদিনই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তথা-কথিত চিরাগত প্রথা, আচার অথবা অনুষ্ঠানের মধ্যে যে গুলি নিজের অথবা সমাজের ক্ষতিজনক বলিয়া মনে করিতেন, অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সে গুলিকে বর্জ্জন করিতেন; সুতরাং এই অনাচারী দাম্ভিক যুবক জমিদার যে রক্ষণশীল দলের বিরাগভাজন হইয়া পড়িতেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধারণের মত সহজ ভাবে সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাকে তিনি কোনদিনই স্বীকার করিয়া লইতেন না, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই সমাজদ্রোহী খ্রীষ্টান।

বন্ধুদের সঙ্গে পিতা চলিয়া গেলেন—উমা কি জানি কেন অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই বারেণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। আজ তাহার বালিকা হৃদয় অভিমান এবং বেদনায় পূর্ণ।

অপরাহ্ণে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে উমার পিতা বন্ধুগণসহ গৃহে ফিরিলেন। নিদারুণ পরিশ্রমে সকলের দেহ অবসন্ন বটে, কিন্তু মনে খুব ফূর্ত্তি। সকলেরই পোষাক পরিচ্ছদ কর্দ্দমে লিপ্ত। উমা দূরে দাঁড়াইয়া পিতার এই বিচিত্র বেশ দেখিতে লাগিল। শিকারের বোঝা যখন গাড়ী হইতে নামান হইল তখন তাহা দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল!—ইহাই আমোদ, উঃ কি নিষ্ঠুর আমোদ!—এতগুলি নিরপরাধ জীব আজ এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর খেলায় প্রাণ হারাইয়াছে! তাহাদের প্রাণহীন দেহ, মুদ্রিত নয়ন এবং রক্তমাখা অঙ্গ দেখিয়া, তাহার বড় বড় চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাতর বালিকার এই অশ্রুজল, নিবিড় বেদনার এই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা লক্ষ্য করিবার অবসর তখন কাহারও ছিল না! সে আর সেখানে দাঁড়াইল না—অভিমান-পূর্ণ হৃদয়ে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বেলা পড়িল, ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জগতের উপর আপনার ছায়া বিস্তার করিল। উমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে বুঝি আজ আরও গাঢ়তর অন্ধকার নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। স্নিগ্ধ হাসির উজ্জ্বল আলোকে কৈ আজ ত তাহার মুখ ফুটিয়া উঠিতেছে না—আজ যে তাহার সুন্দর মুখখানি সন্ধ্যার ফুলের ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে! সে আজ কোথাও বেশীক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না—প্রাণের ভিতর হইতে ক্রন্দন যেন কোথা হইতে ছাপিয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার পিতা এবং অভ্যাগত বন্ধুরা যেখানে গল্প করিতেছেন, সেখানে গিয়া সে একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দিনের শিকা-

রের কাহিনী তখনও অবাধভাবে চলিতেছে—কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা! সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, তাহার বার বার এই আসা যাওয়া কেহই লক্ষ্য করিতেছে না। সকলেই শিকারের সফলতার আনন্দে ভরপুর!

উমার মাতা রমাসুন্দরী অবধি এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনিও উমার খোঁজ খবর লন নাই। স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের আহারাদির বন্দোবস্ত তাঁহাকে ত করিতে হইবে। বালক পরেশচন্দ্র এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, এবং মাঝে মাঝে শিকারের গল্প শুনিয়া যাইতেছে—সেও আজ দিদির দিকে তেমন ঘেঁসিতেছে না।

আহার প্রস্তুত হইবার পরে উমার একবার খোঁজ পড়িল। ঝি আসিয়া রমাসুন্দরীকে খবর দিয়া গেল যে, "দিদিমণির শরীর ভাল নাই. আজ রেতে তিনি কিছু খাবেন না।" রমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি কন্যার নিকটে আসিলেন এবং উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা, তোর কি হয়েছে রে?" উত্তরে উমা কহিল, "না মা, বিশেষ কিছুই হয় নি, তবে ক্ষিদে নেই, আর মাথাটা কেমন ধরেছে মনে হচ্ছে।" উমার গায়ে হাত দিয়া রমাসুন্দরী দেখিলেন যে, তাহার একটু জ্বরও হয়েছে। উজ্জ্বল দীপালোকে কন্যার ম্লানমুখ জননীর চক্ষু এড়াইল না। তিনি বলিলেন, "উমা, মা আমার, তোর কি হয়েছে?" উমা উত্তরে কহিল, "কি আবার হবে মা, কিছুইত হয়নি!" একি; কন্যার স্বরও যে বেদনাপূর্ণ অভিমানের! তাই তিনি আবার বলিলেন,—"ছি, মা, মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি!" এই বলিয়া তিনি স্নেহের কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন। অপরিসীম মাতৃস্নেহের নিকট রুদ্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া অশ্রুরূপে জননীর পুণ্যবক্ষে বেদনাপূর্ণ প্লাবনের ন্যায় বহিয়া গেল! বিস্মিতা রমাসুন্দরী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—উমার কি হইয়াছে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"উমা, তোর কি হয়েছে?" অশ্রুবর্ষণের পর উমা অনেকটা শান্ত হইয়াছে, সে ধীরে ধীরে বলিল "মা, মরা পাখীগুলা—আর বাবার আনন্দ, এই দুটো জিনিসে আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেছে। আমার কেবল কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।" আহতা কন্যার মর্ম্মবেদনা মাতা বুঝিলেন, তাই তিনি স্নেহের কন্যাকে আবার বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিলেন—সমস্ত বেদনা এবং অকল্যাণ মাতার বিপুল স্নেহ অক্ষয় কবচের ন্যায় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বক্ষ পাতিয়া লইবার জন্য উদ্যত হইল।

রাত্রি ১১টার পর আহারাদি শেষ হইলে কলিকাতার বন্ধুরা চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে রমাসুন্দরী অবসর পাইয়া হাঁফ ছাড়িলেন। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া উমার নিকট গেলেন। নিদ্রাতুরা উমার গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, জ্বর সেই রকমই আছে। তিনি উমার পার্শ্বে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শুইবামাত্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে চায়ের টেবিলে উমাকে না দেখিয়া নরেশচন্দ্র গৃহিণীকে তাহার

অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন না উমা যে প্রত্যহ তাঁহার পূর্ব্বে সেখানে আসিয়া বসে, এবং তাহার হাতের তৈয়ারী চা-পান না করিলে যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। গৃহিণীর উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, গত রাত্রে তাহার সামান্য একটু জ্বর হইয়াছে। চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া গিয়া নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উমাকে দেখিতে গেলেন। তখনও উমা ঘুমাইতেছে—দেখিলেন যে জ্বর সামান্য, কিন্তু সে যাহা হউক তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ডাক্তার আসিলেন এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। সামান্য অসুখ, কিন্তু উমার মাতা কেন যেন একটু বেশীমাত্রায় ভয় পাইলেন।

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল, উমার জ্বরত এখনও ছাড়িল না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় রমাসুন্দরীর মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সাত দিনের মাথায় রোগ আবার হঠাৎ বৃদ্ধি পাইল—ডাক্তরের ঔষধ অথবা ব্যবস্থার কোনটারই বাগ মানিল না। সে যেন দুরন্ত ঘোড়ার মতন সমস্ত রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ ছুটিতে চায়!

ডাক্তর ভয় পাইলেন। এই জমিদার কন্যার পীড়ার দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চাহিলেন, তাই তিনি নরেশচন্দ্রকে তার পরদিনই বলিলেন—"মহাশয়, আমার দ্বারা যে বিশেষ কোনও উপকার হবে, তাত মনে হয় না; আপনারা অন্য চেষ্টা দেখ্‌তে পারেন। আমার মনে হয়, কল্‌কেতার কোনও বড় ডাক্তরকে দেখানই যেন ভাল।" ডাক্তরের কথা শুনিয়া নরেশচন্দ্র একটু দমিলেন। কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ সাহেব ডাক্তরকে আনিবার জন্য তখনই তাঁহার মোটরকার ছুটিল।

সাহেব ডাক্তর আসিলেন। রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং পরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সাদাসিধা রকমের টাইফয়েড জ্বর হইয়াছে, তবে এখনও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যদি কোন উপসর্গ না জুটে এবং যাহাতে না জুটে সে বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখিবেন, তবে, তাঁহার মনে হয়, বালিকা শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবে। তাঁহার আশ্বাস বাক্যে পিতা মাতার উদ্বেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল।

বিচক্ষণ সাহেব ডাক্তরের চিকিৎসার ফল হইল—উমা এখন অনেকটা ভাল আছে। সাহেব বলিয়াছেন আর যদি এই ভাবে ৪।৫ দিন কাটে, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে সে রোগমুক্ত হইবে।

উমার পীড়ায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত—বালক পরেশচন্দ্রের দিকে এখন আর কাহারও বড় দৃষ্টি নাই। সে বেচারাও দিদির অসুখ হওয়াতে বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে। সহসা তাহার চঞ্চল প্রকৃতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; সে আজকাল বড় গম্ভীর হইয়াছে। দিদির সঙ্গে সে খেলিতে পায় না, দিদি আর তাহার সঙ্গে গল্প করে না। সে দিনের

মধ্যে কতবার যে দিদির কাছে ছুটিয়া আসে এবং রোগশয্যাশায়িতা দিদির ম্লান মুখখানি দেখে, দিদির কাছে ঘেসিয়া বসে। দিদিগতপ্রাণ এই অবুঝ ছোট ভাইটির আদর, উমার বেদনাপীড়িত রোগযন্ত্রণার মধ্যে কি একটা অনাবিল শান্তি আনিয়া দেয়। এই স্নেহকাতর বালক যখন আপনার ক্ষুদ্র বাহুর বেষ্টনে তাহার কণ্ঠ আঁকড়িয়া ধরিয়া সুধাকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, "দিদি, তুমি কবে ভাল হবে", বাস্তবিকই উমা তখন একটু বিব্রত হইয়া পড়িত এবং এই সরল হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে শান্ত করিবার জন্য উত্তরে বলিত "খোকা, ভাল হয়ে উঠেই আমি তোর সঙ্গে খেলা করব এবং তোকে অনেক নতুন নতুন মজার গল্প বল্‌ব।" খোকা দিদির কথায় আশ্বস্ত হইত এবং আপনার মনে গল্‌গল্‌ করিয়া কত কথাই না বলিত। দিদি যখন একটু ভাল থাকে খোকা অমি তার সঙ্গে গল্প করিয়া আসে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

ভবিষ্যতের মহিলা।

নারীচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কি? কোন একটি মহানারীর চরিত্রকে কি আদর্শ বলা যাইতে পারে? এ সকল প্রশ্ন আজকাল সকলের মনেই উপস্থিত হইতেছে। এ দেশের সীতা সতী, সাবিত্রীর চরিত্রের প্রতি সম্মান আমাদের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, এ দেশ চিরদিন তাঁহাদের স্মৃতি যত্নে পূজা করিবে, কিন্তু রাবেয়ার চরিত্রের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, ফ্লোরেন্‌স্‌ নাইটিঙ্গেলের চরিত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, মেডাম গেঁয়োকে যাঁহারা ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, স্বর্গগত জেনেরেল বুথের পত্নীর চরিত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রাচীন আর্য্য আদর্শকে প্রসারিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশের অহল্যাবাই, রাণী শরৎসুন্দরী, রমাবাই প্রভৃতির মহৎ জীবন আলোচনা করিলেও তাঁহাদিগকে মান্যের আসন দিতে হয়। আমাদিগের পরিচিত ধর্ম্মশীলা নারীগণের প্রতি আমাদিগের ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক ও অটল; তাঁহাদিগের নীরবে আত্মদান, বিশ্বাস, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সংযম, পাতিব্রত্য এ সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এ দেশের নারীচরিত্রের এমন অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখনও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের জীবনের কথা জগতের নিকট উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হইলে তাঁহারা সকল দেশের সকল নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা আপনাদিগের মহত্ত্ব আপনারাই জানেন না, এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক আত্মদানের মহিমা প্রকাশ করিলে যেন তাঁহাদিগের স্বাভাবিকতাকেই বিনাশ করা হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরব খর্ব্ব করিতে কেহ ইচ্ছা করে না। আমরা জাতীয় এই মহা সম্পদরূপ নারীজাতির ধর্ম্মনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, আত্মবলিদান প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিয়াও এ কথা ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, সময়ের স্রোতে অথবা বিধাতার বিধানে সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নরনারীর কর্ত্তব্যের ভূমিও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তখন তাহা আমাদিগের সামাজিক জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন আনিতে চাহিতেছে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। এ জন্য আমাদিগের মাতৃজাতির প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গুণ সকলের সহিত অপর কতকগুলি গুণকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা এ বিষয়ে কয়েকটি সারবান কথা বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"যদি ভবিষ্যতে এ দেশের সামাজিক ভারকেন্দ্র কিছু সরিয়া যায়, যদি ভারতবর্ষের জ্ঞানাকাশে নূতন আদর্শ সকলের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তনের ফল নারীজাতিও ভোগ করিবে শুধু তাহা নয়, কিন্তু নারীগণ এই পরিবর্ত্তন সংসাধনে বিশেষ সাহায্য করিবেন। কারণ গৃহস্থের গৃহেই স্বর্গের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, কারখানাতে প্রত্যাদেশ আসে না, এ দেশের স্কুল সমূহেও সে প্রত্যাদেশ আসিতে পারে না, ফলে এখানকার স্কুলগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার কারখানা মাত্র, কারণ তাহা শিখিলে ভবিষ্যতে কেরাণীগিরি জুটিবে। লোহার কারখানায় বা কাঠের কারখানায় কাজ শিখিলে যেমন অন্য স্থানে কর্ম্ম পাইবে, ইহাও সেইরূপ। এ যুগে সকলই জনসংখ্যা লইয়া অথবা গুণের বর্ণনা পত্র লইয়া স্থির করা হয়, সেইরূপ লিখিতে পড়িতে পারে কি না তাই দিয়া মানসিক উন্নতির পরিমাণ স্থির করা হয়, যেন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা পড়াটা সেক্সপিয়ারের মাতা হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাপার।

"ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন ছিল—এ যুগেও উদ্দেশ্য বা আদর্শ অন্য কিছু হইতে পারে না। এরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিলে লেখা ও পড়া মাত্র বিশেষ লক্ষ্য হইতে পারে না—দিন দিন অধিক সংখ্যক নারী লিখিতে পড়িতে শিখিবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইবে জাতীয় আদর্শটাকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা ও উৎসাহের সহিত গ্রহণ করা এবং সমগ্র জাতির ও দেশের সহিত প্রতি ব্যক্তির যে সম্বন্ধ ও দায়িত্ব তাহা উপলব্ধি করা।

"স্বদেশ সম্বন্ধে, দেশের ও সমাজের অতীতের সম্বন্ধে যখন নারী আপনার প্রকৃত স্থান লাভ করিবেন, যখন দেশের নারীগণ স্বদেশবাসীর অভাব সকল দর্শন করিবেন, কি মহা অভাবে দেশ পড়িয়া আছে তাহা যখন দেখিতে পাইবেন, যখন মাতৃজাতি কেবল নিজ নিজ পরিবারের বিষয় লইয়া বা নিজ গ্রামের বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন না, সমস্ত দেশের লোকের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিবেন, যখন ভালবাসার অনুরোধে

জ্ঞানযোগে সত্য অবস্থা অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইবেন, তখন—কেবল তখনই—এ দেশের ভবিষ্যতের নূতন নারীজাতির মহত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। তখনই কেবল উপযুক্ত শিক্ষার সময় হইবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় মহান আদর্শ প্রকাশিত হইবে।"

ভগিনী নিবেদিতা সাধারণ ভাবে ভবিষ্যতের নারীচরিত্রের উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপদেশটি যত্নে গ্রহণ করিলাম; কিন্তু আমরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইতে পারি না, নূতন যুগে নূতন ভাবে সকল দূর দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে, সকল দেশের বিশেষ বিশেষ গুণ ও মহা মহা অভাব আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এ সময়ে যাঁহারা আপনার পরিবার বা গ্রাম ত্যাগ করিয়া একটু বাহিরে যাইবেন, তাঁহাদের নিকট শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও শত শত অভাব একই সময়ে উপস্থিত হইবে। যে সকল নারী চিরজীবন গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি হঠাৎ একদিন কলিকাতায় ব্যবসায় ব্যস্ততা ও মোটরকার প্রভৃতির সাংঘাতিক দ্রুতগতির মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে যেমন তাঁহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা **ও স্ব স্ব** কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, এরূপ ভাবে সমস্ত পৃথিবীর মহা ব্যস্ততার মধ্যে একাকী উপস্থিত হইলেও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মহিলাগণকে কোন আকস্মিক ও অসহ্য পরিবর্ত্তনের ভিতর যাইতে হইবে না। নূতন সময়ে যে পাশ্চাত্য অবতীর্ণ হইয়াছে, রেলপথ সংবাদপত্র প্রভৃতি দিন দিন যে অবস্থার পরিচয় আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, তাহাতে এখন যে কোন নারী আপনার স্বভাবের মূলধন রক্ষা করিয়া এবং দেশের বিশেষত্ব জীবনে গ্রহণ করিয়া প্রেম ও সহানুভূতির ক্ষেত্র অতি সহজ ভাবে বিস্তৃত করিতে পারেন। সমন্বয়বাদ যেমন বলিতেছেন যে, কাহারও সত্যসম্পদ্ ত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু অন্য সকলের সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে হইবে, ভবিষ্যতের নারী চরিত্রের আদর্শও তাহাই হইবে। নারী আপনার উপস্থিত গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া জগতের দুঃখ দেখিয়া জনসেবায় জীবন দিবেন তাহা হইতে পারে না, তাঁহাকে আপনার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া পরে যথাসাধ্য অন্য সম্পর্কে কর্ত্তব্য করিতে হইবে। কিন্তু মনে হয়, বর্ত্তমানে পৃথিবী যেরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কতকগুলি নারী আপনার জীবনকে অন্য কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত রাখিয়া জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে জীবন সমর্পণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। এইরূপ সেবিকা দলের প্রয়োজন সর্ব্বত্র অনুভব করা যাইতেছে।

এই শ্রেণীর প্রেরিতা মহানারী সকল আসিয়া ভবিষ্যতের নারীর আদর্শ পরিস্ফুট করিয়া দিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে উপস্থিত যাঁহারা বিশ্বপ্রেমের স্পর্শ অনুভব করিতেছেন, যাঁহারা আপনাদিগের পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া কিছু

সময় ও শক্তি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা প্রতিবেশীর প্রয়োজন অনুসারে সেবা করিলে ও অবস্থা অনুসারে আত্মোন্নতি ও প্রতিবেশীর উন্নতির চেষ্টা করিলে এখনই জগতের সমূহ মঙ্গল হয়। বর্ত্তমান সময় উন্নতির সময়—এখন গার্হস্থ্য জীবনকে উন্নত করিতে হইবে, পরিবারকে উচ্চ আদর্শে গঠিত করিতে হইবে এবং গৃহের বাহিরে যে বিবিধ কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা দর্শন করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। যাঁহারা আর্য্য মহিলার মহত্ত্ব দেখিয়া ও অন্যকে দেখাইয়া নিজেরা কিছু করিতে প্রস্তুত হন না, তাঁহারা উন্নতির স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা এই স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াও উন্নতির পথে চলিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। নারীজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা কেবল জীবন, ধর্ম্ম, ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, কিন্তু নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রকাশিত জ্ঞান, শক্তি, আত্মত্যাগ, ভগবদ্ভক্তির আলোক দর্শন করিয়া সেই অনুসারে অগ্রসর হইবেন, ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকেই পূজনীয় নারী বা মহিলা বলিয়া সম্মান দান করিবে।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষা।

শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের অভিমত।

(উদ্ধৃত)

জ্ঞান-শিক্ষা বা পড়াশুনার সঙ্গে খোলা জায়গায় পরিশ্রমজনক খেলা ও ব্যায়াম যুক্ত থাকলে সকল প্রকার শক্তি এবং সাহস বাড়ে, কোন একটা বিষয়কে আপনার আয়ত্ত ক'রবার শক্তি জাগে। ইংলণ্ডের মহিলাগণ নানাপ্রকার অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম ক'রে যে শক্তি লাভ ক'রেছেন, তার তুলনায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের ইংরাজ-নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, দুর্ব্বলতাই যেন তখনকার মেয়েদের ভূষণ ছিল! বহু পূর্ব্বের ইংরাজমহিলাগণ এবং মহাভারতের যুগের রাজপুতানার এবং মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার সময়ের ভারত-মহিলাগণও, শক্তি ও সাহসের আদর্শস্থল ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতনারীর জীবনের উপর দিয়ে মহাপরিবর্ত্তনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে; তা'তে তাদের হৃদয়ে নূতন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। কত স্থানে বহুসংখ্যক মহিলা মহিলাদের বক্তৃতা শুনবার জন্য সভায় যাচ্ছেন, এবং মহিলা-বক্তাদের বক্তৃতাও পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ—ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব এবং ইংরাজ নারীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। কিন্তু ভারতনারী চিরদিনই এখনকার মত জাতীয় সমস্যা সকল হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, গৃহকোণে বাস করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকজন বিশেষ শক্তিশালিনী নারী

স্বদেশের পালন ও শাসনকর্ত্রী ছিলেন। মহারাষ্ট্র মহিলাদের পাঠসমিতি, শিল্পসমিতি, বক্তৃতা-সভা প্রভৃতি নানা প্রকার সভা সমিতি ক্লাব দেশময় ছড়ান; এসব সভায় মেয়েরা স্বাধীন ভাবে মিলে মিশে আপনাদের উন্নতি সাধন করে। বাঙ্গালা দেশে পর্দ্দা আছে, সেথাকার স্ত্রী-শিক্ষা হয় শাস্ত্রপাঠ ব্যাখ্যা ও কথকতা প্রভৃতির দ্বারা। শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট দেখে যারা স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা নির্ণয় করে, তারা ভুল করে।

শিক্ষা ও সমাজ দুইদিক দিয়ে ইংরাজ জাতির প্রভাব ভারত-নারীর উপর কাজ ক'রেছে। ইংরাজের সামাজিক প্রভাব একবারে নির্দ্দোষ নয়। এদেশের মেয়েরা যখন হঠাৎ ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ভদ্র অভদ্র, সব মিশ্রিত ভারত-প্রবাসী ইংরাজ-মহিলাদের সঙ্গে মেশে, তখন, (অনভিজ্ঞতার জন্য) তারা বুঝ্‌তে পারে না যে ইংরাজ-সমাজের কি ভাল আর মন্দ; তারা যা দেখে তাই অনুকরণীয় মনে করে। এর ফল সব সময় ভাল হয় না। এদেশের মেয়েরা যদি তাদের নিজেদের সুরুচি এবং স্বাধীন বিচার শক্তির অনুকরণ করে, তাহলে আর কোন ভয় থাকে না; কিন্তু অনেক সময় অনুকরণ-প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তার ফলে তারা নানা প্রকার অশোভন অথচ ব্যয়বহুল পরিচ্ছদের সৃষ্টি করে। এসব দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিস্তার। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি আর নাই; এখন অনেক ভেবে, চিন্তা ক'রে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করতে হবে।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বিস্তার ও পরিচালন ভারতবাসীর দ্বারা হওয়া উচিত। তা না হ'লে দেশের মর্ম্মস্থলে কালী পড়্‌বে, মেয়েরা ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাব বর্জ্জিত হবে। এদেশের মেয়েদের ধর্ম্ম ধারণার মধ্যে উজ্জ্বল জ্ঞান, এবং স্পষ্ট অনুভূতি নাই; সত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা তারা বুঝ্‌তে পারে, কিন্তু তাদের শিখান হয় কেবল কতগুলা বাঁধা ক্রিয়া-কলাপ; সেগুলা তারা অন্ধভাবে ক'রে যায়। "ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান যোগ কর।" মেয়েদের শিক্ষার যে ব্যবস্থাই হোক না কেন, ধর্ম্মের উন্নত আধ্যাত্মিকতা এর গোড়ায় থাকা উচিত। এই ধর্ম্মভাব যদি অন্তরে না থাকে ভারতবর্ষ শ্মশান-তুল্য হবে।

স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে, স্বদেশপ্রেম এবং মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যবোধ এবং তার দুঃখ দূর ক'রবার জন্য স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিতে হবে। ভারতের ইতিহাস এই শিক্ষার উপকরণে পরিপূর্ণ। * * *

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের ইতিহাস, ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র, ভারতের কাব্য, ভারতের শিল্প প্রভৃতিরই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষা কেবল বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত না হয়ে যদি আরও বেশী কিছু হয়, তা হলে বাল্যবিবাহ একবারে দূর করা আবশ্যক। ৭—৮, ৯—১০, ১১—১২ বছরের বালিকার যদি বিয়ে হয়, আর ১৩-১৪ বছর বয়সেই যদি তারা মা হয়, তা হলে তারা কখন কি শিখবে? শৈশব উত্তীর্ণ না হতে কোলে শিশু লয়ে—শিক্ষার কথা না বলাই

জাল। বাল্যবিবাহ যে কি প্রকার জঘন্য ব্যাপার, অভ্যাস ও দেশাচারের অন্ধতায় তা এ দেশের লোক বুঝ্‌তেই পারে না। অসহায় বালিকাদিগকে টাকা দিয়া কেনা পাত্রদের হাতে ক্রীতদাসীর মত দেওয়া হয়। বালিকারা যেন ঘটি বাটীর মত বস্তু-বিশেষ! এ অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন এ দেশের উঠবার আশা নাই।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, খাদ্যপাক, গৃহচিকিৎসা, দুর্ঘটনার প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। শারীরিক ব্যায়াম অঙ্গ-চালনাও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যারা উচ্চশিক্ষা চায়, তাদের সংখ্যা কম, তারা সাধারণ কলেজেই পড়্‌বে।

সম্ভব হলে মেয়েরা বাড়ী হতে এসে স্কুলে পড়ে যাবে, এই ব্যবস্থাই ভাল। স্কুলের বোর্ডিংএ বাস যত বাদ দেওয়া যায় ততই ভাল। যদি কোথাও মেয়েদের বোর্ডিং করতে হয়, তা হলে ভদ্রবংশের কোন বয়স্কা মাতৃস্থানীয়া নারীর হাতে ভার দেওয়া উচিত। তিনি মেয়েদের মা হবেন এবং মেয়েরা ঠিক বাড়ীর মত থাকবে, এমন হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—নরনারী একত্রে এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তার চেষ্টা কর্‌লে, এ দেশের বালিকাগণ মনস্বিনী নারী হ'য়ে উঠ্‌বেন। ভারত-মহিলা কি ছিলেন, তা আমরা জানি, এখনও সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা যে কি তা দেখছি—জগতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রমণী কোন দেশে নাই। আমরা আশা করি ভবিষ্যৎ ভারত-মহিলা জ্ঞানে গার্গী, সাহসে সাবিত্রী, প্রেমে সীতা, সহিষ্ণুতায় দময়ন্তী, এবং বিশ্বস্ততায় শকুন্তলার মত হবে।

কুমারী মারগারেট কপিন।

(উদ্ধৃত।)

কুমারী মার্‌গারেট কপিন্ বেল্‌জিয়ামের একজন বিখ্যাত লেখক ও কবি। তিনি তাঁর বৃদ্ধ মার সঙ্গে ব্রাজেস্ নগরে বাস করতেন। যুদ্ধের সময় মাকে নিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান। এখন লণ্ডনে বাস করছেন। তিনি প্রায় বিশ বছর একখানি দৈনিক কাগজে লিখে আস্‌ছেন। সংবাদপত্রে সুলেখিকা ব'লে তাঁর খুব মান আছে। কিন্তু কেবল তাই নয়, তিনি একজন বড় দরের কবি। বেলজিয়ামের লোকেরা তাঁকে "রাজ-কবি" বলে, অর্থাৎ তিনি বর্ত্তমান সময়ে বেলজিয়ামের শ্রেষ্ঠ কবি। ফ্রান্সের একাডেমী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সভা,—এ পর্য্যন্ত কোন নারী সে সভার সভ্য হ'তে পারেন নাই। এই সভায় নারী সভ্য করার নিয়ম নাই ব'লে তাঁরা এঁকে সহযোগী সভ্য করে নিয়েছেন। তাঁর লেখার জন্য তিনি অনেকবার সোণার ও রূপার মেডেল

পেয়েছেন। ফ্রেঞ্চ্ একাডেমী তাঁকে যে সভাচিহ্ন দিয়েছিলেন, তাঁর ভিতরে একটা রূপার তালপাতা ছিল, ইংলণ্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে সেটাও বিক্রি কর্‌তে হ'য়েছিল!

তিনি বেল্‌জিয়াম্ সম্বন্ধে ব'লেছেন,—বেল্‌জিয়াম্ অন্য দেশের মত ঠিক একটী দেশ নয়। কতগুলি ছোট বড় নগর আছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটী যেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; প্রতি জেলার লোকেরা নিজের শাসন ও পালনের ব্যবস্থা করে, তাদের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যেন একজন ছোট রাজা। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত বেল্‌জিয়াম্ যে একটা দেশ এবং এ দেশের জন্য যে সকল জেলার লোক মিলে একটা কিছু কর্‌তে হবে, এ কথা কেও স্বপ্নেও জান্‌তো না। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখনও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বল'তো, "আমাদের কি?—জার্ম্মানরা তো এখানে আসে নাই! আমরা গরিব মানুষ,—কাজ চাই; খাবার চাই!" দেখ্‌তে দেখ্‌তে জার্ম্মানগণ নগর গ্রাম ধ্বংস কর্‌তে লাগ্‌ল, ব্যবসা বাণিজ্য কোথায় গেল।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমরা কিছু রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। যখন যুদ্ধ ঘোষণা হ'ল—আমরা সর্ব্বদা ব্যাকুল হ'য়েছিলাম কখন ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য আস্‌বে,—এই এ'লো, একবার ষ্টেসনের দিকে লোক যায়, একবার সমুদ্রের ধারে! কিন্তু ১৭ দিন আমরা এক্‌লা যুদ্ধ করেছি। ২৫০,০০০ সৈন্যের মধ্যে এখন আমাদের মাত্র ৮০,০০০ সৈন্য জীবিত আছে। জার্ম্মানদের অত্যাচারের কথা আর কি ব'লবো! আমরা ভেবেছিলাম তারা কেবল রাস্তা ক'রে নিয়ে ফ্রান্সে যাবে, কিন্তু তারা নিরীহ অসহায় নরনারী ও শিশুদের প্রতি যে রকম অত্যাচার ক'রেছে তা বর্ণনা করা যায় না।

যখন বোঝা গেল যে জার্ম্মান সৈন্যের গতিরোধ করা অসম্ভব তখন নগরে নগরে যে সব সাধারণ লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারাও কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারে, যুদ্ধের সাজ খুলে রেখে বন্দুক লুকিয়ে রেখেছিল,—এইজন্য যে তারা চলে যাক্, বাধা দিয়ে বৃথা অত্যাচার কাটাকাটি করে দরকার কি। জার্ম্মানগণ প্রতি নগরে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে খাবার খেয়েছে, হোটেলে গিয়ে খেয়েছে, কিন্তু তবুও নিরীহ লোকদের উপর অসভ্যের মত অত্যাচার ক'রেছে!

ইনি এখন ইংরাজী কাগজে লিখে দিন চালাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ বেল্‌জিয়ামের সঙ্গে ইনি ইংলণ্ডে আশ্রয় পেয়ে, শত মুখে ইংলণ্ডবাসীর প্রশংসা কর্‌ছেন। ব্রাজেসের কলেজে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁর কয়েকজন ছাত্রী বাস করেন। দেশের দুর্দ্দিনে প্রবাসী কবির নারী-হৃদয় আর সব ভুলে এখন কেবল দেশের জন্যই কাঁদছে, এখন তাঁর সকল লেখাই দেশের জন্য অশ্রুপাত।

আজিকে।

আজিকে কেন এমন গহন রাত ?
নাইকো শশী নাইকো তারা,
কালো আকাশ পাত ?
কেবল স্তব্ধ নীরব নিশি—
মেলিয়া আঁচল তার,
সারা জগৎ ভরিয়ে দেছে,
নিবিড় অন্ধকার।
বাতাস কেন স্তব্ধ হেন,
দোলে না পাতা যে গাছে ?
সারা জগৎ ধ্যানে মগ্ন,
ডুবিয়া কাহার মাঝে ?
সহসা যেন স্পর্শে কাহার,
ভরিয়ে গেল এ প্রাণ,
সহসা মোর মর্ম্ম মাঝে,
বাজিছে কাহার গান।
সহসা আমার হৃদয় যেন,
ফুলের মতই ফুটে,
প্রেমের আনন্দে চরণে কার,
ঝরিয়া পড়িল টুটে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইয়ুরোপের মহা যুদ্ধ এগার মাস ভীষণ উৎসাহে প্রাণ ও ধননাশ করিয়াছে এখনও তাহার উৎসাহ কিছুই হ্রাস হয় নাই। আরও কত সর্ব্বনাশ করিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যেমন ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ হইলে রোগীর নিজের আর কোন স্বাধীনতা থাকে না, রোগ নিজের স্বভাব অনুসারে লক্ষণের পর লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, চিকিৎসা যত্ন দ্বারা রোগ আরোগ্য হয় না, তবে কোন কোন স্থলে রোগের সমস্ত বেগ সহ্য করিয়াও রোগীর জীবন দাড়াইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে রোগের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী প্রাণ হারায়। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে অবস্থা দিন দিন দেখা যাইতেছে তাহাতে ইয়ুরোপই প্রাণ হারায়, কি যুদ্ধ তেজক্ষয়ে নিবৃত্ত হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যেরূপ প্রাণনাশ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উভয় পক্ষের হত ও আহতের মোট সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ হইবে। যদি যুদ্ধে নিযুক্ত সব কয়টি জাতির সমর-সৈন্য বিনাশ পর্য্যন্ত যুদ্ধের বেগ চলিতে থাকে, তাহা হইলে হয়ত আরও তিন বৎসর এই রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তখন সকল জাতিই অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রতিবেশীর প্রাণনাশ করিবার শক্তি মানুষের গৌরবের বিষয় নহে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।"
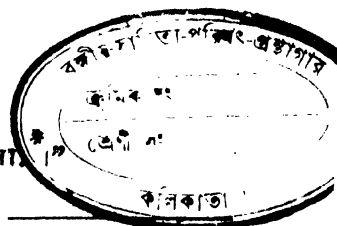
২১শ ভাগ] আষাঢ়, ১৩২২। [৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বনিয়ন্তা, তুমি মঙ্গলময় আমরা বিশ্বাস করি। তোমার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করিয়াই আমরা বলি "ভূকম্প ঝটিকা বজ্রে ক্ষণেক নাই ব্যভিচার।" আমাদের যত ভয় বিপদ দুঃখ মৃত্যু উপস্থিত হউক না কেন, তুমি তাহার ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমস্ত জগতের মঙ্গল করিতেছ। বর্ত্তমান সময়ে যে মহাযুদ্ধ হইতেছে যাহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইতেছে, কত দেশের নিরীহ প্রজাগণের সর্ব্বনাশ হইতেছে ইহাও তোমারই বিধান---তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এই কালাগ্নির যুদ্ধ আসিয়াছে ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দেও। আমরা অল্পবিশ্বাসী নরনারী, এত বড় মহাবিনাশ দর্শন করিয়া আমরা ভীত হইতেছি, তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, এই ভয় যেন আমাদিগকে তোমার চরণে শরণাপন্ন করে; তুমি বুঝি পৃথিবীর প্রতি বিমুখ হইয়াছ, এরূপ সাঙ্ঘাতিক নাস্তিকতা যেন আমাদের কাহারও অন্তরে উপস্থিত না হয়। পৃথিবীর উপর কিছু মঙ্গলবারি বর্ষণ করিবার তোমার অভিপ্রায়, তাহারই পূর্ব্বাভাসস্বরূপ ঘোর ঘনঘটা বিদ্যুৎ বজ্রপাত হইতেছে। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই ঘোর অন্ধকারের দিনে যেন আমরা তোমার মঙ্গলস্বরূপে নির্ভর করিয়া আশ্বস্ত ও শান্তচিত্ত থাকিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

য়ুরোপের ভীষণ যুদ্ধ।

আমাদের দেশে যুদ্ধ হইতেছে না—আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অতি অল্প লোকই যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত, যুদ্ধের ফলাফল আমাদের পক্ষে বিশেষ কিছু নহে, এ সকল

কথা ভাবিলে মনে হয়, আমাদের দেশে যুদ্ধ লইয়া অধিক আন্দোলন হইবার কারণ নাই ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা নহে, এ দেশের পুরুষ নারী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সকলের মনেই যুদ্ধের ভাবনা সর্ব্বদা উপস্থিত রহিয়াছে। সকলেই যে সকল সংবাদ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থার কথা আলোচনা করিতেছে তাহা নহে, কারণ যাঁহারা সংবাদ পত্রাদি পাঠ করেন তাঁহারাও প্রকৃত অবস্থা অল্পই জানিতে পারিতেছেন, এবং সাধারণকে সকল কথা জানান হইবে না ইহা যুদ্ধনীতির অন্তর্গত প্রয়োজনীয় বিধান। এই সকল কারণে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ অথচ সকলেই যুদ্ধের ভাবনা ভাবিতেছে এবং যেখানে ২।৫ জন মিলিত হইতেছে সেখানেই যুদ্ধের কথা আলোচনা হইতেছে। ইহার কারণ এই যে য়ুরোপের এই যুদ্ধে আমাদের দেশের ব্যবসায়, কৃষি বাণিজ্য এমন কি শিক্ষাবিভাগ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে যেমন নির্ব্বিঘ্নে সকল বিভাগে উন্নতি হইতেছিল, এখন আর তাহা হইতেছে না। বর্ত্তমান বংশের লোকে এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কথা কখনও শুনে নাই। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে আজও পর্য্যন্ত এত বড় যুদ্ধ কখনও হয় নাই, কাজেই এ ব্যাপার সকলের অন্তরে সর্ব্বদা জাগিতেছে, এবং ইহার আলোচনা সর্ব্বত্র হইতেছে।

গত কয়েক বৎসর শান্তির বিষয় অনেক কল্পনা জল্পনা চলিয়াছে। সভ্যজগতে আর মহাযুদ্ধ যাহাতে না হয় উদারনীতির শান্তিপ্রিয় মনস্বিগণ তাহার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন। এমন কি অনেকেই আশা করিতেছিলেন যে, হেগ নগরের শান্তিসভা বা মধ্যস্থ সভা আরও সুব্যবস্থিত হইলে এক জাতির সহিত অন্য জাতির যাহা কিছু বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহা মধ্যস্থ সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে মীমাংসা হইবে। ইংলণ্ডের রাজা ভারতসম্রাট স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ড এ বিষয়ে অনেক মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং মেঃ রুসভেল্ট যখন আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনিও পৃথিবীর অশান্তি নিবারণ করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন।

কিন্তু যখন সামান্য সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন মনে হয় যেন যুদ্ধ অনিবার্য্য ; সকল চেষ্টা পরামর্শ, মধ্যস্থ সভা সকলই অক্ষম—কোন সন্ধিপত্র যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারে না। খড়ের ছাওয়া পরস্পর লাগালাগী বাজারের চালাগুলি যেমন এক সামান্য অগ্নি সংযোগে ক্ষণকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা কোন কোন মাল গুদামে বন্ধ থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া আপনারা দগ্ধ হইয়া যায়—য়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ সেইরূপভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সাম্যের উপর য়ুরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রবলপ্রতাপ রাজারা যদিও আপনাদের রাজ্য ও শক্তি বাড়াইতে একান্ত লোলুপ ছিলেন, তথাপি অন্য সকল রাজ্যের পক্ষে অসহ্য হইবে বলিয়া সে কথা প্রকাশ না করিয়া ভদ্র ভাবে

বলিলেন, আমি এই পর্য্যন্ত পাইয়া তৃপ্ত হইয়া রহিলাম। বড় বড় রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছোট রাজ্যকে রাখা হইয়াছিল, তাহা কেবল বড় রাজ্যের সুবিধার জন্য। এইরূপ একটা কপট সাম্যের উপর শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক রাজ্যই আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত ছিল। দেশের রসায়ন বিদ্যা, বস্তুবিদ্যা—অন্য সকল প্রকার বিদ্যা দ্বারা যাহাতে যুদ্ধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহাই সকল দেশের দৃষ্টি ছিল।

এ কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, বহু সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্যজাতি আকাশে উড়িতে সাধ করিতেছিল, বর্ত্তমান যুগের বিদ্যাবলে সেই আকাশ বিহার সম্ভব ও সুগম হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখা যাইতেছে এই বিদ্যাটি যেন কেবল যুদ্ধবিদ্যা প্রসারণের জন্যই লাভ হইয়াছে। সমুদ্রগর্ভে বিচরণ মনুষ্যের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, আজ তাহা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই নবাবিষ্কৃত বিদ্যাটি যুদ্ধের সাহায্যের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে মনে হয় অন্যান্য বিভাগে যে কিছু নূতন শক্তি আবিষ্কৃত হইবে সে সমস্তই হিংসাবৃত্তি তৃপ্ত করিতে ব্যয়িত হইবে। এই কপট অস্থায়ী সাম্যের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন এক দেশ অতিরিক্ত যুদ্ধ সজ্জা করিলে অপর সকল রাজ্য তাহাতে আপত্তি করিত, এই জন্য কোন বৎসর কোন দেশ নৌ যুদ্ধ বা স্থল যুদ্ধের জন্য কত বল সংগ্রহ করিবে তাহা অপর সকল জাতিকে বলিতে হইত ও তাহাতে সকলেই সমান ভাবে আপন আপন দেশের যুদ্ধশক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছিল; কিন্তু এরূপ বন্ধনে প্রবৃত্তি কখনও দমন হয় না।

জর্ম্মণজাতি অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন। এ জাতি যখন তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তখন আপনার প্রতিভাবলে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল। ক্যাণ্ট হেগেল প্রভৃতি মহামনস্বীর মত বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিত কে আছে? জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত হইয়া যখন শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিল, তখন সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ও সৌখিন সামগ্রী প্রস্তুত করিতেও অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। আমাদের দৈনিক ব্যবহারের ও ঔষধাদির বহু দ্রব্য জর্ম্মণীতে প্রস্তুত হইত। তবে এই মহা উদ্যমশীল জাতি এই সকল উন্নতিতে তৃপ্ত হইতে পারিল না, আপনাদিগের রাজ্যবিস্তার করিতে ও দেশের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে গোপনে গোপনে বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইতেছিল। এখন শুনা যাইতেছে যে, জর্ম্মণজাতি যে এত বড় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে তাহা পূর্ব্বে কেহই সন্দেহ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে যখন প্রতিবেশীর প্রতি আপনার অধিকার অস্তরের সংকল্প, যখন মূল উদ্দেশ্যটা অন্যায় কার্য্য, তখন তাহা সাধনের জন্য যে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত অন্যায় কার্য্য করা হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? গোপনে যুদ্ধের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ

করিয়া এবং শত্রুদিগের অভাব অপূর্ণতার সংবাদ লইয়া যখন এই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরমোন্নতি কি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধকে আকস্মিক ব্যাপার অথবা জাতি বিশেষের পশুভাবের প্রকাশ না বলাই শ্রেয়, কারণ এখন দেখা যাইতেছে যেমন তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ পল্লীতে মধ্যে মধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়, যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়া গ্রাম নগর সকল নষ্ট হয়, এ যুদ্ধ সেইরূপ একটি স্বভাবের অঙ্গীভূত কার্য্য। ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মনুষ্য মাত্রেই মনুষ্যের মৃত্যুকে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করে, যখন মহামারি দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতিতে বহুসংখ্যক নরনারী এক সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মানুষের হৃদয়ে মহা ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা নিরীহ বাঙ্গালী, মানুষের প্রাণবধ হওয়া আমাদিগের নিকট অত্যন্ত ভীষণ ব্যাপার, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা আমাদিগের এই-রূপ কোমল ভাবকে বিশেষ সম্মান দান করেন না। পরমেশ্বর যেমন কোটী কোটী জীব জন্তু সৃষ্টি করিতেছেন, তেমনই তাহাদিগের প্রাণনাশও আপনি করিতেছেন। আমরা যে অকাল মৃত্যুকে অতি অন্যায় মনে করি সে বিচার পরমেশ্বরের কার্য্যে চলে না, কারণ কাল তাঁহার ইচ্ছা—যখন তাঁহার ইচ্ছা হইল মৃত্যু হউক, তখনই ঠিক কাল হইল।

এই জন্য যখন বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অনন্ত অগণ্য লীলার বিষয় স্মরণ করা হয় তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এত লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ অবশ্য তাঁহার ইচ্ছায় হইতেছে এবং এই মহা ভীষণ ধনপ্রাণনাশকারী সংগ্রামে যে জাতির পাপ যত অধিক হউক এবং যে জাতির যত ভয়ঙ্কর ক্ষতি হউক মূলত ইহা কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যে সংঘটন হইতেছে। য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সকলই যে একটা পার্থিব ব্যাপার, ইহাতে এই সংসারের সুখসম্পদ মান ঐশ্বর্য্য আরাম সম্ভোগ ভিন্ন কোন উচ্চ আদর্শ নাই—ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। যদি সভ্যতার আদর্শকেই মান্যের স্থান দেওয়া হয় তাহা হইলে যিশু খ্রীষ্ট যে অন্য এক রাজ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার স্থান আর পৃথিবীতে হয় না। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর, ভাইকে ক্ষমা কর, এ সকল কথা আজকাল কোথাও স্থান পাইতেছে না। শাক্যসিংহ যে নির্ব্বাণের পর শান্তির সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাও সংসার গ্রহণ করে নাই। এখন যে সুনীতি বা সরল সত্যপরায়ণতার কথা বলা হয় তাহাও কেবল আপনার দেশ ও প্রিয়জনে আবদ্ধ—সকল নরনারীর সহিত সপ্রেম সরল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—একথা কেহ বলিতে পারিতেছে না। সুনীতি যে সকল নরনারীজীবনের নিত্য নিয়ম একথা গ্রহণ করিতে জগৎ প্রস্তুত নহে।

কার্য্যত মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিগণ যেন পরস্পরের সম্মতি লইয়া স্থির করিয়া

রাখিয়াছিল যে তাহারা পৃথিবীকে পৃথিবীই রাখিবে, ইহাকে উন্নত হইয়া স্বর্গ হইতে দিবে না—এখানে সুনীতি, নিঃস্বার্থ প্রেম, উদার সহানুভূতি, স্বর্গের উচ্চ উচ্চ বিধিসকল আসিতে দিবে না। জড়বস্তু সকলের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা আপনাদিগের স্বার্থ অহঙ্কার হিংসা বিদ্বেষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিধাতা যে এই পৃথিবীকে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি যে মানুষকে শুধু জড়রাজ্যের উপর অধিকার লাভ করিতে দিয়াই আপনার কার্য্য সমাধা করিবেন না তাহা এত দিন কেহ বুঝিতে পারে নাই। প্রাচীন ইহুদিজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন আছে যে, মনুষ্যজাতি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পরমেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া এক মহা বন্যা উপস্থিত করিলেন, তাহাতে সকল মনুষ্য পশু জীব জন্তু মরিয়া গেল, কেবল নোয়ার নৌকাতে আশ্রয় পাইয়া জীবপ্রবাহ রক্ষা পাইল। পরে বিশ্বাসী বংশ জন্মগ্রহণ করিল। মনে হয় এবার বিধাতা সেইরূপ এক মহা সমর উপস্থিত করিয়া সকল নরনারীকে বিনাশ করিবেন এবং অল্প কয়েকজনকে রক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা নূতন উন্নততর নরবংশ আনয়ন করিবেন যে, তাঁহারা তাঁহার শান্তির ও প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিবেন।

যুরোপ যে স্বাধীনতা ও জ্ঞানের উচ্চ অবস্থা দেখাইয়াছে, তাহা যে যথেষ্ট নয় তাহা সকল নরনারীই অনুভব করিতেছিল। ধনিগণ অলস ও অপবিত্র হইতেছিল, দরিদ্রগণ নিরাশ ও নাস্তিক হইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট ও বিকৃত হইতেছিল। সর্ব্বত্র অসমতা ও স্বার্থপরতা বিরাজ করিতেছিল। ধর্ম্মসকল প্রাণহীন, অর্থহীন হইয়া পড়িতেছিল, অহঙ্কারী মানুষ পৃথিবীতে আপনার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ঈশ্বরকে এখান হইতে দুর করিয়া দিতেছিল। এখন যে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে এ সমস্তই দগ্ধ হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ভগবান আপনার মনোমত নরনারীকে আনিয়া তাঁহার গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যাঁহারা নিত্য সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইতেছে বলিয়া নিরাশ হইবেন না—কেবল বিশ্বাসচক্ষে দেখিবেন যে মহা শাসনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন প্রত্যেকের অবিশ্বাস অহঙ্কার পাপের প্রতি স্বর্গের রাজার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তিনি সকল অপরাধীকে আপনার শাসনে শুদ্ধ করিবেন এবং শুদ্ধ নরনারীকে সংসারে শান্তি দান করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ের মহা যুদ্ধ ভবিষ্যতের ইতিহাসের চিত্রবিচিত্র আবরণ, এই দৃশ্যপট দেখিতে ভয়ানক বটে, কিন্তু ইহার পর অতি সুন্দর জয়গীতিকাব্য ও আনন্দসঙ্গীত চক্ষু ও শ্রোত্রকে পরিতৃপ্ত করিবে। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানি না—যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিতেছি না, ইহার নিকট আমাদিগের আশা করিবারও কিছু নাই। আমরা যুদ্ধের সংবাদও পাই-

তেছি না—কিন্তু আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি, পুরাতন হিংসা দ্বেষ পরস্পরে কাটা-কাটি করিয়া মরিতেছে ও তাহাদিগের স্থানে পৃথিবীতে শুদ্ধ ও সুখী করিতে ভগবানের বাধ্য ও প্রিয় দেবনন্দন সকল আসিতেছেন।

শিকার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মানুষের আর্জ্জি, ভগবানের মর্জ্জি। ঠিক ডাক্তর সাহেব যেটা আশা করিতে-ছিলেন তাহার উল্টা হইল। বারোদিনের দিন উমার অসুখ আবার বাড়িল, সাহেব এই বালিকা রোগীর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। নূতন উপসর্গ জুটিল—বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। সাহেব সুবিধা বিবেচনা করিলেন না—কলিকাতা হইতে আরও দুইজন সাহেব ডাক্তরকে আনিলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

পনের দিন হইল উমা শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আজ তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—সন্ধ্যা হইতেই ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রি ১০টার পর সে একবার বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। রমাসুন্দরী ভীতস্বরে কহিলেন—"কি হয়েছে, মা ?" উমা কিছু উত্তর দিল না, সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মাতার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আবার তাহার বকুনি বাড়িল। বিকারের ঝোঁকে সে বলিতে লাগিল—"বারণ কর মা, বারণ কর, বাবাকে মানা কর। বাবা ত আমার কথা শুনলেন না। বাবা তুমি ত আমাকে ভালবাস, খোকাকে ভালবাস, মাকে ভালবাস। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন, বাবা ? ওই দেখ, মা, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ছিল, বাবার বন্দুকের গুলিতে ঝুপ্ ঝাপ করে কত গুল পড়ে গেল। ওই দেখ ওরা কি রকম ছট্‌ফট্ কর্‌ছে—শিগ্‌গির জল নিয়ে এস মা। ওইযা আর ত নড়ছে না, মা, বাবার গুলিতে সব গুল মরে গেছে। উঃ, কি ভয়ানক।" এই সব বলিয়া উমা চুপ করিল, খানিক পরে আবার বকিতে সুরু করিল "মা, মা, বড় ভয় করছে, মা, চারিদিকে রক্ত—রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, মা। এত রক্ত !—এই দেখ, মা, আমার গায়ে রক্তের দাগ।" এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া দেখাইল। তার পরে আবার বলিতে লাগিল—"মুছিয়ে দাও, মা, মুছিয়ে দাও ; রক্ত না, আগুন, এত জ্বল্‌ছে কেন ? পাখীর গায়ে এত রক্ত ছিল। শিয়রে বসিয়া নরেশচন্দ্র সব শুনিলেন। একি প্রলাপবচন !—না করুণাময়ী কন্যার আহত হৃদয়ের তীব্র তিরস্কার। আজ যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন, সেদিন যদি তাহা এমনি বুঝিতে পারিতেন ! নরেশচন্দ্র, এখন বুঝিলেত তোমার হৃদয়-হীন নির্ম্মম খেলা, তোমার নিষ্ঠুর আমোদের ক্ষণিক চরিতার্থতার জন্য তোমার একান্ত

স্নেহের একমাত্র কন্যাকে তুমিই মৃত্যুর দ্বারদেশে অগ্রসর করিয়া দিয়াছ! মনে পড়ে উন্মত্ত আনন্দে তুমি যে তখন এই আজন্ম স্নেহপালিতা কন্যার মর্ম্মবেদনা বুঝিবার কোনও চেষ্টা কর নাই। সেদিনও তাহার ম্লান সুন্দর মুখখানি শুভ্র বালিকাহৃদয়ের মনোবেদনাকে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিল—তখন সেটা বুঝিবার অবসর ঘটে নাই। কিন্তু আজ যখন সে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছ, তখন নীরবে রুগ্ন কন্যার শিয়রে বসিয়া নিরুপায় হইয়া দেবতার নিকট তাহার জীবন ভিক্ষা চাহিতেছ! দেবতার দয়া কি এতই সুলভ!

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে রমাসুন্দরী কন্যার সেবা করিতেছেন। এ যাত্রা উমা কি তবে রক্ষা পাইবে না? হে ঠাকুর, উমাকে রক্ষা কর—উমা বাঁচিবে না, না, না, তা হবে না। মার কোল শূন্য করে উমা চলে যাবে? শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের বেদনাপূর্ণ নীরব প্রার্থনা এইরূপে উত্থিত হইত।

পাঁচ ছয় দিন উমার অবস্থা নিতান্ত খারাপ যাইতেছে। নরেশচন্দ্রের সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দময় ভবনের উপর কে যেন নিবিড় নিরাশার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। একুশ দিনের দিন সাহেব ডাক্তর একরকম হাল ছাড়িয়া দিলেন। সকালে রোগীর অবস্থা দেখিয়া তিনি আর সেদিন কলিকাতায় ফিরিলেন না। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল ততই উমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে বেলা পড়িল, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পাটে গেলেন। দিবসের শেষ আলোক রশ্মিরেখা দিগন্তের গায়ে মিলাইয়া গেল। প্রকৃতি নিজের মুখে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। দিবসের কর্ম্ম কোলাহল,জীবন সংগ্রামের কঠোরতা রজনীর সুপ্তির মধ্যে বিশ্রামলাভ করিতে লাগিল। শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্বচরাচর আরাম লাভ করিতেছে, শুধু নরেশ চন্দ্রের গৃহে সকলে আজ নিদ্রাহীন চোখে জাগিয়া আছেন। নরেশচন্দ্র ও রমাসুন্দরীর মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। বিছানার সঙ্গে উমা মিশিয়া গিয়াছে। এই রোগকাতরা বালিকার শীর্ণা শ্রীর মধ্যে আজ ঔজ্জ্বল্য নাই সত্য বটে, কিন্তু তবুও তাহার ম্লান রূপরাশি একটা মোহময় কোমলতার বেষ্টনে নিজেকে স্নিগ্ধ রাখিয়াছে—ম্লান মল্লিকার রূপরাশি বুঝি এমনি স্নিগ্ধ, বুঝি এমনি মধুর!

গভীর রাত্রে উমার অবস্থা এত খারাপ হইল যে, নরেশচন্দ্রকে সাহেব ডাক্তর আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন—"মিষ্টার রায়, আমি কিছুতেই আপনার কন্যাকে বাঁচাইতে পারিলাম না; এখন ঈশ্বরের হাত, তবুও আমি আমার এই শেষ ঔষধটা দিচ্ছি, এটার যদি ফল হ'লত হ'ল।" মানবীয় ক্ষমতা জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আপন অক্ষমতা স্বীকার করিল। জীবন ও মৃত্যুর কি ভীষণ সংগ্রাম! কিন্তু ডাক্তর যখন হাল ছাড়িলেন, ভগবান্ তখন মুখ চাহিলেন। ডাক্তরের ঔষধে ফল হইল, ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পরে উমা ঘুমাইল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, ঊষার নবীন

আলোক স্পর্শে পৃথিবী জাগ্রত হইল। ধীরে ধীরে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল। উমা এখনও ঘুমাইতেছে। ডাক্তর বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল। রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল এবং এইরূপ যদি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে এখনও তাহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে। সাহেব ডাক্তরের আশা ফলবতী হইল। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে অবশেষে মৃত্যুরই হার হইল।

উমা ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। নরেশচন্দ্রের নিরানন্দ পরিবারে যে জমাট মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে কাটিয়া গেল। উমা রোগমুক্ত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার সম্বন্ধে সকলেই খুব সাবধান, কেন না সে এখনও এত দুর্ব্বল যে ইহার উপর যদি সামান্য একটা কিছু হয়, তাহা হইলে আর কিছুতেই যে তাহাকে বাঁচান যাইবে না।

ডাক্তরের ব্যবস্থানুসারে নরেশচন্দ্র উমাকে লইয়া গিয়া গঙ্গাবক্ষে বোটে বাস করিতেছেন। উমার শারীরিক দুর্ব্বলতা এখনও ঘুচে নাই। তাহার পীড়াকাতর পাণ্ডু মুখে ম্লানিমার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। দুই মাস হইল সে রোগমুক্ত হইয়াছে—অতীতের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আসিতে আরও কিছুদিন লাগিবে। যে ধাক্কা তাহার উপর দিয়া গিয়াছে, সে অতি কষ্টে এ যাত্রা বড় রক্ষা পাইয়াছে।

বোটখানি বৃহদায়তনের—ভিতরের কক্ষগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত। গঙ্গাবক্ষে বোট ভাসিয়া বেড়ায়, উপযুক্ত স্থান দেখিয়া রাত্রে নোঙ্গর করা হয়।

বালক পরেশচন্দ্রের ভারি আনন্দ। বায়ু ভরে তরঙ্গ বিক্ষোভিত গঙ্গাবক্ষে নৌকা যখন আন্দোলিত হইতে থাকে, অধীর আনন্দে নৌকার মধ্যে তখন সে নাচিতে থাকে। বহুদিন পরে দিদিকে সে যে আবার নিজস্বরূপে পাইয়াছে, সেটাও তাহার আনন্দের মাত্রা বাড়াইয়াছে। দিদির সঙ্গে সে এখন কত গল্প করে, সমস্ত দিন গল্প করিয়াও তাহার গল্পের আর শেষ হয় না। অবুঝ ছোট ভাইটির অফুরন্ত অর্থহীন গল্প দিদিকেও বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয়, কেন না দিদি ভাল করিয়া গল্প শুনিতেছে না অথবা অন্যমনস্ক হইয়াছে যদি সে কোনরূপে বুঝিতে পারিত, অভিমানী বালক তৎক্ষণাৎ গল্প বলা বন্ধ করিত, এবং এমনভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইত যাহার অর্থ তাহার দিদি সম্যকরূপে জানিত। ইহার পরে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে উমার যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

পরেশচন্দ্রও শুনিয়াছিল যে পিতার পাখী মারার ফলেই দিদির অসুখ করিয়াছিল। কথায় কথায় দিদিকে সে একদিন বলিল—"দিদি, পাখী মার্‌লে তোমার মনে কষ্ট হয়, আমি বড় হ'লে বাবার মতন কখনও পাখী মারব না। এই দেখনা দিদি, নদীর ধারে কত রকমের পাখী উড়ে বেড়ায়। আমি পাখী ধরে আন্‌ব, আর পুষব, আর

তুমি তাদের খাওয়াবার ভার নেবে। বাবাকে দিয়ে ভাল ভাল খাঁচা কেনাব। কেমন দিদি বেশ মজা হবে—না ?" ছোট ভাইয়ের কথায় উমা সায় দিত।

সূর্য্যদেব তখনও পাটে নামেন নাই। বজরার মুক্ত ছাদের উপর বহুমূল্য গালিচায় নরেশচন্দ্র বসিয়া আছেন—পার্শ্বে উমা শুইয়া আছে। গঙ্গার বিচিত্র শোভা উভয়ে মুগ্ধ নেত্রে দেখিতেছিলেন। কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গা সাগর উদ্দেশে ধাবিতা। দূরে—অতি দূরে—ঘন ছায়াময় বিটপিরাজি দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সুদূর প্রসারিত অবারিত মাঠ শ্যামল-শস্য-সম্পদে পূর্ণ হইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মহিমা প্রচার করিতেছে। উর্দ্ধে মুক্ত অনন্ত নীলাকাশে সন্ধ্যার বিবিধ বর্ণময়ী মেঘমালা বিক্ষিপ্ত ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাথার উপর দিয়া বহুবিধ পাখী ডাকিয়া নীড়ের উদ্দেশে ফিরিতেছে। এই জনহীন নীরব নিস্তব্ধ গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যার অমল-শান্তি এমন একটা নিবিড় মহিমাময় সৌন্দর্য্য বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, যাহার শুভ স্পর্শমাত্র সংসার-সংগ্রাম-মত্ত মানবের কঠোর প্রাণ ক্ষণিকের জন্য বিগলিত হয়, শুধু তাহাই নহে সে জিনিষটা এমন একটা অভিনব আনন্দের প্রেরণাকে সহজ, সরল এবং সম্পূর্ণ করিয়া তুলে, যেখানে দুঃখ দারিদ্র শোক বেদনার জ্বালাময় কশাঘাত কোন মতেই স্থান পায় না।

বজরার ছাদের উপর পিতা পুত্রী উভয়েই নীরব—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উমা প্রথমে কথা কহিল। "বাবা, নদীর ধারে কত রকমের পাখী রোজ রোজ দেখ্‌তে পাই। কৈ বাবা, তুমিত আর একদিনও শিকার কর্‌তে যাও না ?" পিতা একটু হাসিলেন, পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। পিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া উমা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কেন বাবা ?" উত্তরে নরেশচন্দ্র কহিলেন—"না মা, আমিত আর শিকার করি না।" কৌতূহলী বালিকা বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"শিকার কর না কেন বাবা ?" নরেশচন্দ্র কহিলেন—"না মা, বন্দুক ধরবার যে শক্তি চাই সে শক্তি আর আমার নেই। বন্দুক ধর্‌লে হাত কেঁপে আমার হাত থেকে বন্দুক পড়ে যাবে। চিরদিন কি এক খেলা সবায়ের ভাল লাগে ?" পিতার কথা শুনিয়া উমা একটু হতবুদ্ধি হইল, তাই সে আবার বলিল—"বাবা, যে খেলায় তোমার এত আমোদ হ'ত, যে খেলা তোমার আর ভাল লাগে না ?" পিতা কহিলেন—"শোন, তবে বলি। তোমার অসুখের সময়ে বিকারের ঝোঁকে সেই কথাটাই তুমি আমাকে বড় স্পষ্ট বুঝিয়েছ, যে কথাটা জীবনে আমি কোন দিনই বোঝবার চেষ্টা করিনি। অনেক কষ্টে এ যাত্রায় তোমাকে রক্ষা করেছি। সে দিন যদি বুঝ্‌তে পার্‌তাম যে তোমার বুকে এত ব্যথা লাগ্‌বে, তা হ'লে"—উমা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"কি সব বল্‌ছ বাবা ?" পিতা উত্তর দিলেন—"মা আমার, এই বল্‌ছি যে আমোদের চেয়ে আমার মেয়ের জীবনের মূল্য অনেক বেশী ; তুমি আমার

এবারে যে ভয় দেখিয়েছ তাতে হাড়ে হাড়ে এ কথাটা আমি বুঝেছি। আবার বন্দুক ধ'রে তোমার মনে কষ্ট দেব? না, আমিত নিষ্ঠুর নই, তবে আমোদের ভুলে, অনেক ভুল করেছি। ইহজন্মের মতন বন্দুক ধরা আমার শেষ হয়ে গেছে—এ হাতে আর বন্দুক কখনও উঠ্‌বে না।"

উমার ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। দিবসের ক্ষীণ আলোক রেখা টুকু ক্রমে নিভিয়া গেল। নীরবে স্বচ্ছ নীলাকাশে একে একে তারকা ফুটিয়া উঠিল। প্রশান্ত শান্তি নদীবক্ষে বিরাজমানা। উমা পুলকাকুল কণ্ঠে কহিল—"অন্ধকার হয়ে এল, চল বাবা, আমরা নীচে নেমে যাই, মা আর খোকা কি কর্‌ছেন দেখিগে।"

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মিসেস জেসপের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম কয়েকজন খুব ধনী পুরুষ ও মহিলা একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাপড় চোপড়ের চাকচিক্যে ঘর ঝলমল করিতেছিল। আমার পক্ষে এ দৃশ্য নূতনই লাগিতেছিল, কারণ আমি কখনও এরকম সভার ভিতর যাই নাই।

মিসেস জেসপ সকল অভ্যাগতের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা কি বলিয়া আমাদের অভিবাদন করিলেন তাহা আমার মনে নাই। কিন্তু "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি যে আসিয়াছেন ইহা আমাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয়; লেডি কেরোলাইন আপনার সহিত আলাপ করিয়া আশা করি খুব সুখী হইবেন," বলিবার পরই সকলেই খুব আগ্রহান্বিত হইয়া হ্যালিফ্যাক্সের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে আরম্ভ করিলেন।

জন শীঘ্রই তাঁহাদের সঙ্গে লজ্জা অথচ সপ্রতিভতার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "আমি বোধ হয় বলিয়াছি যে, মিষ্টার বার্থউডের ও লেডি কেরোলাইনের আসিতে একটু বিলম্ব হইবে, এবং আশা করি আপনি জানেন যে মিস্ মার্চ্চ—"

কথা শেষ হইতে না হইতে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং কথিত ব্যক্তিরা ভিতরে ঢুকিলেন। আমি এবং জন জানালার কাছে আড়ালে ছিলাম, জনের নিঃশ্বাস পিছন হইতে আমি শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার পানে তাকাইয়া দেখিবার শক্তি

আমার ছিল না। আমিও যেন তাহারই মত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। যদিও আমি কখনও জীবনে কোন রমণীর ভালবাসায় পড়ি নাই, তবুও এনডারলীর অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হইত যেন আমিও ঐ স্বর্ণ দুয়ারের ভিতর দিয়া গিয়াছি, যৌবনকালের নব আশাপূর্ণ জীবনের এমন অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে আমি সেই পথের ব্যথিত যাত্রীদের সহিত 'দিলদরদী' হইতে পারিব।

কিন্তু কই তিনি তো আসেন নাই।

আমরা উভয়েই বসিলাম। আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে সুখী হইলাম কি অসুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। লেডি কেরোলাইনকে সকলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি সকলের সহিত হাসিয়া হাসিয়া খুব বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। জানি না জন তাঁহার বিষয় কি ভাবিতেছিল। লেডি কেরোলাইন ঢুকিতেই জন একটু পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছিল, এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকলেই একটু একটু করিয়া বার্থউডের ধারে অগ্রসর হইলেন, কেবল আমি ও জন জানালার নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই লেডি কেরোলাইন বলিয়া উঠিলেন, "কই মিসেস জেসপ, আপনার সেই বিখ্যাত অতিথি কোথায়? এই ভিড়ের ভিতর তাঁকে কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব, তাঁহার কি বিশেষত্ব আছে বলুনতো? আমিতো চর্ম্মচক্ষে এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

"তিনি আপনার হাতের কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন। মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আসুন আপনার সহিত লেডি কেরোলাইন দেখা করিতে চাহেন।"

জন গম্ভীর ভাবে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিল, লেডি কেরোলাইনও সম্মানের সহিত নমস্কার করিলেন। তাহার পর ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। প্রথম দর্শনেই যেন জনকে তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। জন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিল। সে কি ভুলিয়া গিয়াছিল? না, তাহার চঞ্চল আঁখি বুঝাইয়া দিতেছিল ভোলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

"লেডি কেরোলাইন, আমার মনে হয় আপনার ছোট বন্ধুটী আজ আসিতে পারিবেন না।"

"বাথের রাস্তা একটুও ভাল নয়, আমি তো আগেই বলিয়াছিলাম। মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি কি কখন বাথে গিয়াছেন?" মিসেস জেসপ যেন মেয়েটীর জন্য একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

খাবার সময় হইয়া আসিল। লেডি কেরোলাইন জনের সহিত নিজের স্বামীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, ইনি আপনার দেশেরই লোক; বোধ হয় আপনি ইহাঁর নাম শুনিয়াছেন, হয়তো আপনার সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হইয়াও থাকিতে পারে।"

"সৌভাগ্যক্রমে ইহাঁকে আমি একাধিক বার দেখিয়াছি। আপনার নাম কি বলুনতো ?"

"জন হ্যালিফ্যাক্স।"

"কি মুচি জন হ্যালিফ্যাক্স ?"

"হাঁ সেই।"

মিষ্টার বার্থউড বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া শিস দিতে আরম্ভ করিলেন।

জন তাহার ব্যবহারে একটু অপ্রতিভ হইল।

লেডি কেরোলাইন স্বামীকে বলিলেন, "আমি যে এই ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আসচে রবিবারে আপনি আমাদিগের সহিত আহার করিবেন।"

"কেরোলাইন, তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, ও আমাদের সঙ্গে মিশিবার উপযুক্ত নয়।"

"তোমার সঙ্গে না হয় আমার সঙ্গে মিশিবার উপযুক্ত তো ?" এইরূপ কথা কাটাকাটী হইতেছে, এমন সময় একটী মেয়ে শোক বস্ত্র ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। আমরা উভয়েই দেখিবামাত্র চিনিলাম মিস্ মার্চ্চ।

"জন দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। উভয়ের চারি চকের মিলন হইল।" মিস্ মার্চ্চ নমস্কার করিলেন, জনও করিলেন। তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে কেহই কথা বলিলেন না। মিস্ মার্চ্চ অগ্রসর হইলেন।

তিনি অজানিত ভাবে বোধ হয় আমার পাশের খালি জায়গায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এস্থলে দেখিতে পাইয়া যে খুব সুখী হইয়াছেন, তাহা জানাইলেন।

জন একবারও আমাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিল না, কিন্তু সে যে প্রত্যেক কথা শুনিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই সময় মিষ্টার বার্থউড উঠিয়া আসিয়া মুরুব্বিয়ানা ভাষায় ডাকিলেন, "ওহে হ্যালিফ্যাক্স, শোন শোন।"

"মহাশয় কি আমায় ডাকিতেছেন ?"

"হাঁ তোমাকে আমি গোপনে কিছু বলিতে চাই।"

"তা নিশ্চয়ই।"

কথাটী যে কি বলিবেন জন তাহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তবুও অপ্রতিভ ভাবে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

"কথাটী না হয় এখানে বলিব না, তোমার কারখানায় গিয়া বলিব।"

"মহাশয় এখানে যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

"এ সব কথা বলিতেছি বলিয়া ক্রুটী মার্জ্জনা করিবে, কি করিব বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে। আশা করি তুমি আমার স্ত্রীর নিমন্ত্রণ সত্যই গ্রহণ করিবে না।"

"মহাশয়, আমি আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ঢাক গুড় গুড় করিয়া কি লাভ, এস তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলি। আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাহি না। তুমি হয়তো স্বভাবে খুব ভদ্রলোক হইতে পার, কিন্তু এটা বোঝ তো যে পদ বলিয়া একটা জিনিষ আছে। মিষ্টার জেসপ সকলকেই নিজ গৃহ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং আমি নিজেও সকলকে অবিচারে সম্মান করিয়া থাকি, কিন্তু আমার স্ত্রী তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন করিতে আমার বাধা মনে হইতেছে।"

"আমিও এরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিজ আত্মসম্মান হারাইতে চাহি না।"

জন কথাগুলি এত তেজের সহিত বলিয়াছিল যে সমস্ত গৃহের লোক তাহার কথা শুনিতে পাইলেন।

মিষ্টার বার্থউড তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। "তোমাদের আবার আত্মসম্মান, তোমরা যে রকম করে হয় বড় লোকদের গৃহে ঢুকিতে পারিলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে কর, তোমাদের আমি খুব ভাল করে জানি—যত সব হুজুগে, শান্তিভঙ্গকারী রাজদ্রোহীর দল। তোমাদের সব ফাঁসি দিলে ভাল হয়।"

জনের মুখ রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে রাগ সামলাইয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "মহাশয়, আমি শান্তিভঙ্গকারী কিম্বা রাজদ্রোহী নহি।"

"কিন্তু তুমি তো ব্যবসাদার? তুমি তো চামড়ার গাড়ী টানিতে?"

"তা সত্যি।"

"আর তুমিই না একবার আমায় ও মার্চ্চকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলে?"

আমি হঠাৎ আমার পার্শ্বে একটা শব্দ শুনিলাম, উরসুল্লা উৎসুক ভাবে জনের উত্তর শুনিবার জন্য তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

"আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, আমিই সেই।"

"সেজন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ। সে সময় তোমায় পুরস্কার স্বরূপ একটি গিনি দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা ফেলিয়া দিয়াছিলে, কাল এস, আমি তোমায় কুড়িটী গিনি দিব।"

এ অপমান সহ্য করা জনের পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিল। "মহাশয়, সে সময় আমি কি ছিলাম সে কথা লইয়া কি হইবে, মনে রাখিবেন আজ রাত্রে এখানে আমরা সমান ভাবেই মিলিত হইয়াছি।"

"সমান!"

"যখন আমরা এক গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, তখন অন্ততঃ যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ সকলেই সমান বলিতে হইবে।" গৃহের সমস্ত অভ্যাগত থ হইয়া বসিয়াছিলেন। যদিও এ দৃশ্য এখানে খুব নূতন ছিল না, তথাপি মিসেস বার্থউড স্বামীর ব্যবহারে

অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছেন, অমনি বার্থউড চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বল! ও ছেলেটী একবার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে বলিয়া এবং তোমার তাহাকে ভাল লাগে বলিয়া কি আমাকে তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে হইবে? কখনই না! তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কি তোমার সব কথাই শুনিতে হইবে?"

জন নিজেকে অতি কষ্টে সামলাইতেছে বেশ বুঝা গেল, সে একবার অসামাল হইলে যে বার্থউডের পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিবে। বার্থউড ঘুসি ঘুরাইয়া জনের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, "এস, ভবঘুরে ছোঁড়া এস!"

উরসুল্লা তেজের সহিত উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"আপনি আমার সামনে এই ভদ্রলোককে অপমান করিতে পারিবেন না। ইনি আমার বাবার অনেক সেবা করিয়াছেন।"

"তোমার বাবার পোড়াকপাল।"

জন আর সামলাইতে না পারিয়া হাত দিয়া বার্থউডের কাঁধ ধরিল।

"মহাশয়, ভাল চান তো চুপ করুন।"

বার্থউড হাত ছাড়াইয়া লইয়া জনকে চপেটাঘাত করিল।

জন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সকলে ভাবিতেছিল যে সে এইবার বার্থউডকে মাটীতে ফেলিয়া মারিবে, কিন্তু জন আঘাতের বদলে আঘাত করিল না।

কেহ কেহ বলিলেন, "ও ঝগড়া করিবে না।"

"না! আমি মারিব না।" যদিও জন রাগে কাঁপিতেছিল এবং তাহার গলার স্বর পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, তবুও শান্ত হইয়া বলিল, "আমি যে খ্রীষ্টান"।

কেহ কেহ একটু মুচকাইয়া হাসিলেন। উরসুল্লা "হেণ্ডসেক" করিবার জন্য নিজের হাত বাড়াইয়া দিল, জনও গ্রহণ করিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হইয়া গেল।

সেই সময় কেহ বলিলেন, "মিষ্টার বার্থউড চলিয়া যাইতেছেন।"

মিস মার্চ্চ বলিলেন, "চলিয়া যাইতে দেও।" তিনি যে রাগ সামলাইতে পারেন নাই, তাঁহার চোখ দেখিয়াই বেশ বোঝা যাইতেছিল।

"না তাহা হইবে না, আমি তাঁহাকে গিয়া বলিব।" এই বলিয়া হাত ছাড়াইয়া জন বার্থউডের নিকট উপস্থিত হইল। "মহাশয় আপনি যাইবেন না, আমিই যাইতেছি; আশা করি ভবিষ্যতে আপনার পথে কখনও আসিব না।"

অভ্যাগতেরা বিশেষতঃ মহিলারা জনের ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; এমন কি লেডি কেরোলাইন পর্য্যন্ত বলিলেন যে, তিনি কখন কাহাকেও এমন বীরত্বের সহিত অপমান সহ্য করিতে দেখেন নাই।

উরসুল্লা তেজের সহিত বলিল, "কোন অপমান কাহাকেও অপমানিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না লোকে নিজেকেই নিজে অপমানিত করে।"

জনের কানে উরসুল্লার কথা পৌঁছিল, আহ্লাদে তার মুখ হাসিয়া উঠিল।

এক মিনিট পরই আমি ও মিসেস জেসপ উভয়েই উঠিয়া তাহার অনুগমন করিলাম। কিন্তু জনের আনন্দ ও বীরত্ব যেন ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। "এই পৃথিবী আমাদের মত লোকদের পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর। আমি কখনও ভাল ভাবে এখানে চলিতে পারিব না।"

"নিশ্চয় পারিবেন।"

মিসেস জেসপ সেই বালিকার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "আমারও মনে হয়, মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি যে ভাবে আজ নিজেকে চালিত করিলেন, এই ভাবে যদি চলেন, তাহালে এই পৃথিবীতে আপনার কোন ভয় নাই; কেবল আমার মনে হচ্চে, আজকার এই ঘটনা না হইলে আমার বাছার মঙ্গল হইত।"

"কেন, আমি কি তাঁহার কোন ক্ষতি করিয়াছি? আমাকে দয়া করিয়া বলুন, আমি কি ক্ষতি করিলাম।"

"না, আপনি আমার কোন ক্ষতি করেন নাই, কিন্তু দেখাইয়াছেন যে, এক জন বাস্তব খ্রীষ্টানই কেবল ভদ্রলোক হইতে জানেন, আমি এ শিক্ষা কখনও ভুলিব না।"

জন বুঝিতে পারিল উরসুল্লা তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে। যে রকম ভাবে একজন পুরুষ একমাত্র নারীর দ্বারা সম্মানিত হইলে উভয়েই দৃঢ়, নিরাপদ ও সুখী হয়, সেই ভাবে উরসুল্লা তাহাকে বুঝিয়াছে। তাঁহারা আবার হাত মিলাইলেন এবং নিঃসঙ্কোচ ভাবে পরস্পরের প্রতি তাকাইলেন। ঐহিক কোন প্রকার বাসনা কাহারও মনে উদয় হয় নাই; দুজনের এক লক্ষ্য, এক বাসনা, এক বিশ্বাস দুজনকে মিলাইল, ইহা যেন ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চ, সুখ অপেক্ষা মিষ্টতর। সেই সময়টা উভয়ের পক্ষে যেন এক মহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইয়াছিল।

মিসেস জেসপ কোন বাধা দিলেন না। তিনি প্রকৃত ভালবাসা যে কি তাহা জানিতেন, গুজব যে তিনি মিষ্টার জেসপের জন্য ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার পৃথিবীর বিষয় অনেক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, সেজন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন।

আস্তে আস্তে জনের কাঁধে হস্ত দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার যাবার সময় হয়েছে।"

"আমি যাইতেছি, কিন্তু ইঁহার কি হইবে।"

"আমার বিষয় ভাবিবেন না, জেন আমার রক্ষণাবেক্ষন করিবে, সে আমায় এতদিন

পালন করিয়াছে—"বলিতে বলিতে তিনি জেনকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিলেন।

ইহার আগে আমরা মিস্ মার্চ্চকে কাহাকেও এ ভাবে আদর করিতে দেখি নাই। তাঁহার হৃদয় যে কত কোমলতা ও প্রেমপরিপূর্ণ তাহা এ দৃশ্য দেখিয়াই কিছু অনুভব হইল। জন একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমাকে এবার যাইতে হইবে!"

তাড়াতাড়ী নমস্কার করিয়া আমরা কনকনে রাতে অন্ধকার ও ঝড়ের মাঝখানে বাহির হইয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ।

আত্মনিবেদনের পরীক্ষা।

আমাদের আত্মনিবেদন সত্য কি না পরীক্ষা করিবার সুযোগ ভগবান প্রেরণ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ না করিলে সম্পূর্ণ তাঁহার হওয়া যায় না এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হইয়াছে কি না তাহা দুঃখ না আসিলে বোঝা যায় না।—ইহাই পরীক্ষা। ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন সুখ ব্যতীত আর কিছুই প্রদান করে না তখন সে ইচ্ছাকে ভালবাসা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও সহজ, কিন্তু সে ইচ্ছা যখন আশাকে পরাহত করে, পথে দুঃখের কণ্টক রোপণ করিয়া দেয় তখনও তাহাতে আনন্দ করা—ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যতীত কেহই তাহা পারে না। সুতরাং দুঃখ পরিহার্য্য নহে, তাহা বরণ করিয়া লইবার সামগ্রী।

হে প্রিয় আত্মা, পৃথিবীর সান্ত্বনা দুদিনের, তাহা চলিয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর সমীপে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের যে সান্ত্বনা, যে ভালবাসা দুঃখকে ভালবাসে তাহার যে সান্ত্বনা তাহা চিরদিনের। যে দুঃখকে বরণ করিয়া লইল না সে ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারে না।

ভিতরে যখন আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি তখন বাহিরের জীবনও ধর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হইয়া উঠে। সেণ্ট্ অগষ্টিন্ বলিয়াছেন—"ভালবাস—তাহারপর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" যদি আমাদের ভালবাসা থাকে—স্বার্থলেশহীন ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে সেই ভালবাসাই আমাদিগকে ঠিক কাজটি করাইবে। ইন্দ্রিয়সমূহের অসঙ্গত কার্য্য মনের ভ্রান্তি ও বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ভিতরের মানুষটিকে শাসন কর—বাহিরের মানুষটি আপনিই শাসিত ও সংযত হইয়া উঠিবে।

বিস্মিত হইয়া বিশ্বাসী প্রেমিক আত্মা দেখেন যে ঈশ্বর ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্তই অধিকার করিয়া বসিতেছেন। আপনার কাজ হইতে আপনাকে দূরে রাখ—তাহা হইলে ঈশ্বর নিজে আসিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতে ও কাজ করিতে পারিবেন।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে মানুষ সকল কাল সকল স্থান সকল ঘটনার জন্যই প্রস্তুত থাকে—জনসমাজে, পূজার আসন, কার্য্যক্ষেত্র সকলের জন্যই সে প্রস্তুত। উদ্দেশ্যের দুর্ব্বলতাহেতু অথবা বিশ্বাসের অভাববশতঃ যদি কখনও আমরা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ি তবে তৎক্ষণাৎ যেন একবার অন্তরের নিভৃত নিলয়ে ফিরিয়া আসি—আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া লই। আত্মা যতই ঈশ্বরের সাদৃশ্যলাভ করে ততই স্পষ্টরূপে সে তাঁহার গুণরাজি বুঝিতে সমর্থ হয় এবং ততই তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করে।

এইরূপ অবস্থায় মানুষ যদি কোন ত্রুটী কোন পাপ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তরের মধ্য হইতে ধিক্কারবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে, সে মহা অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ঈশ্বরই নিয়ত আত্মাকে পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার আলোকে আত্মা নিজেও নিজেকে দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারে।

যদি ভ্রান্তিবশতঃ বিষম পাপেও পতিত হও তাহা হইলেও আপনাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিও না, শুধু শান্ত ও বিশ্বস্তভাবে অনুতাপে নত হইয়া তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাও, তিনি ক্ষমা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ভয় পাইও না, উত্তেজনা-চঞ্চল হইও না ;—মনের অত্যন্ত উত্তেজনা, বিরক্তিই যে অনুতাপ তাহা নহে—তাহা অনুতাপের ফলও নহে, বরং তাহা অবিশ্বাসের ফল।

প্রলোভনকে দুই উপায়ে প্রতিহত করা যাইতে পারে। এক উপায়—পাপের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ; অন্য উপায়—অমঙ্গলের দিক হইতে চক্ষুদুটী ফিরাইয়া লইয়া ঈশ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। শিশু যদি ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি দেখে তাহা হইলে সে কি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যায় ? সে সেই দিকে দৃষ্টিও ফিরায় না, পূর্ণবিশ্বাসে মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আত্মাকেও এইরূপে প্রলোভনের বিপদ হইতে ঈশ্বরের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে।

দুর্ব্বল আমরা, যদি আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সম্পূর্ণ পরাজিত যদি না-ও হই, বারংবার পরাহত তো হইবই। কিন্তু আপনাকে শুধু ঈশ্বরের সম্মুখে ধরিয়া দেও—সেই মুহূর্ত্তেই বললাভ হইবে। এই সাহায্যই রাজা ডেভিড্ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বদাই আমার প্রভুকে সম্মুখে রাখিয়াছি। তিনি আমার দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে রহিয়াছেন আমি বিচলিত হইব না।"

ঈশ্বর যখন আত্মার কেন্দ্র হন তখন অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। যে প্রেমে তখন হৃদয় পূর্ণ হয় তাহা নির্ম্মল। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। তাঁহাকে জীবনে পাওয়া হয় না। আমিত্বকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারিলে, আপনার দিক হইতে একেবারে কিছুই না, হইয়া যাইতে পারিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এই অবস্থায় পৌঁছিলে আত্মা নীরব প্রার্থনায় রত হয়। কণ্ঠস্বরবর্জ্জিত বলিয়াই যে ইহা নীরব প্রর্থেনা, তাহা নহে—জীবনে তখন প্রার্থনা এত সহজ হইয়া আসিয়াছে যে বলিবার আর কিছু থাকে না, শুধু বাক্যাতীত একটি বাসনা অন্তর হইতে নিঃশ্বসিত হইতে থাকে—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই সরল অথচ এত ব্যাপক প্রার্থনাটুকুর মধ্যে আত্মার সম্পূর্ণ অবস্থাটি সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই প্রার্থনা নিমিষে নিমিষে পূর্ণ হইতেছে ও হইবে এই বিশ্বাসই আত্মার অবিরাম প্রার্থনাকে নিয়ত সফলতা দান করিতেছে। তখন সকল বিষয়েই আনন্দ, যাহা আছে তাহাতেও আনন্দ, যাহা নাই—খুঁজিতেছি—তাহাতেও আনন্দ।

এই অবস্থায় আত্মার কার্য্যসমূহ মহত্তর গতি লাভ করে, কার্য্যক্ষেত্র প্রসারপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর আপনি এখন তাহার চালক, তিনি যেমন করান আত্মা সেইরূপই করে। সেন্টপল্ যখন ঈশ্বর দ্বারা চালিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন তখন তিনি ইহা মনে করেন নাই যে আমাদিগকে কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে, তাঁহার বক্তব্য এই :— আমাদের কার্য্যগুলিকে তাঁহার কার্য্যের সহিত মিলাইয়া, তাঁহার কার্য্যের অনুবর্ত্তী করিয়া করিতে হইবে।

ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিলে, তাঁহাকেই চালক বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের কার্য্যাবলী উচ্চতম অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, কারণ আমাদের স্থিতি গতি ও অস্তিত্ব শুধু তাঁহাতেই।

ধর্ম্মজীবনের উষাকালে আপনাকে জয় করিবার জন্য স্বার্থপরতাকে বিনষ্ট করিবার জন্য, নিজের বচ্ছন্দ ও অশোধিত কার্য্যগুলিকে নিয়মিত করিবার জন্য, মানুষকে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে বাধ্য ও শান্ত করিয়া লইতে হয়। পট যখন চঞ্চল তখন চিত্রকর তাহার উপরে চিত্রাঙ্কণ করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সহিত মিলন আনয়নই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। আপনার বুদ্ধি ছাড়িয়া নিয়ত বিশ্বাসের সহিত যখন উর্দ্ধ হইতে জ্ঞান ভিক্ষা করি তখনই আমরা বুদ্ধিতে তাঁহার সহিত এক হই ; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন ও ভালবাসেন আমরা যখন তাহাই ইচ্ছা করি ও ভালবাসি তখন প্রেমে তাঁহার সহিত মিলন হয় ; তাঁহার অভিপ্রায় যখন আমাদের উদ্দেশ্য হয় তখন ইচ্ছায় তাঁহার সহিত মিলিত হই।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ ন্যায়ের; পূর্ণ প্রেমের পথ হইতে কখন বিচ্যুত হইতে পারে না—এই নিয়ম স্বয়ং ঈশ্বরেরই মত অপরিবর্ত্তনীয়। ইচ্ছার মিলন না হইলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের মিলন হইতে পারে না।

এই মিলনের জীবন ঈশ্বরের দান। আপনাকে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিলে, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার হইলে, তাঁহার হস্ত হইতে সুখ দুঃখ উভয়কেই আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিলে সে দান লাভ করা যায়, তাঁহার সহিত মিলন হয়। শুধু ঈশ্বরই ইহা

সম্ভব করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে মানবের সম্মতির অপেক্ষা আছে। ঈশ্বর মানবকে ভালবাসেন, তিনি জীবনের আলোকের উৎস। ঈশ্বরই প্রকৃত মুক্তিদাতা, কিন্তু মানবকে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আপন জীবনখানি তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে—আমরা শুধু ইহাই পারি—আলোক দান করিবেন সূর্য্য—সেই চিরসূর্য্য। (ম্যাডাম গেয়োঁ)

পরলোক সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি।

প্রঃ। পরলোকগত ব্যক্তিগণের সহিত ইহলোকেই মিলিত হইতে পারি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব ?

উঃ। ইহলোক ও পরলোক এক ; কেন না আমাদিগের জীবন এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ভ, সেই জীবনই অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে। মৃত্যু কিছুই নহে, কেবল একটা ঘটনা মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত ও জীবিত সকলেই এক হইল ; কারণ যাঁহারা মৃত তাঁহারাতো জীবিত রহিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা মৃত, আর পরশ্ব যাঁহারা মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারা কোথায় আছেন ? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে। তবে উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তাঁহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি ?

প্রঃ। পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত এক পরিবার হওয়া কিরূপ ?

উঃ। এক পরিবার কি ; না এক বাড়ীতে প্রীতিযোগে একত্র বাস করা। নিকটস্থ দূরস্থ ইহলোকের পরলোকের সকল লোকেই ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহা ছাড়া কাহার থাকিবার যো নাই। তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাই। সমুদয় জগৎ ঈশ্বরেতে আছে এই সত্যটী সূক্ষ্মরূপে ভাবিলেই তাঁহাকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। পিতাকে ভাবিলেই ভাই ভগিনী, ভাই ভগ্নীকে ভাবিলেই পিতা আইসেন এবং দুই একত্র ভাবিলেই সমুদয় পরিবার সম্পূর্ণ হয়।

প্রঃ। পরলোকগত সকল ব্যক্তির সহিত কি আমাদিগের যোগ সমান হয় ?

উঃ। ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ধাপ আছে। আমি যদি চারি ধাপ উঠি, পরলোকগত যে ব্যক্তি উন্নতিতে আমার সঙ্গে সমান, তাঁহার সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। যাঁহারা অধিক উন্নতিধাপে, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ করিতে হইলে আত্মাকে অধিক উন্নত করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের শ্রেণীবিভাগও আছে। অধিক বিশ্বাসী, অধিক প্রেমিক, অধিক স্বাধীন; প্রিয় ব্যক্তিরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় আত্মায় গূঢ়

আকর্ষণ আছে ; আপনার ভাবের লোককে টানিয়া লয়। একটা পাত্রে এক সের জল ও আধ সের তেল রাখ, আর একটা পাত্রে অল্প জলে এক ফোঁটা তেল রাখ, দুই পাত্রের জিনিষ একত্র করিলে জলে জল, তেলে তেল মিশিয়া এক হইবে।

প্রঃ। চৈতন্য প্রভৃতি পরলোকস্থ মহাত্মাদের সহিত আমাদিগের কিরূপ যোগ হইতে পারে ?

উঃ। চৈতন্য পরলোকে আমি এখানে। যত তাঁর বই পড়ি, তাঁর জীবন আলোচনা করি ততই তাঁর সঙ্গে মিলে। তিনি হৃদয়ের বন্ধু হইয়া মন কাড়িয়া লইতে থাকেন, আমিও অন্তরের অনুরাগে তাঁহাকে টানিতে থাকি। তিনি টানেন কেন ? মনের ভিতর ধরিবার কিছু পাইয়াছেন, আপনার না হইলে মন কি টানে ? ধর্ম্ম জগতে এই টানাটানির ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে, কেহ দেখে না তাই অনুভব করে না। চৈতন্য যেমন, ক্রাইষ্ট, বুদ্ধ, নানক সকলেই আপনার ভাবের ভাবুককে আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রঃ। কোন প্রকার শরীরগত যোগ না হইলেও কি কাহার সহিত যোগ ঠিক যোগ হয় ?

উঃ। শরীরের যোগ কিছু মাত্র আবশ্যক নয়, আধ্যাত্মিক যোগে স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে। মনে কর আমাদের প্রজাহিতৈষিণী ভিক্টোরিয়াকে আমরা কখন দেখি নাই, তাঁর কিরূপ আকার পরিচ্ছদ কিছুই জানি না। এখন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া তিনি যদি আপনার সেক্রেটারীর প্রতি আদেশ দেন যে "তুমি স্বয়ং দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের বাড়ীতে গিয়া প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া টাকা দিবে।" ইহা শুনিয়া মহারাণীর জয় হউক বলিয়া স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হয়। তিনি কতদূরে কি করিতেছেন জাহাজে করিয়া কৃতজ্ঞতা পাঠাইতে হইবে এ প্রকার ভাবিতে হয় না। মহারাণী অন্তরের নিকট হইলেন। অনুরাগ দূরতাকে—ভূগোল সম্বন্ধে স্থানের ব্যবধানকে বিনাশ করিল। বস্তুতঃ অনুরাগ হইলেই নিকট, এবং রাগ হইলেই দূর। লাপলণ্ডবাসীও নিকটস্থ এবং ঘরের লোকও দূরস্থিত হইয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কেন হইবে না ? ভাবের ভাবুক হওয়াই যথার্থ যোগের লক্ষণ।

প্রঃ। ভাবের ভাবুক হওয়া কি প্রকার ?

উঃ। একজন সাধুর মনে যে ভাব অন্যে ঠিক্ সেই ভাব ধরিতে পারিলে তিনি তাঁর ভাবের ভাবুক হন। এস্থলে কল্পনা, আলোচনা বা অতএব করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করিতে হয় না ; কিন্তু তাহা স্বভাবতঃ হইয়া যায়। একজন খোল বাজালে নাচে দেখিলেই আর একজন ভক্ত বলিলেন, "বুঝেছি একটা ইসারা পাওয়া গেল।" ভক্তির আর একটা চিহ্ন দেখিলে বড় খুসী হন। ইঁহারা পরস্পরের বাহিরের অবস্থা

দেখেন না, কিন্তু আমি যে ভাবের ইনিও সেই ভাবের বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন। মহারাণীর প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া যে রাজভক্তি হইল, তিনি কাঁটা চামচে ধরিয়া আহার করেন ভাবিয়া তাহার অন্যথা হয় না। আত্মায় আত্মায় এক ভাব হইলেই মিলিবে। তেলে তেল জলে জল মিশে, সোনার পাত্রের তেল মাটীর পাত্রের তেলের সহিত একত্র হইতে অস্বীকার করে না। পাঁচ আত্মায় ভক্তি হইলেই মিলিবে, কার সাধ্য পৃথক্ করিয়া রাখে? এই জন্য সমুদায় মনুষ্যাত্মা ভক্তিযোগে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বদ্ধ হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ আশা।

প্রঃ। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত কি আমাদের দেখা হইবে?

উঃ। এ বিষয়ে অধিক অনুমান কিছু নয়, অনেকে ঈশ্বরের সত্তায় যেমন বিশ্বাস করেন, পরলোকের সত্তায় সেরূপ করেন না; এইজন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও পরলোক স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন এবং পরকালের ব্যাপার সকল কল্পনা ও অনুমান দ্বারা চিত্রিত করিতে চান। ঈশ্বর ও পরকাল দুয়েরই বিশ্বাস যাঁহাদিগের উজ্জ্বল, দুইই তাঁহাদিগের নিকট উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করেন তাঁহারা মিথ্যা ও কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পড়েন। অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস সাধন করিয়া তাহারই আলোকে যতদূর দেখা যায় ততদূর সত্য বলিয়া জানা উচিত। আত্মীয়দিগের সহিত দেখা হইবেই, বিশ্বাস এ কথা নিশ্চয় বলে না।

প্রঃ। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য আমাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় তাহা কি সফল হইবে না?

উঃ। ইচ্ছা হইলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে ইহা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, বরং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারি।

প্রথমতঃ যাহা আমাদিগের ইচ্ছা তাহার বিপরীত ঘটনা অনেক সময় আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। কুপ্রবৃত্তি এবং সংসারের নীচ আশা হইতে যে ইচ্ছা হয় ঈশ্বর তো পদে পদে তাহা বিফল করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন। অনেক সময় ধর্ম্ম বিষয় সম্বন্ধেও আমাদিগের যে ইচ্ছা হয় তাহা সম্পন্ন না হইয়া আমাদিগের উন্নতির অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে যাহাকে আত্মীয়তা বন্ধুতা বলি তাহা স্থায়ী নয়। এই পৃথিবীতে দেখা যায় আজি যাহার সঙ্গে মিত্রতা, দুই পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা। যে পরিমাণে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা সেই পরিমাণে শত্রুতার তীব্রতা। দুই পাঁচ বৎসরে যে মিত্রতা থাকে না, দশ বৎসর পরে বা মৃত্যুর পর অনন্তকাল যে তাহা থাকিবে ইহা সংসারের ব্যাপার, অতএব ইচ্ছামূলক পরকাল যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে।

প্রঃ। ব্রাহ্মের পরকালবিশ্বাসের মূল কি?

উঃ। ব্রাহ্মের বিশ্বাস ইচ্ছামূলক নহে। কল্যাণমূলক এবং প্রকৃত কল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা। ব্রাহ্ম জানেন আমি ঈশ্বরে জীবিত আছি, তাঁর সঙ্গে আমার অনন্ত যোগ, অতএব যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন আমি থাকিব। ঈশ্বর প্রাণ এবং আমি প্রাণী। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার প্রাণগত যোগ। যে নাস্তিক পরলোক কামনা করে না, ঈশ্বর তাহারও প্রাণ হইয়া আছেন বলিয়া সে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। পুণ্যবান চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে, পাপীও সেইরূপ, কিন্তু আমি যেমন ঈশ্বরের যোগ স্বীকার করি, অন্যে যদি সেইরূপ করে "এক বস্তুর সহিত অন্য কোনও দুই বস্তুর যোগ থাকিলে তাহাদের পরস্পরের যোগ হয়" এই নিয়মানুসারে অন্যের সহিত আমার যোগ হইতে পারে।

প্রঃ। সে কি প্রকার যোগ?

উঃ। ধর্ম্মরাজ্যের এক স্থানে একজন থাকেন, বিশ্বাসের পথ ধরিয়া যাঁহারা সেইস্থানে থাকেন, তাঁহারা জানুন বা না জানুন, তাঁহাদের পরস্পরের যোগ থাকে। যখন এইটী পরীক্ষা করা যায় তখন তাহা বুঝা যায়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্থান পৃথিবীর ভূমি নয়। ১০০ লোক এক সময়ে ঈশ্বরের চরণে যখন পতিত হই, তখন সকলের প্রেম ভক্তি একত্র হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সকলে একাত্মা হইয়া যাই। এই পরিবারের ভাব যত বৃদ্ধি হইবে ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইব। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া পরস্পরের সহিত প্রেমবন্ধনের শিথিলতা বা প্রতিবন্ধকতা হইবে না। মত, বিশ্বাস ও ভক্তি যাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলে, তাঁহারা ক্রমে অভিন্নহৃদয় অভিন্নপ্রাণ হইয়া যান। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরা একস্থানে বাস করেন। এইটী মূল বিশ্বাস করিয়া আমাদের মধ্যে যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আশা হয় যে পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব।

প্রঃ। পাঁচ বৎসর একটা সন্তান মরিয়াছে, পরলোকে তাহাকে দেখিতে পাইব যদি আশা করি, তাহাতে কি দোষ হয়?

উঃ। দেখিতে চাওয়া ইচ্ছার বস্তু, কিন্তু বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না। টাকা কড়ির ন্যায় আমাদের আত্মীয় বন্ধু লোভের বিষয়, কিন্তু ঈশ্বর সে লোভ চরিতার্থ করিতে দিবেন কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কামনা অনিষ্টের কারণ হয়। আগামী রবিবার এলাহাবাদ হইতে আগত দুই বন্ধুর সহিত দেখা হইবে এই আশা করিয়া যদি উপাসনা মন্দিরে যাই, আর তাঁহাদিগের সহিত দেখা না হয়, তবে উপাসনা বিনষ্ট হয়, এবং উপাসনা স্থল শূন্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পরলোকে মৃত সন্তানের সহিত দেখা হইবে আশা করিয়া যদি দেখা না পাই, তথাকার কোনও সুখ সম্ভোগ করিতে পারিব না, আবার শূন্যপ্রাণে ইহলোকে ফিরিতে ইচ্ছা হইবে। অতএব পরলোকে সদগতির জন্য ইচ্ছাই স্বাভাবিক ও কল্যাণকর; কোনও বিশেষ লোকের সহিত দেখা করিবার আশা অমঙ্গলজনক। আমাদের একমাত্র আশা, সেখানে ঈশ্বরকে দেখিব, আর তিনি যাহাকে আনিয়া দেন তাহাকে দেখিব।

প্রঃ। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়দের সহিত ব্রাহ্মদের পরলোক-বিশ্বাসের বিভিন্নতা কি?

উঃ। তাহাদের ইহলোক এক, পরলোক স্বতন্ত্র; আমাদের ইহলোক পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত এবং পরলোকের আরম্ভ এখানেই। এ জীবনে যাহার আস্বাদন পাই পরজীবনে তাহা পাইব নিশ্চয় বলিতে পারি। কেবল অনুমান ও সম্ভাবনার উপর ব্রাহ্মের বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এ জীবনে যাহার আভাস না পাই, তাহার দিকে যাইতে ভয় হয়। যাহার প্রত্যুষ দেখি নাই সে দিবসের নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্ম জানেন পরলোকের আশা ইহলোকে নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে ক্রমশঃ তাহা পূর্ণ হইতে থাকিবে।

প্রঃ। Spiritualist অধ্যাত্মবাদীদিগের পরলোক-বিশ্বাস কতদূর প্রামাণিক?

উঃ। আত্মার আত্মায় আধ্যাত্মিক যে যোগ তাহাই বিশ্বাসযোগ্য। ঈশ্বর যদি জিজ্ঞাসা করেন পরলোকে গিয়া কোন খানে থাকিতে চাও? যেখানে পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভা, না যেখানে মধুর সঙ্গীতালাপ হইতেছে, না যেখানে বিদ্বান্ লোক বসিয়া পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, না যেখানে বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে? ব্রাহ্ম বলিবেন, 'কোথায়ও যাইতে চাহি না, তোমাতেই বাস করিতে চাই। তুমিই পরম গতি ও পরম লোক।'

প্রঃ। আধ্যাত্মিক পরিবার ভবিষ্যতে আমাদিগকে গঠন করিয়া লইতে হইবে, সে কিরূপ?

উঃ। পরিবারের যে ছবি আমাদের অন্তরে আছে, তাহার অনুরূপ জীবন্ত বস্তু জগতে নাই, তাহা আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কেহ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না, ঈশ্বর তাহার আরম্ভ ও শেষ। চৈতন্য ও ক্রাইষ্ট এই পরিবার গড়িতেছেন। আমাদিগের 'আশ্রম'ও এই স্বর্গরাজ্যের সূত্রপাত, স্বর্গরাজ্যে আমরা কিছু কিছু পরিমাণে বাস করিতেছি, ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া মাত্র। এখন যে পরিবারের ভাব আমাদের মনে রহিয়াছে চল্লিশ লক্ষ বৎসর পরে তাহা প্রত্যক্ষ করিব, কিন্তু সে সময়েও ইহার সাধনের শেষ হইবে না।

প্রঃ। ঈশ্বর বিশ্বাস ও পরলোক-বিশ্বাস যে এক তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

উঃ। ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয় সংসার ও পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে বাস করি। এখন এইমাত্র জানি তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব। ইহলোক একটা পরলোক আর একটা স্থানে; ইহা হাজার হাজার ব্রাহ্মের সংস্কারগত বিশ্বাস, সহজে তাড়ান যায় না। কিন্তু উপাসনাতে যত তাঁহারা আত্মবান ও উন্নত হইবেন, ততই সত্যের নির্ম্মল আলোক দর্শন করিবেন। পরীক্ষিত সত্যই প্রমাণ।

উপাসনা দ্বারা আমরা পরলোক ধরিতে পারি, অনন্তকাল তাঁহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলোক আমাদের অনন্তকালের বাসস্থান।

'এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পদ্, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।' ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম সম্পদ্, ইনিই পরম লোক, ইনিই পরম আনন্দ, ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মের আর উচ্চ কথা নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পুণ্য কার্য্য—জগতে ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে অনেক বৃহৎ কার্য্যের পত্তন হইয়াছে—ভারতের কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য সমিতি তাহারই একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মানবের প্রাণ অতি আশ্চর্য্য বস্তু—এই প্রাণে যখনই যে সদিচ্ছার উদয় হয়, তাহা বৃথা যায় না। ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আয়র্লণ্ড নিবাসিনী কুমারী সার্লট পেম ও ভারত প্রত্যাগত মিঃ ওয়েলেসলী বেইলী ভারতের কুষ্ঠরোগীদিগের হৃদয়বিদারক ক্লেশ দেখিয়া অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হন। কুষ্ঠ রোগীরা আত্মীয় স্বজন ও সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত, গৃহে তাহাদের স্থান নাই, পথ ভিন্ন তাহাদের আশ্রয় নাই, মুমূর্ষু অবস্থায় তাহারা শৃগাল কুক্কুরের উদরস্থ হইয়া থাকে। কুমারী পেম ও মিঃ বেইলী তাহাদের সাহায্যের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেন। তখন তাঁহাদের মনে এমন আশা জাগে নাই যে, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আশ্রম স্থাপন করিবেন ও তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় হইবে। কিন্তু সেই সদিচ্ছা ঈশ্বরকৃপায় জয়যুক্ত হইল। কেবল ভারতবর্ষে নয়, চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম প্রভৃতি ১৫টি বিভিন্ন দেশে ৪০ বৎসরের মধ্যে ৯০টি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে ৮৬৮৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, ১৯১৪ সালে ৬,৩৪,৭৫৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ৪২৭০ জন কুষ্ঠরোগী মহাপ্রাণ খ্রীষ্টান নরনারীদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, তাহাদের পুত্রকন্যাগণকে তাঁহারা সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন। (সঞ্জীবনী)

সম্প্রতি পিঠাপুরের ইণ্ডিয়ান লেডিজ্ ক্লাবের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহার কতক অংশ দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলার পাঠিকাগণকে তাহার মর্ম্ম অবগত করা প্রয়োজন। নারীজীবনের নূতন কর্ত্তব্য ও আদর্শ বিষয়ে চিন্তা এখন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সকল মহিলা যে বক্তার সহিত একমত হইবেন তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু সকলেরই এ বিষয় গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া প্রার্থনীয়। বক্তৃতার সংক্ষেপ সার এই;—এখন এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন কেবল পুরুষগণ নহে, কিন্তু নারীগণকেও আপনাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অনুভব করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। জাতীয় বিশেষ ভাব ও অতীতের মহৎ দৃষ্টান্ত সকল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের আদর্শ রূপে সম্মুখে ধারণ করিয়া সেবা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই যে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর আত্মার অন্নপান তাহা তাঁহারা বুঝাইয়া দিবেন। কোন জাতির আভ্যন্তরিক শক্তি ও প্রকৃত মহত্ত্ব জানিতে হইলে সেই জাতির মাতৃগণকে দেখিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমি এই নিবেদন করি যে, ভারতের নারীগণ সকলে জাতি, বংশ, ধর্ম্মমত, সামাজিক পদ ভুলিয়া নিরপেক্ষভাবে—সকলে বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় অন্তরে অবধারণ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন। মনুষ্যজাতির উচ্চ ও স্বদেশের গৌরবপূর্ণ আদর্শ লাভ করিতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বংশের অন্তরে আনন্দপূর্ণ উৎসাহ জন্মে ইহা স্বাভাবিক, তাহাকে স্ফুট আকার ধারণ করিতে সাহায্য করাই প্রতি ব্যক্তির কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার।

স্বর্গীয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বন্ধু মৌলবী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের কন্যা কুমারী নূরজাহান খাতুন এবার আর্য্য সাহিত্য সমাজের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরস্বতী উপাধি পাইয়াছেন। মোসলমানসমাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩২২। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্যানন্দ পূর্ণব্রহ্ম, তোমার কোন অভাব নাই, কোন অপূর্ণতা নাই অথচ তুমি নিত্য ক্রিয়াশীল, আপনার অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেমে কেবল সর্ব্বত্র মঙ্গল করিতেছ; তুমি নরনারীকে এই অধিকার দান করিয়াছ যে তাহারা তোমার শক্তি তোমার জ্ঞান ও তোমার প্রেম পাইয়া তাহা দ্বারা তোমার ইঙ্গিত অনুসারে নূতন নূতন সৃষ্টি করিবে, প্রেমরাজ্য নির্ম্মাণ করিবে, এবং এই কার্য্য দ্বারাই তোমার পুত্রত্ব উপলব্ধি করিবে। যদি আমরা তোমার নিকট হইতে শক্তি পাইয়া কার্য্য না করি, যদি জ্ঞান পাইয়া তাহা ব্যবহার না করি ও যদি প্রেম পাইয়া মানুষকে ভাল না বাসি তবে ত আমরা তোমা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িব, অশক্তি অজ্ঞানতা ও অপ্রেমে ডুবিয়া যাইব। সংসারে কত কত নরনারী এইরূপে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি দুঃখে জীবন কাটাইতেছে, আমরাও অনেক সময় সেইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়া দুঃখ পাই। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ও তোমার প্রিয় পুত্র কন্যাগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য ও মঙ্গল বিধান করিবার জন্য আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই। তুমি মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত আছ, সাধুগণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, আমরা যেন তাঁহাদের অনুসরণ করি।

পরিশ্রম কি ঘৃণার্হ ?

শ্রমজীবীগণ কেবল শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবন ব্যয় করে, তাহারা কারুকার্য্য শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন, উচ্চ জ্ঞান প্রকাশ, মহৎ চিন্তা প্রভৃতি করিতে পারে না ; ভার বহন করা, প্রতিদিন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কার্য্যে নিযুক্ত থাকা ইহাই শ্রমজীবীর বিশেষ লক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক শারীরিক পরিশ্রমে জীবন শেষ করিতে বাধ্য হয়। শরীরের আরাম, বিশ্রাম, সুখ স্বচ্ছন্দতা, গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, ভোজনবিষয়ে সুখ বলিয়া যে সর্ব্বজনপ্রিয় সম্ভোগ তাহা শ্রমজীবীর পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ, কারণ তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই ভোজন করে, ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিতে হয় বলিয়া শয়ন করে, শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্যই বস্ত্র ব্যবহার করে, যদি কোন উৎসবাদিতে যোগ দিতে হয় তাহাও কার্য্য হইতে অল্পক্ষণের জন্য অবসর লইয়া অন্তরের একান্ত প্রবল বৃত্তি তৃপ্ত করিতে একটু আহ্লাদ আমোদ আরাম বিশ্রাম সম্ভোগ করে, তাহাও তাহার স্বভাবের তাড়নায় করিতে হয়। কত লোক কল কারখানায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেছে, কত নর-নারী খনিতে দিবারাত্র বাস করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিতেছে, কত লোক ভয়াবহ বনে বা সমুদ্রে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে, কত নরনারী নগরে অতি বিরক্তিকর ও কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিলে প্রকৃতই মনে একটা অস্থিরতা বা অন্ধকার উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রমই সৃষ্টির নিয়ম।

মনুষ্য জাতি সৃষ্টির ভূষণ, নরনারীগণ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভাবে কত উচ্চ বিষয় জ্ঞাত হইয়া ও শরীর মনের সুখকর সামগ্রী ও যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া কত সুখ সম্ভোগ করিতেছে। এ সকল কথা আমরা অতি গৌরবের সহিত বলিয়া থাকি। কিন্তু মানুষ হইয়া কত লোক গো মহিষাদি ইতর জন্তুর মত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, ছাগ মেষাদির মত আপনাদের দেহপাত করিয়া এক ভাবে অন্যের উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হই যে মানুষ সঙ্গীতে সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, নীতিতে, ধর্ম্মেতে, উচ্চ সুখ সম্ভোগ করিবার অধিকারী বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে, শতেক জনের মধ্যে একজন হয়ত উচ্চ অধিকার লাভ করে, অবশিষ্ট সকলেই তাহা হইতে বঞ্চিত, তাহারা শ্রমজীবী, শ্রম লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতেছে. শ্রম করিতে করিতেই তাহাদের জীবন শেষ হইতেছে।

শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া মানুষ দেহে বাস করিতে পারে না, শারীরিক পরিশ্রম না করিলে তাহার অভাব সকল দূর হইতে পারে না, যিনি বিধাতাপুরুষ,

তিনি যখন মানুষকে শরীরধারী করিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পাঠাইয়াছেন তখনই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে শরীরে বাস করিতে হইলেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে। সহজ ভাবে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে শারীরিক পরিশ্রম প্রতি নরনারীর পক্ষে একান্ত সহজ ও কর্ত্তব্য। মনুষ্য সমাজের আদিম ইতিহাস অবশ্য এইরূপেই প্রমাণ করিবে। কিন্তু জনসমাজ উন্নতির পথে যত অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে ততই এই আদিম ব্যবস্থা অপসৃত হইয়া নূতনরূপে শ্রমবিভাগ সম্পন্ন হইতেছে। সভ্য জগতে যেমন কতকগুলি নরনারী কেবল ভারবাহী ইতর জন্তুর ন্যায় দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতেছে, আবার কতকগুলি নরনারী শারীরিক পরিশ্রমকে সর্ব্বপ্রযত্নে ঘৃণা ও পরিহার করিতেছে। তাহাদিগের হস্ত আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য্য করা হয় না, পদ আছে কিন্তু তাহা দ্বারা গম্য স্থানে যাইতে সাহায্য হয় না, মন আছে তাহা দ্বারা আপনার বা জগতের হিত চিন্তা হয় না।

সমাজের এই শ্রেণীর লোক অবশ্য অধিক হইতে পারে না, কারণ এইরূপ অকর্ম্মণ্য এক ব্যক্তির ভার বহন করিতে বহু লোকের প্রয়োজন হয় কিন্তু যে সমাজে এই শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক লোকও ধনজনের উপর নির্ভর করিয়া এইভাবে সংসারের স্বাভাবিক পরিশ্রমের ভাগ না লইয়া কেবল আপনার বিলাস বাসনা তৃপ্ত করিতে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের কুদৃষ্টান্তে অনেক চিন্তাহীন নরনারী এই অস্বাভাবিক জীবনকেই আদর্শ সুখের জীবন মনে করে। এই শেষোক্ত ভ্রমেতেই সাধারণ লোকের ও সমাজের মহা অনিষ্ট হয়। উচ্চপদস্থ সমাজের নেতা, শিক্ষিত নরনারী যখন শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করেন, সমস্ত রকম পরিশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া কেবল পান ভোজন বিলাস কৌতুকে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন তখন সাধারণ জনগণের মনে একটা সংস্কার হইয়া যায় যে পরিশ্রম না করিতে হই-লেই ভাল, কেবল বাধ্য হইলে পরিশ্রম করিব—যতক্ষণ অলস হইয়া থাকা যায় তাহাই লাভ। এইরূপ অস্বাভাবিক ও মহাভ্রান্ত সংস্কার মানুষকে অলস হইয়া থাকিতে দেয় না। সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ অবস্থায় পড়িয়া অধিকাংশ-কেই পরিশ্রম করিতে হয়, কেবল বিরক্ত হইয়া, অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরিশ্রম করে। আজ বহুদিনের কথা—যখন মহারাণী স্বর্ণময়ী অনেক অর্থদান করিতেছিলেন ও সরকারের সম্মান ও সাধারণের প্রশংসা পাইতেছিলেন তখন গল্প শুনিয়াছিলাম যে অত্যন্ত গরীব নিম্ন শ্রেণীর একটি মেয়ে তাহার মাকে বলিয়াছিল—"আমি যদি রাণী স্বর্ণময়ী হইতাম তাহা হইলে সমস্ত দিন কেবল গুড়ই খাইতাম আর কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া থাকিতাম।" গরীব বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে জীবনে যাহা কিছু সুখকর তাহা এই কথাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে—যতদূর ভাল হইতে পারে খাওয়া, শয়ন করা ও কিছুই না করা। ইহাই যেন আদর্শ সুখের জীবন। অন্য সকল শ্রমজীবী লোকে

এরূপ কথা না বলুক, কিন্তু সাধারণ লোকের সংস্কার যে যদি পরিশ্রম না করিলে চলে তাহা হইলে আর পরিশ্রম করিবে না।

আমরা শ্রমজীবীদিগের বিষয় এখানে অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তাহারা চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং পরিশ্রম করিয়া জীবন শেষ করাকে কোন লজ্জা বা দুঃখের অবস্থা মনে করে না। কিন্তু যে সকল মধ্যবিত্ত ও ধনী নরনারী ইচ্ছা করিলে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম না করিয়াও অন্ন বস্ত্র পাইতে পারে তাহাদের বিষয়ই বিশেষরূপে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যদি শুদ্ধ শরীরের কথাই চিন্তা করা যায়, শরীরকে সুস্থ সবল রাখিয়া দীর্ঘকাল শারীরিক জীবন ভোগ করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় এবং আদর্শ যদি সম্পূর্ণ স্বার্থপরতাই হয় তাহা হইলেও দেখিতে হইবে পরিশ্রম না করিলে পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হইবে, ক্ষুধামান্দ্য হইবে ও ক্রমে নানারূপ রোগ উপস্থিত হইবে। পরিশ্রমবিহীন শরীরের মাংসপেশী সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, শরীরের সুখকর কার্য্য সকলও করা সম্ভব হইবে না। এমন কি আহারীয় সামগ্রীতে রুচি থাকিবে না, সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি আসিয়া জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলিবে। ফলে বসন ভূষণ পান ভোজন প্রভৃতি ভোগ করিতেও রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা স্বাস্থ্য-রক্ষা করা প্রয়োজন। বিধাতার নিয়ম অতি কঠিন, যে কিছু দিবে না, কিছু করিবে না, সে কিছু লইতেও পারিবে না। কিছু না করিয়া যে পৃথিবীর সামগ্রী চুরি করিয়া খাইবে তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে—সে রোগে ভুগিবে। দ্বিতীয়তঃ মনের সুখের কথা মন লইয়াই মানুষ, কাজ কর্ম্ম পরিশ্রম না করিলে মন কেমন থাকে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অলস মনের দশা কি হয় তাহা পরীক্ষা করিতে আমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে না, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে সকল লোকের কোন বিশেষ কার্য্য নাই, যাহাদের কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না তাহারা অসার বিষয় লইয়া ব্যস্ত, শরীর ও মনের কোনরূপ প্রলোভনের বস্তু আসিলেই তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, কেবল কল্পনার সুখ দুঃখ লইয়া সময় কাটায়, তাহাদের মনে কখনও শান্তি ও সন্তোষ আসিতে পারে না। অলস ব্যক্তির চরিত্রে কোনরূপ দোষ প্রবেশ করিলে তাহা দূর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ ইচ্ছাশক্তির চালনা না করাতে তাহাদের মনে কোন বল হইতে পারে না এবং সংসারের নিয়মে যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহাই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং কোনরূপ উচ্চ ভাব তাহাদের মনে স্থান পায় না, কারণ উচ্চ চিন্তা পোষণ করাতে মানসিক পরিশ্রম অতি গুরুতর, তাহা অলস ব্যক্তির দ্বারা হয় না। ধনী ও মধ্যবিত্ত অলস ব্যক্তির মনে যত প্রকার পাপ দুষ্কার্য্যের কল্পনাই উপস্থিত হয় ও তাহা দ্বারা কেবল অনিষ্টই সঙ্ঘটন হয়।

যে পরিবারে বা সমাজে পরিশ্রমবিমুখ ব্যক্তি বাস করে তাহার পক্ষে সে ব্যক্তি একটা দুর্ব্বহ ভার ভিন্ন আর কিছু নয়, ফলে তাহা বলিলেও যথেষ্ট হয় না ; কারণ যদি কোন মানুষের পৃষ্ঠে একখণ্ড পাথর চাপাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে সে ভার কষ্টে বহন করিতে হয় মাত্র কিন্তু অন্য কোন অপকার করিতে পারে না। কিন্তু অকর্ম্মণ্য মানুষ সমাজের বা পরিবারের উপর চাপিয়া থাকিলে সমাজের চারিদিকে বিষ ছড়াইয়া অনিষ্ট করে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিত থাকা তাহার পক্ষে একটা সুখের ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিবার অথবা সমাজের পক্ষে মানুষ কেবল কার্য্য দ্বারাই বিচারিত হয়। যে ব্যক্তি এক সপ্তাহে, এক মাসে বা এক বৎসরে কোন কার্য্য করিল না সে যে জীবিত ছিল তাহা পরিবার, সমাজ বা পৃথিবীর কিছুই লাভের বিষয় নয়। সে ব্যক্তি যত ধন মান সম্ভোগ করুক না কেন, সে যদি জগতের হিতকর কিছু না করিল তবে তাহার জীবন ধারণ বৃথা, সে জগতের নিকটে মৃত, তাহার জন্য যে অন্ন বস্ত্র ব্যয় হয় তাহা অপব্যয়। মধুমক্ষিকাসমাজ এরূপ ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে, মনুষ্য সমাজে এরূপ ব্যক্তিকে যদি কারাগারে আবদ্ধ করিয়া শ্রম করিতে বাধ্য করা হয় তবে কিছুই অন্যায় করা হয় না।

শ্রমবিমুখ নরনারীর প্রতি শ্রমশীলগণের বিরক্তির দৃষ্টি পড়িবে ইহা স্বাভাবিক—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা জগতের শ্রমশীলগণের কৃপাপাত্র—এবিষয় হয়ত অনেকের মনে উপস্থিত হয় না, কারণ অলস ব্যক্তিগণ বহু ধনের বা উচ্চ পদের মোহে চাপা পড়িয়া মৃতবৎ জীবন ধারণ করে। কাহারও হয়ত অর্থ আছে—কাহারও হয়ত ধনী বন্ধু আছে. এই বাধাবশত জগতের সুখের পথ—আপনার শরীর মন দ্বারা নূতন সৃষ্টি করা. বিধাতা যেমন নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছেন, তেমনই যাহাছিল না তাহা গড়িয়া তোলা, যাহা লোকে বুঝিতে পারিতেছে না তাহা বুঝাইয়া দেওয়া, এই যে দেবতার অধিকার তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, পিতৃমাতৃহীন শিশুর পিতামাতাস্বরূপ হইয়া তাহার সাহায্য করা, পরিবারের সমাজের বা দেশের কোন অভাব দুঃখ দূর করা—যে সকল কার্য্য বিশেষভাবে করিয়া সামান্য মানুষ মহাজন হইয়াছেন. জগতের শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, তাহা করিবার শক্তি ও বুদ্ধি থাকিতেও তাহা না করা ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয় ? সকলেই যে মহাজন হইবে, জগন্মান্য হইবে তাহা নয়, ফলে মহাজনেরা যে সকল কার্য্য করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা মান্য প্রাপ্ত হন সেরূপ কার্য্য প্রতি গৃহে প্রতি সমাজে দিন রাত্রি হইতেছে এবং এই সৎকার্য্য করিবার সুখেই মানুষ সংসারে থাকিয়া সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছে। যখন আমরা চারিদিকে চক্ষু চাহিয়া দেখিতে পাই যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জগতের সেবা করিতেছে, সূর্য্য চন্দ্র যথাসময়ে উদয় অস্ত যাইয়া সেবা করিতেছে, তৃণ গুল্ম বৃক্ষ লতা সকলেই আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত, কীট পতঙ্গ পশু

পক্ষী সকলেই কার্য্য করে; যখন দেখিতে পাই যে, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, সমাজের সহস্র প্রকারের সেবক পরিশ্রম করিতেছে বলিয়া সমাজের অভাব দূর হইতেছে; অপর দিকে রাজা বা প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রী, শত শত রাজকর্ম্মচারী, মনস্বীগণ, শারীরতত্ত্ব-বিদ্‌গণ, কবিগণ, গায়কগণ, শিল্পীগণ শত শত প্রকারের ব্যবসায়ীগণ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া জনসমাজরূপ মহাব্যাপারকে চালিত রাখিয়াছে; যখন আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বনিয়ন্তা আপনি এই সকল লোককে পরিশ্রম করিবার শক্তি দিতেছেন, স্বাস্থ্য দিতেছেন, তাহাদিগকে মন্দ কার্য্য হইতে রক্ষা করিতেছেন ও শরীর ও মনের চালনার ভিতর দিয়াও তাহাদিগকে সুখ দিতেছেন, তখন কি আমরা কেহ একথা মনে করিতে পারি যে, জগতের লোক শরীর মনের পরিশ্রম করিয়া যে সুখ স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে তাহা হইতে আমরা ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত থাকিব? একান্ত উন্মাদগ্রস্ত না হইলে কখনও এরূপ প্রবৃত্তি হইবে না।

শরীর দ্বারা হউক বা মন দ্বারা হউক কার্য্য করাই সৃষ্টির নিয়ম এবং কার্য্য না করাই মৃত্যু—একথা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। অথচ সকলেই যে সকল কার্য্য করিবে তাহা সম্ভব নয়। সমাজে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য বা গভীর চিন্তা করিবার কার্য্য আছে। যে ব্যক্তি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে অথবা কঠিন রোগের সুচিকিৎসা করিতে পারে তাহার দ্বারা কেবল জল তুলাইয়া লওয়া বা মাটির ভার বহন করাইয়া লওয়া সমাজের পক্ষে মহা ক্ষতির ব্যাপার, তাহা অবশ্য কেহ ইচ্ছা করিবে না। প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে ও সমাজের বা পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেককে কার্য্য করিতে হইবে। কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত সামাজিক দৃষ্টিতে উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কার্য্যকরী শক্তিতে অতি হীন অবস্থায় স্থিত। এরূপ অবস্থায় নরনারীকে বিশেষ সাবধান হইয়া আপনার উপযুক্ত কার্য্য নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্ম না থাকিলে আমাদের দেশের চাকুরী-জীবী বাবুশ্রেণীর লোক কর্ম্মের জন্য যেমন ছটফট করিতে থাকেন—যে আফিসে হউক, যত দূরে হউক, যেরূপ কার্য্য হউক একটা হইলেই কার্য্য গ্রহণ করিয়া আপনার ও পরিবারের জীবনধারণের উপায় করেন, তেমনই যেসকল লোকের শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে অথচ কোন কার্য্য নাই তাঁহারা ঠিক সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া আপনার উপযুক্ত কার্য্য স্থির করিয়া তাহাতে নিযুক্ত হইবেন। কারণ কেরাণীবাবুর যেমন চাকরী না থাকিলে অন্নবস্ত্রাভাবে মরণ, তেমনই কার্য্য করিবার শক্তি আছে অথচ কার্য্য নাই এরূপ অবস্থা হইলে শীঘ্রই রোগ, কুঅভ্যাস, পাপ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। কার্য্য না পাইলেই মরিতে হইবে নিশ্চয়।

পরিশ্রম সকলকেই করিতে হইবে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, ফলে যদি কাহাকেও বলা যায় যে তোমার ধন জন আছে বলিয়া তুমি পরিশ্রম না করিয়া সংসা-

রের অন্নধ্বংস করিতেছ, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই কিছু না কিছু কাজ দেখাইবে। বিশেষ যাহারা একটু উচ্চ শ্রেণীর লোক তাহারা বলিবে আমরা শারীরিক পরিশ্রম করি না সত্য, কিন্তু চিন্তা দ্বারা অনেক কার্য্য করি। ফলে এ বিষয়ে অনেকেই হয়ত আত্মপ্রবঞ্চিত। কতকগুলি কথা মনে আসিলেই যে চিন্তা করা হইল তাহা নয়। চিন্তা দ্বারা পরিবারের বা সমাজের সেবা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ লোকে বিশেষ নারীজাতির অনেকে চিন্তা করতেই পারেন না। মনের ভিতরে শত প্রকারের ভাব কল্পনা আসিয়া মনকে ব্যস্ত করিয়া রাখে কিন্তু কোন বিশেষ প্রশ্ন অন্তরে পোষণ করিয়া চিন্তা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম।

সে যাহা হউক, যদিও শরীরের পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা উভয়ের দ্বারাই কার্য্য করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ মানসিক কার্য্য করা চিন্তা করা যথেষ্ট কার্য্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিলে অনেক কথা বলিতে হয়, কিন্তু সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সুস্থ মনে কার্য্যকর চিন্তা পোষণ করিতে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শরীর ও মনকে সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখা প্রয়োজন। যাঁহার অন্য যে উচ্চ কার্য্য থাকুক, প্রত্যেককে আপনার প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল নিজহস্তে করা সকল বিষয়েই ভাল। আজকাল অনেকে স্বাস্থ্যরক্ষা বা তাহার উন্নতির জন্য ব্যায়াম করিয়া থাকেন —তাহা প্রয়োজন হইলে করিবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য যে অন্য লোকের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে তাহা যদি নিজে করিয়া লয়েন তাহা হইলে শারীরিক পরিশ্রমও হয় এবং পরিবারের কার্য্যের সাহায্য করা হয়। শারীরিক পরিশ্রমকে যে ব্যক্তি নীচ মনে করে তাহার পক্ষে অন্য কাহারও শারীরিক পরিশ্রমের ফল লাভ করিবার অধিকার নাই।

জন হ্যালিফ্যাক্স

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর কত সপ্তাহ গত হইয়াছে। আমরা উরসুল্লা মার্চ্চের কত নিকটে রহিয়াছি। উরসুল্লা এখন মিসেস জেসপের কাছেই থাকে। জনের পক্ষে ইহা বড়ই পরীক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মিসেস জেসপ আমাদের আর নিমন্ত্রণ করেন নাই। তিনি নরটনবারীর লোকদিগকে ভয়ানক ভয় করিতেন, তাহারা পরের নিন্দা করিতে খুব তৎপর ছিল, সেই জন্য তাঁহার স্নেহের উরসুল্লার যাহাতে কোন রকম বদনাম না হয় সে বিষয় খুব

সাবধান হইলেন। ইহার মধ্যেই উরসুলার "সে নিজের আত্মীয়দিগের প্রতি ভয়ানক অকৃতজ্ঞ" ইত্যাদি বদনাম উঠিয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যেই "হ্যালিফ্যাক্সের ও বার্থ-উডের" দন্দ্বের কাহিনী শত বর্ণনায় বর্ণিত হইয়া সমস্ত সহরে ঘোষিত হইয়াছিল। ভাগ্যে হ্যালিফ্যাক্স ও মিস্ মার্চ্চের নামে জল্পনা হয় নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জন ক্ষেপিয়া উঠিত।

যদিও জন উরসুলাকে প্রায় দেখিতে পাইত কিন্তু সে দেখা ক্ষণিকের জন্য, হয়তো রাস্তায় যাইতে যাইতে কখন দেখা হইত উভয়ে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইত, কিম্বা হয়তো কোন দিন উরসুলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে জনের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িত। যে দিনই তাহার সাক্ষাৎ হইত সে দিন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম তাহার কি হইয়াছে। সে কত ভাবে নিজের মনকে অন্যমনস্ক করিতে চাহিত কিন্তু যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিত না। সে যে কি এক সন্দেহ ও বেদনা লইয়া দিন কাটাইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতাম।

যদিও সে কখনও কিছু বলিত না, কিন্তু আমার "বালকের" যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। তাহার শক্তিক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, সে দুর্ব্বল ও রোগা হইয়া পড়িতেছিল। তাহার উৎসাহ ও শান্তভাব যাহা ছোটবেলা হইতে তাহার বিশেষত্ব ছিল তাহা যেন সে হারাইয়া ফেলিতেছিল।

একদিন বিকালে জন ভয়ানক চেহারা লইয়া গৃহে ফিরিল, আমি বুঝিতে পারিলাম রাস্তায় মিসেস জেসপ ও মিস্ মার্চ্চের সহিত নিশ্চয়ই দেখা হইয়া থাকিবে; বলিলাম, "ভাই ডেভিড, তোমাকে নিয়ে কি করবো বল তো? আমার ভয় হচ্ছে তোমার কি ভয়ানক অসুখ করেছে?"

"আমার কিছুই হয় নি। আমায় জ্বালাতন কর কেন? আমার জন্য তোমার অত মাথাব্যথা কেন?

দুমিনিট পরেই সে নিজ রূঢ়তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"না তাহাতে আর কি, তুমি যে তখন অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

"হাঁ ঠিক বলেছ। আমার মনের ভিতর শয়তান আছে, সময়ে সময়ে সে যেন মনটাকে নরকের মত করে দেয়।"

কি বেদনাভরে যে জন কথাগুলি উচ্চারণ করিল, কিন্তু আমার যে সান্ত্বনা দিবার কিছুই ছিল না।

আমরা উভয়ে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতেছিলাম। দূর হইতে ছোট ছেলেদের আনন্দ কোলাহল শোনা যাইতেছিল।

"কি সুন্দর দৃশ্য!"

"জন! ভাই আমায় ভোলাতে চেষ্টা কোরো না, তুমি কি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ?"

"হাঁ, তিনি নরটনবারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ!"

"ও জন, আমারও হয়তো ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমি যে তাঁহার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছি যে তিনি ইহার হাত হইতে আমায় পরিত্রাণ দিন কিম্বা আমায় একেবারে তুলে নিন। আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না ভাই।"

জন নিজের হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

"ভাই জন যদি তুমি এ রকম যাতনা অনুভব না করে তাঁর কাছে তোমার মনের কথা খুলে বল তাহালে ভাল হয় না কি?"

"আমিও সে কথা ভেবেছি, আমার মত গরীব লোকের ইহা আশা করা ত আস্পর্দ্ধা। আমি দুবার পাগলের মত মিসেস জেসপের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রত্যেক বারেই দরজা খুলিবার আগেই আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং আমি বিরত হইলাম এবং নিজেকে অপমানিত না করিয়া ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইলাম।

আমার উত্তর দিবার কিছু ছিল না, একজন অল্পবয়স্ক—একুশ বৎসরের ছেলের যাহার কিছু আয় নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই তাহার একজন বড়লোকের মেয়েকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা যে পৃথিবীর চক্ষে ভয়ানক অন্যায় মনে হইবে তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম।

"ডেভিড ভাই তুমি যদি কখনও তাঁহাকে না দেখিতে তাহা হইলে কি মঙ্গলই না হইত"

"চুপ! অমন কথা বল না। যদি তুমি তাঁহার আত্মত্যাগের কাহিনী রোজ রোজ আমার মত শুনিতে পাইতে তাহা হইলে কখন এমন কথা বলিতে না। আমার মহা সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এমন লোকের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তিনি দূত স্বরূপ, না তাঁকে আদর্শ নারী বলিলেই ঠিক হয়—আমি তাঁহাকে নিজ জীবন পথের সঙ্গীরূপে, দুঃখের সাথী, মনের বল, পবিত্র করিবার যন্ত্রস্বরূপ চাহিয়াছিলাম। তাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইলে আমি মানুষ হইতে পারিতাম। কিন্তু এখন—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জোরে জোরে পায়চারী করিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি ঠিক পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল।

"ফিনিয়স মিস মার্চ্চ হয়ত এখনি এ পথ দিয়া যাইবেন, চল আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, আমার তো প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি অভিবাদন

ক'রে চ'লে যান"—বলিতে বলিতেই মিসেস জেসপ ও মিস মার্চ্চ উভয়ে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন দেখা গেল।

তাঁহাদের বোধ হয় আমাদের কথা একটুও মনে ছিল না। কেবল যখন আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন উরসুল্লা তার চির প্রফুল্লিত মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে একবার তাকাইল। সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না কারণ জন আমাকে জানালার নিকট হইতে টানিয়া লইয়াছিল। তাঁহারা নিজেদের পথে অগ্রসর হইলেন।

"ফিনিয়স, আমার সব শেষ হইল।"

"জন, তুমি কি বলিতেছ?"

"তাঁহাকে আমার এই শেষ দেখা।"

"তিনি তো এখনই এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন না?"

"তিনি যাচ্ছেন না কিন্তু আমি যাচ্ছি। আমি নিজেকে রক্ষা করিতে চাই। কালই আমি আমেরিকা যাবার জন্য বৃষ্টলে গিয়া উপস্থিত হইব।"

জন হাসিতে হাসিতে চিৎকার করিয়া পাগলের মত এই কথাগুলি বলিয়া বসিয়া পড়িল।

তার পরদিনই জনের খুব জ্বর হইল। সে সময় চারিধারেই খুব জ্বর হইতেছিল, জেল বলিল সে অনেককে আরোগ্য করিয়াছে জনকেও করিতে পারিবে, এবং সে ডাক্তার জেসপকে আসিতে দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। আমিও ইহাতে কোন বাধা দিলাম না, কেন না জানিতাম জনের অসুখ মনের উত্তেজনায় হইয়াছে তাহাকে এ সময় যত একলা রাখিবার সুযোগ দেওয়া যায় ততই ভাল, জেল সেবা করিবে জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

কয়েক দিন পরে বাহিরের একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল তিনি আসিয়া বলিলেন, "এ জ্বর ভিজে সেঁতসেঁতে ঘরে যখন থাকিতেন তখন হইতেই ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হইয়াছিল এখন ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন ভয়ের কারণ নাই শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

কিন্তু কই জন তো ভাল হইল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতে লাগিল, সে সেই একই ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিত, কোন গোলমাল কিম্বা আব্দার বা পরিবর্ত্তন ছিল না, কেবল বোঝা যাইত যে, সে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যখনই আমি ভাল হইবার কথা বলিতাম তখনই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইত যেন সে এ পৃথিবীর জীবন আর চায় না।

একদিন সকালে আমি আদর করিয়া তাহার শীর্ণ হাত টানিয়া লইয়া নিজের হাতের ভিতর রাখিলাম। জন তাড়াতাড়ী তাহা টানিয়া লইল।

"ফিনিয়স, ভাই আমায় স্পর্শ করিও না—আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।"

"হায় আমার বন্ধু, আমার একমাত্র আশার স্থল, সে কি আমায় একা ফেলিয়া চলিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।"

আমি কতবার ভাবিয়াছি যে যখন ভগবানের আমাকে এই পৃথিবী হইতে ডাকিয়া লইবার ইচ্ছা হইবে তখন আমি নীরবে চলিয়া যাইব—জন শেষ পর্য্যন্ত আমার পাশে থাকিবে—তাহার ভালবাসা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকেও আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিবে, আমার অপূর্ণ শীর্ণ জীবন তাহার সঙ্গে বিলীন হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ কি? এখন আমি আগে না গিয়া সে কি আমায় আগে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? আমার মাথা আপনা আপনি সেই শ্রীচরণে লুটিয়া পড়িল বলিলাম, "বিশ্বপতি, কোন গতি কি নাই?"

এক পথ ছিল। আমি খড়খড়ী খুলিয়া বাহিরে চাহিলাম, জনের চোখে আলো পড়ায় বলিয়া উঠিল "বন্ধ করে দাও চোখে বড় লাগে"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তত হইয়া কাহাকেও কিছু না জানাইয়া উরসুল্লা মার্চ্চের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

যখন পৌঁছিলাম, ডাক্তার জেসপ তখন বাড়ী ছিলেন না, উরসুল্লা বসিয়া মোজা বুনিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া হাসিলেন, "আপনাদের তুজনকে অনেক দিন দেখি নাই, আজ আপনি এসেছেন খুব আনন্দ হলো"—কাঁটা আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

"না দেখিবারই কথা, জনের ভয়ানক অসুখ, সে প্রায় মর মর"—বলিয়াই কথাগুলি উরসুল্লা কি ভাবে নেন তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম।

দেখিলাম মিস মার্চ্চ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁর যেন ভয়ানক আঘাত লাগিল।

"এত অসুখ আর আমায় আপনারা জানান নাই।"

"আপনার আর তাহাতে কিসের ক্ষতি? কিন্তু আমার কাছে জনের অপেক্ষা প্রিয় জিনিষ যে পৃথিবীতে আর কিছু নেই সে যদি চলে—"।

আমার প্রাণের বেদনা তাঁহাকে জানাইলাম হায়, তিনি কি সে ব্যথায় ব্যথিত হইবেন না। তিনিই কি এই বেদনার কারণ নহেন!

উরসুল্লা উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন। তাঁহার হাত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এবং গলা কাঁপিতেছিল।

"ভয় পাবেন না। ভগবান নিশ্চয়ই দয়া করিবেন।"

তিনি যেন আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে বিপদের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ ঝড় উঠিলে পাখী যেমন ভয়ে কোন আশ্রয় চাহে তেমনি ভাবে উরসুল্লা বসিয়াছিলেন।

"যাই মিসেস্ জেসপকে ডাকিয়া আনি তিনি হয়তো কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন।"

"যাইবেন না, তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না।"

"তবে কি ডাক্তার জেসপকে খবর দিব?

"বাহিরের ঔষধ তাঁহার কিছুই উপকারে আসিবে না, তাঁহার তো শারীরিক অসুখ নহে, মানসিক অসুখ। মিস মার্চ্চ আপনি কি জানেন না আমার বন্ধুর মৃত্যুমুখে পতিত হইবার কারণ কি?

"মৃত্যুমুখে!" মিস্ মার্চ্চের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

"একবার ভেবে দেখুন যে শরীর পৃথিবীর কত উপকার আসতে পারে সে শরীর কি এমনি করে ভেঙ্গে যাবে। স্বাস্থ্য থাকিলে হয়তো ইহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু এখন যে আর তাহাও নাই। যদিও আমি তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি এবং খুব ভাল করিয়াই জানি যে আমা অপেক্ষা অধিক তাহাকে কেহই ভালবাসিতে পারিবে না, তথাপি আমিও বেশ বুঝিতেছি যে তাহার জীবনে পরিবর্ত্তনের দরকার। কিন্তু আর বেশী বলা আমার উচিত নহে—"।

"আর বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি যেন কথাটা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল ও আগ্রহের সহিত আমার দিকে চাহিলেন"

"মিস মার্চ্চ ইহা সত্য আপনি নিশ্চয়ই ইহার সন্ধান করিবেন।"

আর একটীও কথা শুনিতে পাইলাম না তিনি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন।

"কি আপনার কি বলিবার কিছুই নাই। আমার বন্ধু মরিতেছেন, তাঁহার কাছে কি আমাকে দিয়া একটাও কথা বলিতে চাহেন না?"

কোন কথা শুনিতে পাইলাম না।

"তাহালে তাই হোক—তাঁর মত ভাল লোকের স্বর্গই উপযুক্ত স্থান, কোন মেয়েই তাঁর উপযুক্ত হতে পারেন না।"

আমি তাঁহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পরের কথা যত কম বলি ততই ভাল। আমার মন ভাবনায় তোলপাড় হইতেছিল। এখন আমি বলিতে পারি না যে যাহা আমি করিয়াছিলাম ভাল করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বলিতে পারি যে যেন কোন অজানিত শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া করিয়া ফেলিয়াছিলাম ও তাহার পর বিশ্বাস করিয়া ইহার ফলাফল সেই বিশ্বশক্তির উপর ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু অস্থির মন কি সহজে বশে আসে?

আমি একবার বলিয়াছি এবং আবার বলি যে প্রত্যেক যথার্থ বিবাহ—যাহা পাঁচ হাজারে একটী খুঁজিয়া পাইবে—তাঁহারই হাতে; এখানে মানুষের শক্তি কোন কাজেই

আসে না, এবং হাজার বাধা দিলেও ইহার ক্ষতি হয় না—সেজন্য সকল ফলাফল তাঁহার হাতে অর্পণ করিয়া মনে বল করিয়া জনের ঘরে ঢুকিলাম।

দরজার কাছেই জেলের সঙ্গে আমার দেখা হইল।

"ফিনিয়স, আস্তে—রোগীর যেন একটু পরিবর্ত্তন মনে হচ্ছে।"

"ভগবানকে শত ধন্যবাদ যে, যে পরিবর্ত্তনের কথা উঠিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে ইহা সে পরিবর্ত্তন নহে, জন সত্যই ভাল হইয়াছে। সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত চেহারার ভিতর দিয়া যেন নূতন জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ আশা নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চ ও গভীর জিনিষ।

"ফিনিয়স, তোমায় কি রকম ক্লান্ত লাগছে; তোমার এখন ঘুমুবার সময় হয়েছে।"

কত দিন জন আমায় আদর করে নাই, আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। পুরুষের কান্না লজ্জার বিষয় কিন্তু মনুষ্যসন্তান ঈশাও তো বন্ধুর ভাইয়ের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে কেঁদেছিলেন।

"ভাই তোমাকে আর বিরক্ত করিব না, ভগবানের কৃপায় আশা করি এবার একেবারে সারিয়া উঠিব।" আমি জনের হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

"জন, আমি যদি স্বপ্নের মত অলীক কথা বলি তাহালে হাঁসিবে না তো?"

"ভাই, সেই শক্তি যে অসম্ভব সম্ভব করাইয়া দেন তাহা তো জানি।"

"জন, তুমি যেখানে বসিয়া রহিয়াছ সেখানে তিনি এতক্ষণ বসিয়াছিলেন।"

"কে?"

"উরসুল্লা।"

জন কখনও "মিস মার্চ্চ" ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করে নাই, আজ তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া উরসুল্লা নাম উচ্চারিত হইল।

"হাঁ তিনি এতক্ষণ আমার কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তিনি জানিতেন যে আমি তাঁহাকে ভালবাসি—এত বেশী ভালবাসি যে তাঁহার জন্যই আমি শয্যাশায়ী; কিন্তু সেটা কি ঠিক হইতেছে; আমার নূতন উদ্যম লইয়া পৃথিবীর কাজ করা উচিত, তাঁহার জন্য নহে; কিন্তু ভগবানের জন্য করা উচিত। একজন প্রকৃত পুরুষ রমণীর ভালবাসার জন্য কখনও প্রাণত্যাগ করিতে বসে না কিন্তু উচ্চ ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিজ ভালবাসার পরিচয় দিয়া থাকে।"

আমি অবাক হইয়া জনের কথা শুনিতেছিলাম, উরসুল্লার চোখ ফুটিয়া যে এই বাণীই বাহির হইত। জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি কি আর কিছু আশা দেন নাই?"

"না আর কিছুই বলেন নাই। ফিনিয়স, আমি আর কিছু বুঝি বা না বুঝি এই

টুকু বলিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আমি তাঁহার উপদেশমতে চলিতে চেষ্টা করিব—মানুষের মত হইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইব।"

ক্রমশঃ।

পণ্ডিত বালক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অন্য একদিন পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বগ্রামবাসিদিগকে এই আজ্ঞা প্রেরণ করা হইল, "রাজা দোলায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; রাজসদনে বালুকানির্ম্মিত যে পুরাতন রজ্জু ছিল তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অতএব বালুকাদ্বারা অন্য একটী রজ্জু প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিবে; না করিলে এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসিগণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; পণ্ডিত বালকও এই প্রশ্ন তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত করা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গ্রামবাসিগকে আশ্বস্ত করিয়া বচনকুশল কয়েকজন ব্যক্তিকে আনাইলেন এবং বলিলেন, "রাজসমীপে যাইয়া বল, দেব, গ্রামবাসীরা দোলার রজ্জু কি প্রকার স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম হইবে তাহার কোনও আন্দাজ বুঝিতে পারিতেছে না; সুতরাং ঐ বালুকানির্ম্মিত পুরাতন রজ্জুর এক বিঘৎ কিম্বা চারি অঙ্গুল মাত্র এক খণ্ড নমুনা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রেরণ করেন তাহা দেখিয়া সেই অনুসারে তাহারা রজ্জু প্রস্তুত করিতে পারে।" তখন যদি রাজা বলেন, আমাদের নিকট বালুকা নির্ম্মিত রজ্জু কোনও কালে ছিল না, তবে তাঁহাকে বলিবে, "মহারাজ, আপনিই যদি ঐরূপ রজ্জু প্রস্তুত করাইতে না পারেন তবে পূর্ব্বগ্রামবাসিগণ কোথা হইতে বালুকার রজ্জু আনিতে পারিবে?" এই পরামর্শ দিয়া ঐ কয়েকজন ব্যক্তিকে পণ্ডিত রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাহারা পূর্ব্বকথিতরূপে রাজাকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া রাজা কাহার দ্বারা এই সুচতুর উত্তর প্রস্তুত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে ইহা মহৌষধ কুমারের কাজ তখন অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন।

অন্য এক দিন পূর্ব্বগ্রামবাসিদিগকে আজ্ঞা প্রেরণ করা হইল যে, "রাজা জলক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, অতএব তোমরা পঞ্চবিধপদ্ম-সমাচ্ছন্ন নূতন একটী পুষ্করিণী শীঘ্র রাজার নিকট প্রেরণ করিবে; না করিলে সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" সকলে পণ্ডিতকে এই কথা জ্ঞাপন করিল; তিনি বুঝিলেন যে তাঁহারই জন্য এই কূট আজ্ঞা এবার করা হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কয়েকজন বচনকুশল ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা সকলে অনেকক্ষণ জলে ক্রীড়া করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সিক্তবেশ, সিক্তবস্ত্র ও কর্দ্দমাক্ত শরীর হইয়া, হস্তে রজ্জু, দণ্ড, লোষ্ট্র

ইত্যাদি লইয়া রাজদ্বারে গমনপূর্ব্বক তোমাদের আগমনবার্ত্তা রাজাকে জানাইবে, জানাইয়া প্রবেশের অনুমতি পাইলে পর প্রবেশপূর্ব্বক বলিবে, মহারাজ, আপনি পূর্ব্বগ্রামবাসিদিগকে পুষ্করিণী প্রেরণ করিতে আজ্ঞা করায় আমরা আপনার উপযুক্ত একটী মহা পুষ্করিণী লইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পুষ্করিণী অরণ্যবাসহেতু নগর দর্শন করিয়া এবং প্রাকার পরিখা অট্টালিকাদি অবলোকন করিয়া ভীতত্রস্ত হইয়া রজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা লোষ্ট্র দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিয়াও কোনও প্রকারে তাহাকে ফিরাইতে সমর্থ হইলাম না; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি প্রাকার পরিখা অট্টালিকাদি কোথাও সরাইয়া রাখিতে পারেন তাহা হইলে আমরা পুনর্ব্বার ঐ পুষ্করিণীকে ধরিয়া আনিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাইতে পারি।" রাজা যদি বলেন যে ইহা অসম্ভব তাহা হইলে তোমরাও বলিবে যে পুষ্করিণী আনিয়া দেওয়াও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং মহারাজা যেন পূর্ব্বগ্রামবাসিদিগকে দোষ না দেন। পণ্ডিত প্রেরিত অনুচরগণ উল্লিখিতরূপ করিলে রাজা পরাজিত হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই সুচতুর উত্তর মহৌষধকুমার উদ্ভাবন করিয়াছেন তখন তিনি সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, পণ্ডিত বালককে এখন আনাইব কি? কিন্তু সেনক অর্থলাভের লোভে বলিল, "ইহাতেই কিছু পণ্ডিত হয় না; আরও কিছুদিন যাক।" তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, "এমন মহাপণ্ডিতকে সেনক আসিতে দিতেছে না। কিন্তু সেনকের কথায় প্রয়োজন কি, আমি নিজেই তাহাকে লইয়া আসি।" এই চিন্তা করিয়া রাজা পারিষদ্‌বর্গের সহিত সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মঙ্গলাশ্বে আরোহণ করিয়া যাইবার সময়ে অশ্বের পদ হঠাৎ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং রাজা বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর সেনক তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, মহৌষধপণ্ডিতকে আনিতে যাইয়া কি লাভ হইল? দেখুন বাহির হইতে না হইতেই কি বাধা ঘটিল!" রাজা লজ্জায় চুপ করিয়া রহিলেন।

পুনরায় একদিন সেনকের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাহাকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া রাজা মহৌষধ পণ্ডিতকে সভায় আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। (সমাপ্ত)

BACTERIA হইতে রোগের উৎপত্তি।

আজ আপনাদের কাছে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আপনারা সকলে ডাক্তার হইয়া যাবেন—রোগ হইলে এই দেশে খুব ভাল ভাল

ডাক্তারের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে. কিন্তু ঘরে ঘরে রোগ নিবারণ করা, রোগীর সংখ্যা কম করা মেয়েদের উপর কত বেশী যে নির্ভর করে তাহা আমরা মেয়ে হইয়াও এখনও বুঝতে পারি নাই।

গত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বিলাতে রোগীর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। তার কারণ ডাক্তারেরা রোগসম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন কারণ ও তাহার প্রতিকারের গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু সেই সব নিয়ম লইয়া কি হইবে যদি আমরা সে সব কাজে না লাগাই। আমাদের উপর আহার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভার! এদেশে দেখা যায় প্রায় শতকরা পঁচিশটি ছেলে জন্মাইবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কত মা সন্তানপ্রসব করিতে মৃত্যুমুখে পড়িতেছেন. এসবের কি কোন প্রতিকার নাই?

এবিষয়ে একটী গল্প আছে। বিলাতে একবার জমীদার পাড়ায় একটী ছেলের অসুখ করিল, তার পর সে রোগ বাড়িতে লাগিল—সকলে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইলেন—সেখানে পাষ্টার বলিয়া একজন খুব বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, তিনি অনুবীক্ষণ দিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন রক্তের ভিতর পোকা (জীবাণু) প্রবেশ করিয়াছে।

ভেড়া ও মানুষের রক্তে সাদৃশ্য দেখা যায়। রক্তের ভিতর জল মিশ্রিত এবং লাল ও সাদা দানা ভাসিতে দেখা যায়, সাদা দানা লাল দানা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম।

হাওয়াতে অনেক রকম ছোট ছোট জীবাণু থাকে যাহা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। এই সকল জীবাণুর আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এই সকল কীটাণু খাবার ও জলের সঙ্গে অনেক সময় শরীরের ভিতর চলিয়া যায়।

কলেরার কীটাণু যদি সংখ্যায় একশত শরীরের ভিতর প্রবেশ করে তাহা ২০ মিনিটের ভিতর দুই শততে পরিণত হয়, ৪০ মিনিটে দুইশত চারিশতে পরিণত হয় এবং এই হিসাবে অল্প সময়ের ভিতর কি ভয়ানক বাড়িয়া উঠে। এই সকল পোকা হইতে বিষ বাহির হইয়া রক্তকে দূষিত করে ও মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

প্লেগ রুগীর রক্ত ও বাঘি কীটাণুতে পরিপূর্ণ থাকে। প্রথমে ইঁদুরের ভিতরই এই পোকা প্রবেশ করে। প্লেগে আক্রান্ত ইঁদুরের উপর পিসু আসিয়া দংশন করে এবং পোকার বিষ চুষিয়া লয়, পরে সেই বিষপূর্ণ মুখে মানুষকে দংশন করিয়া ক্ষত স্থানে সেই বিষ ঢালিয়া দেয়।

ঘা ভাল করিয়া বাঁধিয়া না রাখিলে সহজেই পোকা ঢুকিয়া রক্তকে বিষাক্ত করিয়া দেয়।

এখন হয়তো সকলের মনেই এই প্রশ্ন হইতে পারে, যখন সমস্ত সংক্রামক রোগই কীটাণু ঢুকিলে হয়, তাহা হইলে কেহ সারিয়া উঠে কেহ মরিয়া যায় ইহার কারণ কি?

প্রথমেই বলা হইয়াছে রক্তের ভিতর দুরকম দানা থাকে, লাল ও সাদা, এই সাদা দানার পোকাগুলি খাইয়া ফেলিবার শক্তি আছে। যেই পোকা প্রবেশ করে অমনি ইহারা ছুটিয়া গিয়া খাইতে আরম্ভ করে। সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সাদা দানার শক্তি খুব বেশী হয়, সেজন্য সে পোকার বংশ কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর নির্ব্বংশ করে সুতরাং খুব সুস্থ ও সবল ব্যক্তির রোগ হয় না, তদপেক্ষা যাহারা একটু কম সুস্থ তাহাদের হয়, কিন্তু সারিয়া যায়; কিন্তু যাহারা খুব দুর্ব্বল ও অসুস্থ তাহাদের একবার পোকা ঢুকিলে আর নিস্তার নাই, তাহা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং রুগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পোকা যতক্ষণ শরীরের ভিতর প্রবেশ না করে, কেবল বাহিরে বাহিরে বিচরণ করে ততক্ষণ তাহাদের মারিয়া ফেলার উপায় খুব সহজ। রোগীর বিছানায় ও কাপড়ে চোপড়ে যে সব পোকা থাকে তাহা খুব কসকসে রৌদ্রে দিলেই মরিয়া যায়, কিম্বা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে একেবারে শুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা যখন একবার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলার চেষ্টা খুব কঠিন হয়। সং।

ক্ষুদ্র ও মহতে।

তোমায় আমায় হবে কখন মিলন ?
তুমি আছ দূরে কোন নিভৃত কন্দরে
যোগীজন চিত্ত বিমোহন।
কোথা কোন পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে
মানবের অগম্য ভবন।
কোন্ মহা সাগরের দূর পরপারে
সুবিজন সৈকত পুলিনে।
লোকচক্ষু অগোচরে কোথা আছ তুমি
সুনিবিড় গহন বিপিনে।
দূর দূরান্তরে ওই মহাশূন্য মাঝে
অগণিত তারকা সদনে।
বিরাট বিপুল বিশ্বে অণু পরমাণু
মিশে আছ প্রকৃতির সনে।
আমি ক্ষুদ্র কীটবৎ পড়ে আছি হেথা
জড়পিণ্ড অনন্ত নিখিলে।

আর তুমি রহিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
জড়ে জীবে পাষাণে সলিলে।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সাথে তুমি হে মহান্
ব্যাপ্ত আছ অনন্ত মিলনে।
দূর হ'তে দূর তুমি, হে নিকটতম,
মিশে আছ জীবনে জীবনে।

শ্রাবণ, ১৩২২। দানাপুর। } শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

এ সংসার মায়া নিকেতন।

আসক্ত হইয়া ভবে, থেকোনা থেকোনা তবে
কর সুধু কর্ত্তব্য পালন।
মাতা পুত্র পরিবার, ইচ্ছামতে বিধাতার
সবি সুধু মায়ার বন্ধন॥
যে জন সংসারে থাকি, আপনারে দূরে রাখি
পারে মায়া করিতে ছেদন;
হৃদয়ের অন্তরালে, মানসিক শক্তি বলে
জ্বালাইতে বৈরাগ্য ভীষণ॥
তারেই মানুষ বলি, দেয় সবে করতালি
তারি যশ গায় কবিগণ।
মধুকর সব ভুলি, সমগ্র শকতি ঢালি
মধুচক্র করিয়া রচন॥
বহু অন্বেষণ করি, নানা দিকে ঘুরি ফিরি
পদ্মমধু করে আহরণ।
না হইতে কাল পূর্ণ, মধুচক্র করি চূর্ণ
করে নরে সে মধু হরণ॥
এমনই ভবিতব্য, স্বহস্ত সঞ্চিত দ্রব্য
অন্যে আসি করে আস্বাদন।
মধু লোভে মত্ত হয়ে, পিপীলিকা যায় ধেয়ে
মধু-ভাণ্ডে হারায় জীবন॥

মানব সুখের আশে, বহু পরিশ্রম পাশে
বাঁধে ঘর করিয়া যতন।
প্রস্ফুট প্রসূন প্রায়, পুত্র কন্যাগুলি তায়
থাকে বৃক্ষে করিয়া বেষ্টন॥
সুখের আস্বাদ পেয়ে, যখন বিভোর হয়ে
করে নর জীবন যাপন।
মায়ার বন্ধনে হায়, সদা মুগ্ধ হয়ে রয়,
প্রবেশিয়া সহসা শমন
ছিন্ন করি মায়া ডোরে, অকালে শ্মশানে তারে
টানি লয়ে করায় চেতন।
আপন কষ্টের ধন, পুত্র কন্যা প্রিয় জন
পড়ে থাকে সকল বন্ধন॥
কিবা ধনী উচ্চ নীচু, পারে না রাখিতে কিছু
আসে যবে মৃত্যুর আহ্বান।
রাখিতে পারে না কেহ, পড়ে থাকে শূন্য দেহ
ছিন্ন-মূল তরুর মতন॥
সংসার অস্থায়ী বাসা, দুদিনের তরে আসা
এই শুধু করিয়া মনন।
থাকিয়া সংসার মাঝ, কর সদা নিত্য কাজ
অনাসক্ত ভাবে অনুক্ষণ॥
সংসার সাধন স্থান, হেথা শুধু অবস্থান
নবশক্তি করিতে অর্জ্জন।
আপন সুকৃতি-বলে, ভেদ করি মায়াজালে
কর সদা স্বর্গ অন্বেষণ॥
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেখ, বিশাল সমুদ্র এক
রহিয়াছে মাঝে ব্যবধান!
এপারেতে হাসি কান্না, বিরহ বিষাদ বন্যা
ওপারেতে অনন্ত মিলন॥
এপারে সাধন তরে, জীব আগমন করে
আবার ফিরিবে ঘরে পুনঃ।
হেথা দুদিনের মেলা; দুদিনের লীলা খেলা
দুদিনের উত্থান পতন॥

দুদিনের তরে আসা, স্নেহপ্রীতি ভালবাসা
দুই দিনে ফুরাবে স্বপন।
আয়ুর নাহিক স্থির, শুকাবে শৈবাল নীর
পরপারে অনন্ত জীবন॥
সাধন ভূমির পারে, সিদ্ধাসন স্থিতি করে
পারিজাত নন্দন কানন।
প্রীতির বিজলী খেলে, শান্তি মন্দাকিনী জলে
প্রফুল্লতা ভাসায় আনন॥
সেথায় গিয়েছে যিশু, গেছে ধ্রুব দেব-শিশু
বুদ্ধদেব লভিয়া নির্ব্বাণ।
পুষ্প মালা লয়ে করে, দাঁড়াইয়া থাকে দ্বারে
শান্তিময়ী দেববালাগণ॥

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

প্রার্থনা।

অনন্ত প্রেমে রচিয়াছ মোরে
তোমার ভুবন মাঝে
প্রিয়জন সাথে জীবনের পথে
রেখেছ তোমার কাজে
যে আরাধনার মধুর ছন্দ
দিকে দিকে তুলে এই আনন্দ
সারা দিন মান শুনি সেই গান
ঝঙ্কারে হৃদি মাঝে
তব গড়া এই বীণার তন্ত্রী
মধুময় সদা বাজে
তোমার অপার করুণামাধুরী
অনুক্ষণ হৃদে রাজে
তোমার প্রভায় দীপ্ত এ প্রাণ ;
শুনি সুধামাখা তব আহ্বান
সারা অন্তরে আরতি শঙ্খ
তব বন্দনা বাজে।

শ্রীমতী কিরণপ্রভা দে।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে দেশের জাতির সঙ্গে জাতির প্রাচীনকালে যে সম্বন্ধ ছিল আধুনিক কালে সে সম্বন্ধ নাই। এখন এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; জাতির সঙ্গে জাতির মনের সূত্র, সুখের ও সুবিধার সূত্র জড়াইয়া গিয়াছে। এক জাতির দুঃখের দাহ অন্য জাতিকে একদিক না একদিক হইতে স্পর্শ করিবেই করিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে য়ুরোপীয় জাতিবর্গের মধ্যে. কিন্তু আমাদের দেশে সেই যুদ্ধের নিদারুণ বেদনা ও আঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। য়ুরোপের গোলাগুলি বারুদের ধোঁয়া আমাদের আকাশকে অন্ধকার এবং বায়ুকে দূষিত করিয়াছে—আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকগণকে নিষ্ঠুর ভাবে বিপন্ন করিয়াছে। যাহারা পাটের চাষ করিত, পাট বিদেশে চালান দিয়া অর্থাভাব দূর করিত, এবং সুখে বাস করিত, আজ তাহাদের পাট বিক্রয় হয় নাই; আজ তাহাদের অর্থ নাই। ত্রিপুরা জেলায় আজ দুর্ভিক্ষ। সেখানকার লোকে পাটের চাষ করিত বেশী, কাজেই অর্থাভাব সেখানে বেশী, অন্নাভাব সেখানে প্রবল। মাননীয় বিটসেন বেল মহোদয়ের মতে ২॥ কোটি টাকার পাট বিক্রয় না হওয়ায় ত্রিপুরাবাসীর ঘরে টাকা আসে নাই। কাজেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেখানে অর্থাভাব হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কেবল মাত্র একটি কারণ লইয়া এত বড় কাণ্ডের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। ত্রিপুরা জেলায় তিনবার বন্যা আসে, একবার বন্যা আসিয়া বর্দ্ধমানবাসীকে কি ভয়ানক কষ্ট দিয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। উপর্য্যুপরি তিনবার বন্যা আসিয়া ৩৬০ বর্গমাইল ভূমি আট ফিট জলের নীচে ডুবাইয়া দিয়াছে, এই জল এখনও যায় নাই। আউশ ধান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমনের আশা নাই। বীজ আর পাওয়া যায় না; তিনবার ধান 'রোয়া' হইয়াছিল, তিনবারই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অবস্থা আশাশূন্য অন্ধকার। আমাদের কর্ম্মীগণ যাঁহারা দুঃস্থ পরিবারদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের একখানি পত্রে আছে—যে দিকে চাহিয়া দেখি কেবল জল, যেখানে নয়ন মেলিলে ধানের শ্যামল শোভা দেখিতাম, সেখানে সে শোভা নাই, সে শস্য নাই, সে সজীব সবুজ রং নাই, তার পরিবর্ত্তে কেবল জল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে, দূরে গ্রামগুলি পরিত্যক্ত, লোক নাই, দ্বীপের মত মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। আর একটি পত্রে আছে—আমরা গ্রাম পরিদর্শন করিবার সময় নৌকায় ভয় পাইয়াছিলাম। এমন বড় বড় ঢেউ যে নৌকা ডুবিবার মত হইয়াছিল। মাঝিরা অনেক সময় নৌকা ছাড়িতে চায় না—এ দৃশ্য না দেখিলে বোঝা যায় না।" এইত গেল গ্রামের অবস্থা, দেশের দৃশ্য; এখন গ্রামবাসী দুঃস্থদের অবস্থা কিরূপ দেখুন।

বন্যা-পীড়িত লোকদিগকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়, (১) চাষী যাহারা চাষ করিয়া দিন চালাইত তাহাদের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুতরাং দিন চলে না। (২) যাহারা খাটিয়া খাইত তাহাদের খাটাইবার লোক নাই সুতরাং তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। (৩) যাহারা কারিগর কাঠের বা অন্যান্য কাজ করিত তাহাদের কাজ নাই। (৪) যাহারা মাগিয়া খায়—ভিখারী ও দরিদ্র বিধবাদের অবস্থা কি লিখিব? তাহা সহজেই অনুমেয়। মহাজন —যাঁহারা টাকা লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের টাকার সুদ শত করা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই সকল লোককে যাহারা বাঁচাইতে চাহেন তাঁহাদের অন্ততঃ এক বৎসর সাহায্য করিতে হইবে। এইত সবে দুঃখের দুর্গতির আরম্ভ। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক একেবারে বিপন্ন, না আছে আশ্রয়, না আছে অর্থ, না আছে অন্ন। এখন অনেক লোকই কেবল মাত্র 'দয়ার' উপর বাঁচিয়া আছে। পশ্চিম দেশীয় দুর্ভিক্ষ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে সেরূপ মনে করিবেন না, কারণ সে অবস্থা এখনও হয় নাই। চাউল কিছু বেশি মহার্ঘ নহে; 'রেঙ্গুণ চাউল' সহজেই পাওয়া যাইতেছে। অনেকের মতে 'ঋণদান সমিতি' বা এইরূপ কিছু করার প্রয়োজন। সরকার বাহাদুর হইতে সে বিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সাহায্য সমিতি—যে সকল সমিতি ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ায় কাজ করিতেছেন তাহাদের মধ্যে সকলেই টাকার প্রয়োজন কত বেশী তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ সমাজ মিশন এবং নারসিং ব্রাদার হুড সাহায্য দিতেছেন। নারসিং ব্রাদার হুড হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লধ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী শশিদলে গিয়াছেন। শশিদলে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নারসিং ব্রাদার হুড হইতে প্রায় ৪০টি গ্রামকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও কাজ বাড়ান হইবে। প্রায় দুই হাজার লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, মাসিক ২০০০৲ টাকা করিয়া খরচ হইবে। আমাদের কাজ বোধ হয় অনেক দিন চালাইতে হইবে। কারণ দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের শক্তি আছে তাঁহারা সাহায্য দান করুন, যাঁহাদের শক্তি নাই তাঁহারাও সাহায্য দানের জন্য দেশবাসীর মনে সৎ ইচ্ছার উদ্রেক করান। আশা করি মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় দুর্গতি দূর হইবে। দেশবাসীর নিকট—সকলকার নিকট আমরা সাহায্য চাই।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস
নারসিং ব্রাদারহুড।

ডাঃ ডি, এন, মল্লিক,
নারসিং ব্রাদার হুডের নামে টাকা পাঠাইবেন।
ঠিকানা—৮০।৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

য়ুরোপের ভীষণ যুদ্ধ সমান ভাবে চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের প্রায় ৪০ লক্ষ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এবং বহু লক্ষ অনাথ বালক বালিকা, বিধবা, বৃদ্ধ, অসহায় দুস্থ লোকের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কত দেশ মরুভূমি হইয়া পড়িতেছে, কত বংশ লোপ পাইতেছে, আরও কতরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে ; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার কোন লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। মধ্যে মধ্যে যে জর্ম্মনীর পক্ষ হইতে সন্ধিস্থাপনের কথা অন্য দেশের লোকের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জর্ম্মনী মিলিত দেশ সকলের দুই একটিকে পৃথক্ ভাবে আপনার আয়ত্ত করিয়া লইয়া অবশিষ্ট সকলের সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এরূপ সন্ধির প্রস্তাবে যে কোন দেশ সম্মত হইতেছেন না তাহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যুদ্ধের পশ্চিম ক্ষেত্রের অবস্থা বহুদিন হইল প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে। ফ্রান্স ও বেলজিয়মে জর্ম্মনী যাহা গ্রাস করিয়াছে তাহা অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জার্ম্মন বাদসাহের বড় সাধ কালে নামক ফ্রান্সের উপকূলে আসিয়া ইংলণ্ডে গোলাবর্ষণ করিবেন তাহা ঘটিতেছে না, কিন্তু পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে জর্ম্মনী অনেক অগ্রসর হইয়াছে। রুষিয়ার অধীন পোলণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সা অধিকার করিয়া আরও পূর্ব্বদিক অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু রুসিয়া যদিও ক্রমে ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে, তথাপি তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে যথেষ্ট বাধা দিতেছে। এমন কি মনে হয় জর্ম্মনী আর অধিক দূর পূর্ব্বে যাইতে সাহস পাইবে না। কারণ রিগা উপসাগরে রুসিয়ার রণতরীর সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জর্ম্মনীর অনেক রণতরী নষ্ট হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট রণতরীগুলি রিগা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার পর কি নূতন অবস্থা ঘটে কেহ বলিতে পারে না। এ দিকে ইটালী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্ট্রীয়া রাজ্যে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করা কঠিন, তথাপি মনে হয় শীঘ্রই ট্রীষ্ট নগর আক্রমণ করিবে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তুরস্ক ও ইটালীতে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের যুদ্ধেও পুনরায় ইটালীর সহিত তুরস্কের যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। এ দিকে তুরস্ক দার্দ্দানালিশ উপসাগরের যুদ্ধেও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। গালিপোলিতেও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ এতদিন উভয় পক্ষের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, কিন্তু জর্ম্মণগণ লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া কতকগুলি আমেরিকার প্রজার প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহার পর আরেবিক নামক জাহাজ ডুবাইয়া আরও কয়েক জনের মৃত্যু ঘটাইয়াছে—ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে।

জর্ম্মনী এখন নরম হইয়াছেন আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আর এরূপ ভাবে জাহাজ ডুবাইবে না।

জর্ম্মনী বহুদিন হইতে গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইয়া কত সৈন্য কত গোলা বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। ফলে এক একজন এক একরূপ আন্দাজ করিয়া কথা বলিয়াছে মাত্র। সম্প্রতি রয়টার অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছে যে পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে ১৮০০০০০ আঠার লক্ষ জর্ম্মন সৈন্য আছে, পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে ১৪০০০০ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার জর্ম্মন ১১২০০০০ এগার লক্ষ বিশ হাজার অষ্ট্রীয়ান সৈন্য মোট—বত্রিশ লক্ষ সৈন্য আছে। জর্ম্মনী আশি লক্ষ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ইহার মধ্যে কার্য্যতঃ পনের লক্ষ সৈন্য নষ্ট হইয়াছে, এখন যড় জোর ত্রিশ লক্ষ সৈন্য হাতে আছে। এই সকল লোক দ্বারা দুর্গ রক্ষা, দেশ রক্ষা করা হইতেছে, সরকারী কার্য্য চলিতেছে। জুলাই মাসে এইরূপ অবস্থা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অনেক সৈন্য নষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় পাঁচ লক্ষ মারা গিয়াছে। এই জন্য এখন দেখা যাইতেছে জর্ম্মনী আর সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারে না।

মহিলার পাঠিকাগণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সহিত সহানুভূতি করিয়া কিছু কিছু দান করিলে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবেন। যাঁহারা অর্থ দান করিতে সমর্থ তাঁহারা ৮০।৩ নং হ্যারিসন রোড ব্রাদার হুড্ আফিসে পাঠাইতে পারেন। যাহাদিগের দুর্ভিক্ষের কষ্ট উপস্থিত—তাহাদিগের জন্য নূতন বা পুরাতন ধুতি শাড়ী প্রভৃতি দান করিলে বিশেষ উপকার হয়। আমরা জানি অনেক গৃহিণী অতি যত্নে পুরাতন বস্ত্র সকল রাখিয়া থাকেন—তাঁহারা হয়ত জানেন না যে বিধাতা এই সকল দুঃস্থ নরনারীর সাহায্যের জন্য তাহাদের নিকট পুরাতন বস্ত্র সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ইহাতে কাহার ক্ষতি নাই, ব্যয় নাই, কিন্তু যাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাদের লাভ হয়, লজ্জা নিবারণ হয়। যদি কেহ "মহিলা" আফিসে পুরাতন বস্ত্রাদি প্রেরণ করেন, আমরা তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিব।

মহিলাতে আমরা ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা ছাপান হইত। নানা কারণে অনেক দিন বক্তৃতা প্রকাশ করা হয় নাই, সম্প্রতি ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মহিলাবিদ্যালয়ে যে সকল বক্তৃতা হয় তাহার মর্ম্ম বা সম্ভব হইলে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যাইবে। গ্রীষ্মের অবকাশের পর হইতে পূজার অবকাশ পর্য্যন্ত ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেন এম্, বি, রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস মনোবিজ্ঞান বিষয়ে সাপ্তাহিক বক্তৃতা দিতেছেন, তাহার বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩২২। [৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণমঙ্গলময় পরমেশ্বর, তোমাতে কোন দুঃখ নাই, অভাব নাই, অপূর্ণতা নাই—সেই তুমি আমাদিগের পিতা মাতা মঙ্গলবিধাতা; আমরা তোমারই মঙ্গল নিয়মে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করি এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই পরলোকে যাই। তোমার আদরের সন্তান নরনারী সংসারে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইবে—কষ্ট পাইয়াই জীবন শেষ করিবে, তাহা কখনও তোমার অভিপ্রায় হইতে পারে না। তুমি আমাদিগকে সুখী করিবে - প্রত্যেককে সুখী করিবে, প্রত্যেক পরিবারকে সুখী করিবে, ইহাই তোমার অভিপ্রায়, একথা তুমি আমাদিগের অন্তরের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছ; তাই নরনারী যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, চিরদিন সুখ অন্বেষণ করে এবং তোমার কৃপায় অবশ্যই একদিন দুঃখের নিবৃত্তি হইবে ও সুখলাভ হইবে সকলেই আশা করে। তোমার চরণে তাই ভিক্ষা করি যে, তুমি যদি আমাদিগকে সুখী করিবে, সুখী পরিবার করিবে, তাহা হইলে আমাদিগকে সুখী পরিবার কর। আমরা তোমার প্রেমপুণ্য সত্য স্থায়ের বিধি ভঙ্গ করিয়া দুঃখে পড়িয়া থাকি এই কথাই সত্য; তবে কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার বিধি সকল বলিয়া দেও, যেন তাহা পালন করিয়া তোমার কৃপার রাজ্যে আমরা প্রজা হইয়া সুখীপরিবাররূপে বাস করিতে পারি। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন নিত্যকাল পূর্ণ হইতেছে, পৃথিবীতেও তেমনি পূর্ণ হউক।

সুখী পরিবার।

মনুষ্যমাত্রেই সুখাকাঙ্ক্ষী। সুখ বলিতে কে কি বুঝে তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কেহ অপেক্ষাও করে না। ব্যক্তিগতভাবে যেমন প্রত্যেকে সুখী হইতে ইচ্ছা করে, তেমনি যখন পরিবার পরিজন হয় তখন সকলকে লইয়া সুখী হওয়া প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। যদিও প্রত্যেকেই সুখী হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যাহাদের পরিবার আছে, আত্মীয় প্রিয়জন আছে, তাহারা কেবল আপনার সুখে কখনও সুখী হইতে পারে না—প্রকৃতপক্ষে অন্য সকলের সুখের জন্য আপনি অসুখী হইয়াও সুখবোধ করে।

ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, পথের ভিখারী ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া সকলের নিকট আপনার দুঃখ কাতরস্বরে জানাইতেছে। তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিলে তৃপ্ত হইল—সুখ বোধ করিল—কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠিল—সে অন্ন প্রার্থনা করিল, অন্ন ব্যঞ্জন যত্ন করিয়া দিলে আহার করিয়া সুখী হইল—কিন্তু তখন তাহাকে শয়ন বিশ্রামের অভাব কাতর করিল—উত্তম শয্যা পাইয়া সুখে নিদ্রা গেল, পরে জাগ্রত হইয়াই বস্ত্রের অভাব তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল—বস্ত্র দান করা হইল, তখন যাহাতে প্রতিদিন সময়মত অন্ন জল শয্যা বস্ত্র ইত্যাদি লাভ হয় তাহা প্রয়োজন হইল। আপনার বিষয় নিশ্চিন্ত হইলেই আপনার প্রিয়জন কে কোথায় আছে তাহাদিগের জন্য প্রাণে ক্লেশ হইতে লাগিল—তাহারও ব্যবস্থা করা হইলে তাহার এসকল বিষয়ে উন্নতি সাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিল এবং চারিদিকের লোকের সুখভোগ দেখিয়া তাহার প্রাণেও সেইরূপ বা তাহা হইতে উচ্চদরের সুখের স্পৃহা তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। যে ব্যক্তি রাস্তায় ভিক্ষা করিতেছিল—সামান্য অন্নজল পাইলে কত সুখী হইত, তাহার ভিতরে এত অভাব লুকাইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে গৃহ ও অন্নবস্ত্রের অভাব এক ভিন্নজাতীয়। যখন শরীর রক্ষার ব্যবস্থাই নাই তখন সুখের কথা মানুষ চিন্তা করিতেই পারে না। উপস্থিত যে অভাবে পড়িয়া শারীরিক ক্লেশ হইতেছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে ব্যাকুল হয়। সকলেই অবস্থাচক্রে পড়িয়া এসকল অভাব অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাই যদি স্থায়ী অবস্থা হয়, তাহা হইলে মনের উচ্চতা রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একেবারে নিরন্ন ব্যক্তির কথা বা অতি উচ্চ অবস্থার ব্যক্তিগণের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না—আমরা সকলে যেমন একরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার বা সাধারণ গৃহস্থের অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, তাহার মধ্যে সুখী পরিবার কাহাকে বলা যায় তাহাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়। এরূপ অনেক পরিবার আছে যাহাতে অর্থের অভাব নাই, অনেক স্থানে অর্থের সহিত স্বাস্থ্যেরও অভাব নাই, কিন্তু তাই

বলিয়া তাহাকে সুখী পরিবার বলা যায় না—কারণ হয়ত সুনীতির অভাব আছে; পরিবারে শান্তি নাই—কাজেই সুখ নাই। আজকাল এরূপ ভাবের পরিবারও দেখা যায়, যাহাতে ধন আছে, বিদ্যা আছে, গৃহে অশান্তিও নাই; কিন্তু পরস্পরে প্রেম নাই, ভালবাসার বন্ধন নাই, তাহাকেও সুখী পরিবার বলা যায় না। আর এক প্রকার পরিবার আছে যাহার অভিভাবক যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন, আপনি নীতিমান, সকলের প্রতি প্রেমদৃষ্টি রক্ষা করেন, পরিবারে কোন পীড়া আসিলে, অশান্তির কারণ হইলে, কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আপনি তাহার যথাবিধি বিধান করিয়া সকলের রোগ অশান্তি প্রভৃতি দূর করিয়া দেন, সে পরিবারে যতগুলি লোক থাকেন সকলেই নীরব শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছেন দেখা যায়; কিন্তু একটুকু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গৃহকর্ত্তা যিনি তিনিই কেবল আপনার ইচ্ছামত জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার গৃহের অপর সকলেই একান্ত পরাধীন হইয়া কর্ত্তার ইচ্ছা পালনের কঠিন জীবন ধারণ করিতেছে। এরূপ শান্ত শিষ্ট পরিবার ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ, অশান্তিতে পূর্ণ থাকে; ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, উন্নতির চেষ্টা—জীবনের প্রকৃত সুখের বিষয় কিছুই ইহাতে থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি নীতিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইলেই সুখী পরিবার হইতে পারে, অন্যথা তাহার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, পরিবারের অভিভাবক নীতিমান ও ধর্ম্মাশ্রিত হইলেই যে সুখী পরিবার হইবে তাহা নয়—অনেক সময়ে দেখা যায় গৃহকর্ত্তা আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে, সাধন করিতে ব্যস্ত থাকেন ও তিনি আশা করেন যে তাঁহার গৃহে সকলে নীতিমান হইবে ও ধর্ম্মলাভ করিয়া প্রকৃত সুখ পাইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটে যে গৃহে থাকিয়াও তিনি পরিবারের সকলের অবস্থা জ্ঞাত হন না, তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার জীবনেই আবদ্ধ থাকে, অন্য সকলে অবসর পাইলেই নীতি ধর্ম্মের বিপরীত দিকে যাইতে থাকে। তিনি সময় সময় তাহা বুঝিতে পারিয়া আন্তরিক দুঃখ ভোগ করেন এবং গৃহে মহা অশান্তি উপস্থিত করেন। অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মসাধকগণের চরিত্রে একটা স্বার্থপরতা থাকে; অর্থাৎ তাঁহারা আপনাদিগের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যস্ত থাকেন, অন্যের বিষয় কতকটা উদাসীন থাকেন, অথচ অপর দিকে তাঁহাদের একটা অসহিষ্ণুতা জন্মে যাহা কোনরূপ দোষ দুর্ব্বলতাকে সহজে ক্ষমা করিতে পারে না; এই সকল কারণে ধার্ম্মিকের পরিবারের সকল ব্যক্তি ধর্ম্মপথে যাইতে বা সুখী পরিবার হইতে পারে না। শেষকালে দেখা যায় ধর্ম্মসাধক পরিবারের অপর সকলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া আপনি একাকী ভগবানকে পাইয়া সুখী হইতে যত্ন করিতে থাকেন। কাজে কাজেই ধর্ম্মসাধকের পরিবার সুখী পরিবার হইবে বলা যায় না। যাঁহারা উচ্চ জ্ঞানের জন্য জীবন সমর্পণ করেন বা অন্য কোন মহৎ কার্য্যে আপনার জীবন মন প্রাণ উৎসর্গ

করেন, তাঁহাদিগের পরিবার যে সুখী পরিবার হইবে তাহারও সম্ভাবনা অল্প। কারণ এরূপ অনেক দেখা যায়, যখন কোন মহাশয় ব্যক্তি প্রাণের ব্যাকুলতাতে মানুষের দুঃখ দূর করিতে অথবা সুখ বৃদ্ধি করিতে জীবন সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার আত্মীয় পরিবারগণ তাঁহার কার্য্যকে উচ্চ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং সমস্ত জগৎ যে কার্য্যের জন্য ধন্য ধন্য করে, হয়ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ তাহাকে দায়িত্ব-জ্ঞান-বিহীন উন্মাদের কার্য্য মনে করে।

ফলে কোন পরিবারকে ঠিক সুখী পরিবার বলা ইহা যেন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যত পরিবারের বিষয় সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারিয়াছে তাহার মধ্যে আমার মনে হয় জেনেরেল উইলিয়ম্ বুথের পরিবার একটা সুখী পরিবার। আদর্শ সুখী পরিবার কি তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে, তবে এই পরিবারের বিষয় যাহা যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া সুখী পরিবারের ভাবটা একটু পরিস্ফুট হইতে পারে। উইলিয়ম্ বুথ প্রথম জীবন হইতেই দীন দুঃখীকে ধর্ম্মাশ্রয় দান করিয়া সুখ শান্তির পথে আনিতে যত্নবান ছিলেন। এই প্রবল ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি যদি সাধারণ নারীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সংসারে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিত। তিনি নিজে হয়ত ধর্ম্মলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরিবারকে সুখী করিতে পারিতেন না; বস্তুত তাঁহার স্ত্রী ক্যাথেরাইন তাঁহার সহিত ঠিক এক ভাবাপন্ন বলিয়াই তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য দীর্ঘ জীবনে অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও স্বামী স্ত্রীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া অসুখ অশান্তি উপস্থিত করিতে পারে নাই। ক্রমে তাঁহাদিগের গৃহে যখন বালক বালিকা আসিতে লাগিল তাঁহারা তাহাদিগের উন্নতির বাধা দেন নাই, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাব লইয়া উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। পিতা মাতার সহিত মতের ভিন্নতা উপস্থিত হইল না তাহাও নহে, কিন্তু তাঁহারা ইহাদিগের অন্তরে যে সুখের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন সে বীজ সকল জীবনেই অঙ্কুরিত হইল, সকলের জীবনেই তাহা শাখা পত্র ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়া সকলকে সুশোভিত করিতে লাগিল।

এই পরিবারে যাঁহারা জামাতা বা বধূ হইয়া আসিলেন, তাঁহারাও আপনাদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পরিবারের মূল মন্ত্র যাহা তাহা গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের পরিবারের মূল ধর্ম্ম, অবশ্য সকলেই জানেন, সুরাপান দুর্নীতি প্রভৃতিতে পড়িয়া যাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, যাহারা নরকে বাস করিতেছে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া সুখী পরিবারদলে আনয়ন করা ও স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। এই এক ধর্ম্মসাধন বিষয়ে প্রত্যেকের বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাশক্তি প্রত্যেকেই ইহাতে জীবন সমর্পণ করিলেন, যত লোক তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবের ভিতরে পড়িল তাহাদিগকেও এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনার করিয়া

লইলেন। বুথ পরিবারটি অতি বৃহৎ, ইহাতে ব্যক্তিগত ভিন্নতা ছিল, অভাব রোগ শোক সকলই সময় সময় ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু এই বৃহৎ পরিবার একটি সুখী পরিবার। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে হয়ত মুক্তিফৌজের জেনারেল বুথ ও তাঁহার স্ত্রীর নাম মাত্র শুনিয়াছেন; তাঁহাদের দলের প্রচারক প্রচারিকাগণ এ দেশে আসিয়া এ দেশের পোষাক, এ দেশের নাম, এ দেশের ভাষা ও এ দেশের ভাব আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন, এই কথাও হয়ত সকলে জানেন। কিন্তু ইহা হয়ত সকলে জানেন না যে স্বাধীন ভাবে যথাশক্তি কার্য্য করিয়া পতিতকে উদ্ধার করিবার স্বর্গীয় অধিকার প্রত্যেক কর্ম্মচারী বা প্রচারক প্রচারিকার আছে, সাক্ষাৎ সুখ শান্তি লাভ করিবার উপায় আছে; এ জন্য যিনি যে ক্ষেত্রে কার্য্য করেন তিনিই সুখী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সংসারে মানুষের যে সকল পরীক্ষা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে সে সমস্তই ইঁহাদিগের জীবনে ও পরিবারে ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাঁদের কথা যত জানা যায় দেখা যায় যে ইহাঁরা প্রত্যেকে সুখী। যাঁহারা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ও পরিবারকে সুখী পরিবার করিতে আন্তরিক যত্ন করেন তাঁহারা এই বুথ পরিবারের বিষয় আলোচনা করিলে আপনাদিগের অভীষ্ট লাভের পথ অনেকটা ধরিতে পারিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেকেই আপনার পরিবারকে সুখী করিতে ব্যাকুল ও যত্নশীল, যাঁহারা পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করেন তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া আপনার সুখে সুখী হইতে পারেন না, সকলকে সুখী করিতে যত্ন করেন। ইহারই জন্য অশেষ পরিশ্রম, ইহারই জন্য বিদেশে প্রবাস, ইহারই জন্য অপমান সহ্য করেন, ইহারই জন্য জীবনধারণ করেন, অথচ যখন তখন দেখিতে পান যে পরিবার সুখী পরিবার নহে। প্রকৃত পক্ষে সংসারে বাস করিতে হইলে এখানে যে সকল সামগ্রী যথাযথরূপে প্রয়োজন, সে সকলই অর্জ্জন করিতে হইবে। পরিবার মধ্যে স্নেহ প্রীতি প্রচুর পরিমাণে অবশ্যই প্রয়োজন, সুনীতি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম একান্ত প্রয়োজন, এ সমস্তই প্রয়োজন; কিন্তু এ সকল হইতে অধিক প্রয়োজন প্রতি জনের অন্তরে জগতের মঙ্গল সাধনের সত্য প্রতিজ্ঞা ও সেই মন্ত্র সাধনে আত্মব্যয়। যে পরিবারে এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী।

যে সকল গৃহস্থ সপরিবার সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন পরিবারের প্রত্যেককে জ্ঞান, ধন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিতে ব্যস্ত থাকিবেন, এবং আপনার আদর্শ ও শক্তি অনুসারে সকলের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিবেন, ঠিক সেইরূপ পরিবারের প্রত্যেকের অন্তরে একটা এমনতর উচ্চ ব্রত বা আকাঙ্ক্ষা উপ্ত করিয়া দিবেন—যাহা সময়ে অঙ্কুরিত ও উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পত্রে পুষ্পে ফলে ফুলে সুশোভিত হইবে এবং তাহাকে ও পরিবারকে সুখী করিবে। যিনি যে প্রকৃত সুখের আস্বাদন পাইয়াছেন, সেই

সারধনটি সকল প্রিয়জনকে দিতে যথোচিত ব্যবস্থা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রমণীর দায়িত্ব ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

সমুদায় জগতে দুই শক্তি নিয়ত কার্য্য করিতেছে—প্রকৃতি ও পুরুষ। এই দুই শক্তির মিলনেই জগতের স্থিতি ও উন্নতি। এই প্রকৃতি শক্তিই নারীশক্তি। নারীশক্তি জাগ্রত না হইলে জগতের উন্নতি সম্ভবপর নহে। তাই কেবল পুরুষেরা উঠিলে, পুরুষেরা শিক্ষিত হইলেই চলিবে না, রমণীকেও সঙ্গে সঙ্গে জাগিতে হইবে; রমণীর শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নারীর আদর্শ অতি উচ্চ। নারী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী। নারীর হস্তে গৃহের সকল ভার। আবার নারীকেই আমাদের প্রাচীন আর্য্যগণ সরস্বতী বললেন। ভারতনারীর জীবনে এই লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন চাই। তিনি গৃহের লক্ষ্মী হইয়া গৃহকে শ্রী, শোভা, সম্পদে বিভূষিত করিবেন, আবার তিনিই পরিবারের সকলকে সুপরামর্শ দানে সুপথে চালিত করিবেন। পরিবারের সকল কার্য্যে গৃহিণীর পরামর্শ প্রয়োজন। এইরূপ এক একটী পরিবার লইয়া সমাজ রচিত, কতকগুলি সমাজ লইয়া দেশ, আবার সমুদায় দেশ লইয়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে। আর তাহার কর্ত্রী কে?—রমণী। তাই এই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ভগবান্‌কে ভক্ত স্ত্রীরূপে শক্তিরূপে, ভগবতীরূপে দেখিলেন—তাই ভক্ত 'মা' বলিতে উন্মত্ত। আর্য্যগণ রমণীর মাহাত্ম্য বুঝিলেন, তাই তাঁরা দেবীপূজা, দুর্গাপূজা হিন্দুর প্রধান পূজা বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। নারীর আদর্শ যে কত বড় তা তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন।

এই নারীজন্ম লাভ করে যদি আমরা তাহার গৌরব ভুলিয়া যাই, রমণীর উচ্চ অধিকার হ'তে বঞ্চিত হই, তবে আমাদের জন্ম বৃথা হইবে। এই ভারতের পূর্ব্বের অবস্থা যদি আমরা স্মরণ করিয়া দেখি, ভারতনারী কি চিরদিন এইরূপ ঘৃণিতা, পদদলিতা ছিলেন? ঐ যে খনা, লীলাবতী, গার্গী প্রভৃতি স্বনামধন্যা ভারতললনাগণ—তাঁহারা বিদ্যায় দেশের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত স্ত্রীচরিত্র সকল পাঠ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা শিক্ষিতা নামের যোগ্যা ছিলেন। মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে তখনকার দিনে পুরুষদিগের ন্যায় নারীগণকেও শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

তার পর আমাদের দেশের ইতিহাসের মাঝখানে নানা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মুসলমান রাজত্বকালে স্ত্রীলোকগণের প্রতি অত্যাচারের ভয়ে অবরোধ প্রথা প্রচলিত,

হইল। তাহারই ফলে ক্রমে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা রহিত হইয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। তাই আমাদের দেশ আবার জ্ঞানগরিমার উচ্চস্থান লাভ করিতেছে। আশা হয় এমন দিন আসিবে যেদিন ভারতের লুপ্ত অধিকার আবার ভারতনারী ফিরিয়া পাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা করিয়া আজকাল দেশে বহু আন্দোলন উপস্থিত। শিক্ষা অর্থ এই নয় যে কয়েকখানি বই পড়িতে জানা কিম্বা দুই ছত্র লিখিতে শেখা। যদিও দুঃখের বিষয় এই সামান্য শিক্ষা হইতেও আজি কত শত শত ভারতনারী বঞ্চিতা। এখনও কত গ্রামে গ্রামে এমন কি কত উন্নতিপ্রাপ্ত সহরে পর্য্যন্ত অনেক স্ত্রীলোক একখানি চিঠি লিখাইবার জন্য কিম্বা পড়াইবার জন্য অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য। যেখানে সমাজের এই অবস্থা, সেখানে উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষার স্থান কোথায়? অনেকে বলিতেছেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে রমণীপ্রকৃতি কঠোর হইয়া পড়ে। পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চশিক্ষা কোমলপ্রকৃতি নারীগণের উপযোগী নয়। ইহাতে রমণীহৃদয় উদ্ধত ও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, উচ্চশিক্ষা নারীগণের বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি স্ত্রীলোকদিগকে নীতি এবং ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তবে কখনই তাঁহাদের প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। উচ্চভাবপূর্ণ কবিতাসকল পাঠ করিলে স্ত্রীলোকের সঙ্কীর্ণ হৃদয় উদার ও প্রশস্ত হয়। মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত; ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় এবং চরিত্র পবিত্রতা লাভ করে।

শিক্ষা অর্থ কি? সমুদায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশ সাধন। স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রেমে, পুণ্যে চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। এই শিক্ষা পুরুষের যেমন প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরও তেমনি—বরং তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। যে নারীর হাতে ভগবান্ সন্তানের জীবন গঠনের ভার দিলেন, তিনি যদি অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া থাকেন, তবে কেমন করিয়া সন্তান বড় হইবে, কিরূপে দেশের, দশের উপকার করিতে শিখিবে. কিরূপে জগতের কল্যাণ সাধন করিবে। তাই নারীর শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। কুসংস্কাররূপ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কত মাতা আজও সন্তানকে অজ্ঞানতার পথে, অন্ধকারের পথে, পাপ প্রলোভনের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় স্ত্রীজাতির শিক্ষা। দেশের মাতৃগণ! তোমরা কি জান না, সমুদায় ভারত কি আকুল নয়নে তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে? দেশের উন্নতি অবনতির জন্য তোমরা প্রত্যেকে দায়ী। কেহ নিজেকে তুচ্ছ করিলে চলিবে না। কেবল পুরুষদিগের শিক্ষা হইলেই হইবে না, যাঁহারা আজ দেশের সুশিক্ষিত সন্তান, তাঁহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিতে হইবে। সন্তান বাল্যকালে মার নিকট যে শিক্ষা পায়, সে শিক্ষা আজন্ম থাকে। মাকে সন্তান যেমন

ভালবাসে, ভক্তি করে, তাঁর শিক্ষা যেমন তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তেমন আর কাহারও শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর নহে। মা যদি সুশিক্ষিতা হন, সুশিক্ষার সুন্দর বীজ প্রথম হইতে শিশুর কোমল হৃদয়ে উপ্ত হইবে এবং পরে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া জগতকে ফুলে ফলে সুশোভিত করিবে।

মাতা অশিক্ষিতা হইলে ঠিক্ তাহার বিপরীত ফল ফলিবে। মাতার নিকটে বাল্যকালে কুসংস্কারপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে তাহা উন্মূলিত করা অতীব কঠিন। তা ছাড়া, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন বালক গুরুর নিকট অথবা ভাল ভাল পুস্তক হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার সহিত মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার বিরোধ দেখিতে পায়, তখন তাহার মন কি সংশয়ে পূর্ণ হয় না? কাহাকে সে বিশ্বাস করিবে? এইরূপে ক্রমে মাতার প্রতি অবিশ্বাস ও অসম্মানের ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে। তাই বলি স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন।

আজকাল কোন কোন স্থানে এরূপ দাঁড়াইতেছে যে, পুরুষেরা যেমন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য হন, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষারও যেন তেমনি মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। কখন্ কাহার কি অবস্থা হইবে কে জানে, একটু লেখাপড়া শিখে রাখা ভাল, পরে চাকরী করিতে পারিবে এই ভাবিয়া কেহ কেহ স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দান করিতে চান। আবার কেহ কেহ কিরূপে ভাল চাকরী পাইতে পারিবে ইহারই উপযোগী করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিতা করিতে প্রয়াসী হয়েন কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ ভাব কোন বালিকা অথবা নারীর হৃদয়ে কোন ক্রমেই অঙ্কুরিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই আদর্শে শিক্ষা লাভ করিলেই স্ত্রীলোকের হৃদয় পুরুষের ন্যায় হইয়া যাইতে পারে। নারীজীবনের যাহা প্রকৃত আদর্শ—আত্মদান, নিঃস্বার্থ প্রেম—তাহা যে পরম যত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

হিন্দুবালিকা শৈশব হইতে শেখে তার জীবন তার নিজের জন্য নয়, কিন্তু অন্যের জন্য। কেমন করিয়া সে পরের ঘরকে আপনার করিতে পারিবে, কেমন করিয়া সে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলকে সুখী করিতে পারিবে এই তার জীবনের লক্ষ্য হয়। আর বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেও কি এই লক্ষ্যই বালিকাজীবনে উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শে পরিণত হওয়া উচিত নয়?

জ্ঞানলাভের লক্ষ্য কি? আরো ভাল করিয়া নিজেকে দান করিবার জন্য। আরো ভাল করে অন্যের সেবা করিবার জন্য। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থলাভ নয়, কিন্তু অন্যকে ভাল করিয়া শিখাইতে পারিব বলিয়া। নিজে যাহা লাভ করিলাম তাহা দ্বারা আর একটী জীবন গঠিত করিতে হইবে, আর একটী প্রাণে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দিতে হইবে, আর একটী প্রাণকে জগতের সেবার জন্য প্রস্তুত

করিয়া দিতে হইবে, আর একটী হৃদয়কে ভগবানের দিকে উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার এই চরম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষিতাই হও আর অশিক্ষিতাই হও, স্ত্রীজীবনের প্রধান কার্য্য আত্মদান। এই আত্মদান নানারূপে হইতে পারে।

কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, বধূরূপে, সহধর্ম্মিণীরূপে, জননীরূপে, শিক্ষয়িত্রীরূপে, সেবিকারূপে স্ত্রীলোকের কত কর্ত্তব্য। এই সকল জীবনেরই একমাত্র মন্ত্র নিঃস্বার্থ আত্মদান। এই সকল কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলার সহিত পালন করিতে হইলে শিক্ষা চাই, মানসিক স্ফূর্ত্তি চাই, নীতি, প্রেম ও পুণ্যে বিভূষিতা হওয়া চাই। এইরূপ সুশিক্ষিতা কন্যার কার্য্যে, ব্যবহারে ও সেবায় পিতামাতা কত সুখী, গৃহ কেমন সুশোভিত ও আনন্দনিকেতন হয়। ভগিনীর স্নেহপূর্ণ শিক্ষা ভ্রাতার হৃদয়ে যেমন গভীর স্থান অধিকার করে, তেমন আর কিছু করিতে পারে কি না সন্দেহ। বধূর বিনীত নম্র ব্যবহার, সকলকে সেবা করিবার ইচ্ছা, দাসদাসীগণকে পরিচালন করিবার শক্তি, পরগৃহকে নিজগৃহে পরিণত করিবার ক্ষমতা কি সুশিক্ষাব্যতীত হইতে পারে? আর যখন স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী, যখন তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কত উচ্চ, কত গভীর। তিনি স্বামীর কর্ম্মে সহায়, বিপদে বন্ধু, অসুবিধায় পরামর্শদাতা, পাপপথে রক্ষাকর্ত্রী, সৎকার্য্যে উৎসাহদায়িনী, জীবনে মরণে নিত্য সঙ্গিনী। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীও সুশিক্ষিতা না হইলে কি পূর্ণ মিলন সম্ভব হয়? শিক্ষিতা না হইলেও স্ত্রী পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, সেবিকা, পতিব্রতা হইতে পারেন; কিন্তু শুধু তাই হইলেই তো চলিবে না। স্বামীর ভাবের সহিত ভাব মিলাইতে হইবে, সকল সুখ দুঃখের অংশী হইতে হইবে, জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে পুণ্যে স্বামীর সহিত এক সঙ্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা। তার পর স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, যখন তিনি জননী। জীবন গঠন করা, আর একটী আত্মাকে ভগবানের প্রদর্শিত পথে আনিয়া দেওয়া ইহা অপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব মানবজীবনে আর কি আছে? এইখানে তিনি সৃষ্টিকারিণী দেবী ভগবতীর অংশ। চরিত্রবতী, নীতিপরায়ণা, সুশিক্ষিতা মাতার আদর্শ সন্তানের জীবনে থাকিবেই। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। সন্তানের জীবনে মাতার প্রভাব যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের দেশ চিরদিন মাতৃভক্ত। দেশে বিদেশে বিপদে সম্পদে মার শিক্ষা, মার আদেশ পালন করিবার জন্য সে প্রাণপণ করিতে পারে। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে, মার দায়িত্ব কত কঠিন।

তার পর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য। আজকাল অনেক রমণী শিক্ষাদানকার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা এ কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান জীবনের একটী ব্রত বলিয়া

গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহারা আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হইতে পারিবেন না। গৃহে একটী, দুইটী, চারিটী সন্তানের ভার রমণীর হাতে থাকে, এখানে কতগুলি সন্তানের ভার ভগবান্ তাঁহার হাতে দিলেন। পরের মেয়েদের আপনার করিতে হইবে, তাহাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। শাসনের কঠোরতাকে প্রেমদানে মধুর করিতে হইবে। এ কি কম দায়িত্ব? আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে কয় জন? যাঁহারা তাহা হইবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইহাতে কত আত্মদান, কত স্বার্থবিসর্জ্জন, কত কঠিন আত্মসংযমের প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কাজ করিতেছ? তাহা তো নয়। তুমি যা শিখিলে, এতদিন যাহা লাভ করিলে, তাহা অন্যকে দান করিবার এ যে ভগবানের প্রদত্ত শুভ সুযোগ। এ সুযোগ অবহেলা করিও না। এতগুলি মানবহৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারিবে, ইহা কত সৌভাগ্যের কথা। এতগুলি সন্তানের শিক্ষার ভার তোমার হাতে, তোমাকে প্রতি পদবিক্ষেপে অনেক সাবধানতা, অনেক আত্মশাসন অভ্যাস করিতে হইবে। এতগুলি আত্মা যে জানিয়া বা না জানিয়া তোমারই চরিত্র অনুকরণ করিতেছে—যদি তাহাদিগের চরিত্র সুন্দর না হয় তুমি কি ভগবানের কাছে দায়ী নও? সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীগণের ব্যবহার যাহাতে সুমিষ্ট হয়, কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়, সত্যের প্রতি যাহাতে মর্য্যাদা বাড়ে এবং চরিত্র যাহাতে পবিত্রতা লাভ করে, এইরূপ করিতে হইবে। তাই শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব বড় কঠিন। যিনি এই ব্রত গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে অতি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অনেক আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নারীমাত্রেই সেবিকা হইবেন। সেবাই নারীজীবনের প্রধান কার্য্য; যেখানে যে অবস্থায়ই তিনি থাকুন না, সেবা ভিন্ন তাঁহার জীবন কখনও মধুময় হইবে না। আত্মদানেরই অন্য নাম সেবা। তবে এই সেবা গৃহে, পরিবারে বদ্ধ থাকিতে পারে, আবার সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। যিনি বিশেষ ভাবে সেবিকা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ, সংসার, আত্মীয়, পরিজন, সকলই ভুলিয়া জগতের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করেন, পরের দুঃখে, অন্যের রোগে, শোকে যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তিনি সমুদায় বিশ্বের পূজার্হা। যাঁহার শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে, যাঁহার সহিষ্ণুতা সকলের অনুকরণীয়, যাঁহার চরিত্রের বল প্রচুর, তিনিই কেবল এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন, অন্যে নহে। নারী যখন কোমল হস্তে আহত সৈনিকের ক্ষতস্থান ধৌত করিতেছেন, মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে পরলোকের সুসংবাদ বলিতেছেন, শোকার্ত্তের নিকট তাহার জন্য স্বর্গের শান্তি ভিক্ষা করিতেছেন, পাপীর অনুতাপাশ্রুর সহিত নিজের অশ্রু মিলাইতেছেন, দুঃখিনী বিধবার চোখের জল মুছাইয়া দিতেছেন, দুর্ভিক্ষে অনাহারপ্রপীড়িত শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন, মাতৃহীন দরিদ্র বালককে সস্নেহে

ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, তখন তাঁহার মুখ কত সুন্দর, তখনকার দৃশ্য কি মধুর, কি পবিত্র, কি স্বর্গীয়!

এইরূপে যদি সত্যই আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারি রমণীর কাজ কত। আমরা ইচ্ছা করিলে, আমরা ভাল হইলে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে পারি। এই যে কত সন্তান পাপের পথে, প্রলোভনের পথে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? রমণী। এই যে কত মানব চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া জীবন বৃথা অপচয় করিতেছে তাহার জন্যও দায়ী রমণী। আর এই যে আজ পৃথিবীতে কি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কি পাশবিক অত্যাচারে দেশ কম্পিত, কি ভয়ানক শোনিতপাত, এই ভয়ঙ্কর পাপের জন্যও পরোক্ষ ভাবে কি রমণীই দায়ী নহেন? জননীর শিক্ষা এমন হইবে যে তাঁহার সন্তান কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারিবে না। বীরভাব জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাকে সন্তানের কোমল হৃদয়ে নীতি ধর্ম্ম, কোমলতা ও সহৃদয়তার বীজ বপন করিতে হইবে।

তাই বলিতেছি রমণী যদি যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, জগতে প্রত্যেক নারী যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হন, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রেমে পুণ্যে বিভূষিতা হইয়া নিজ নিজ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন, আজ জগতের কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তাহ'লে আর পাপ থাকে না, অজ্ঞানতার অন্ধকার থাকে না, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ থাকে না। শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ জগতে চিরবিরাজিত হয়, পৃথিবী স্বর্গের নিকটস্থ হইতে পারে।

আশা করিতে ইচ্ছা হয় সেই দিন ক্রমে আসিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, আরো হউক। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেন অহঙ্কার, অভিমান, কুটিলতা, স্বার্থপরতা আসিয়া নারীহৃদয়কে অধিকার না করে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা লাভ করিয়া যেন আমরা সমাজের হিতে, পরের জন্য, জগতের সেবায় আত্মদান করিয়া ধন্য হইতে পারি।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সে দিন জন ছোট ছেলের মত নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইল ও পরদিন সকালে কাপড় পরিয়া নীচে নামিয়া আসিল। জেল তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল।

বাবা তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে তুমি সেরে উঠ্‌ছো দেখিতেছি! আশা করি, শীঘ্রই মানুষের মত হইয়া দাঁড়াইবে।"

"আশা করি, আমি আগের চেয়ে ভাল হইতে পারিব।"

"ভালই হও কি মন্দই হও—সে যাই হোক—আমাদের কিন্তু তোমা বিনা চলিবে না—ফিনিয়স, আমার চশমা নিয়া কে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছে?"

বৃদ্ধ লোকটী আমাদের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া কাগজ উল্টা ভাবে ধরিয়া খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অনেক দিন পরে আমরা খুব আমোদ করিয়া আহারে বসিলাম। সেদিন বাবাকে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে দেখিয়া কত আনন্দ হইল -বাবার মুখে নিশ্চিন্ততার ভাব যে কত দিন দেখি নাই। জন সামনে সোফায় শুইয়াছিল, আমি তাহার কাছে পড়িতেছিলাম, কিন্তু মনে হইতে লাগিল সে যেন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে। এই সময় জেল আসিয়া খবর দিল—

"জনের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক দেখা করিতে চাহে।"

জন চমকাইয়া লাল হইয়া উঠিল। যেন পৃথিবীতে এক নারী ছাড়া অন্য নারী নাই। অল্পক্ষণ পরেই মিসেস্ জেসপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "আহা বাছা, তোমার কি ভয়ানক অসুখই হইয়াছে! আমি কিন্তু আসিতে পারি নাই—বৃদ্ধ বলিয়া এ অপরাধ ক্ষমা কর। বসিতে হবে না, শুইয়া পড়। আমাকে ও ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয় নি কেন? কতদিন অসুখ হইয়াছে?"

"আমি এখন খুব ভাল আছি। কাল হইতেই দেখিবেন উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব, জন আমার সাক্ষী রহিল।"

"কিন্তু বাছা, তোমায় খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।"

"সাবধানে থাকিবে বই কি। যদি নিজে সাবধান না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাঁহাদের কাছে উহাঁর জীবন খুব মূল্যবান্, তাঁহারা ইঁহার শরীর রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হইবেন।"

আমি যেন একটু রূঢ়তার সহিত বলিলাম, কিন্তু তিনি তাঁহার কোমল প্রকৃতিতে সহজেই আমাকে বুঝিতে পারিলেন এবং ক্ষমা করিলেন।

"আমি তাহা বিশ্বাস করি, মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্সও বোধ হয় জানেন, আমরা সকলে তাঁহাকে কিরূপ মান্য করিয়া থাকি।"

মায়ের মত তিনি জনের হাত তুলিয়া ধরিলেন—"জন শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ওঠ। কাল আমার স্বামী তোমায় দেখিতে আসিবেন—আর আমার স্নেহের বাছা উরসুলা তোমাকে এই চিঠিটুকু পাঠাইয়াছে।"

"তাঁর বড় দয়া।" জনের ভাষা আর ফুটিল না, বদ্ধ চিঠিখানি হাতের মুঠোর ভিতর ছিল, তাহার হাত কাঁপিতেছিল।

"হাঁ সে চিরকালই কৃতজ্ঞ। যাঁহারা দুঃখ বিপদে এত করিয়াছেন তাঁহাদের ভুলিয়া যাইবে আমার বাছা!"

বৃদ্ধার চোখ হইতে দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। "মিষ্টার হ্যালিফাক্স আপনি কি চিঠি পড়িয়াছেন? আপনার নিকট হইতে উত্তর নিয়া যাবার ভার সে আমার উপর দিয়াছে, তাহাকে কি বলিব?"

সমস্ত পৃথিবীর লোকই এ কয়েক লাইন পড়িতে পারে :—

"প্রিয় বন্ধু,

আমি কাল শুনিলাম আপনার অসুখ হইয়াছে। আপনি যে আমার পীড়িত পিতার কত সেবা করিয়াছিলেন, তাহা আমি এখনও ভুলি নাই। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে একবার গিয়া আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। ইতি

উরসুলা মার্চ্চ।"

চিঠিতে আর কিছুই ছিল না। ত্রিশ বৎসর পরেও হ্যালিফাক্সের পকেটবুকের ভিতর দেখিলাম সেইটুকু নকল করা রহিয়াছে, কালী ফিকে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে কত যত্ন করিয়া বইটী রাখিয়াছে।

"আমার বাছাকে কি বলিব?"

"বলিবেন—তাঁহাকে আসিতে বলিবেন।"

জন তাড়াতাড়ী তাহার চোখ সরাইয়া লইল, দেখিলাম দুই ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

মিসেস্ জেসপ চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম, জন চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল, এক একবার চোখ খুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইতেছিল, এক একবার সে চিঠিখানি হাত দিয়া দেখিয়া লইতেছিল।

এই সময় আমার পিতা দোকান হইতে গৃহে ফিরিলেন, জন তাঁহার কোনই সংবাদ লইল না। খানিক পরে দূর হইতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, জন নিজের মনেই বলিল, "আসিতেছেন", এবং সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কেহ কোন কথা বলিল না, কেবল উভয় উভয়ের হাত ধরিল।

জন নিজের মনের ভাব গোপন করিতে পারিল না, উরসুলার লজ্জাবনত চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম ইহার পরিণাম কি হইবে।

এই সময় জেল আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিল। বাবা ঘুমাইতেছিলেন জাগিয়া উঠিলেন এবং গৃহে একটী মেয়েকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন, জন উরসুলাকে বাবার কাছে লইয়া আসিল।

"মিষ্টার ফ্লেচার, ইনি মিস্ মার্চ্চ আমার বন্ধু, ইনি আমার অসুখ শুনে দয়া করে আমার মত গরিবের বাড়ী"—

জনের আর কথা ফুটিল না। মিস্ মার্চ্চ খুব নম্রতার সহিত বলিলেন—

"আমি একজন পিতৃমাতৃহীন বালিকা, ইনি আমার পীড়িত পিতার কত সেবা করিয়াছিলেন।"

বাবা চোখে চসমা দিয়া বালিকার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, মেয়েটিকে দেখিয়া তিনি যেন খুব সুখী হইলেন—যেন একটী আড়ম্বরহীন গম্ভীর সত্যের প্রতিমা।

"যদি তুমি জনের বন্ধু হও, তোমাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করি, এস এখানে বস।"

বাবা অতি আদর ও সম্ভ্রমের সহিত নিজের আরাম কেদারায় হাত ধরিয়া বসাই-লেন, বাবার এরকম ভাব আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। উরসুল্লা যে চেয়ারে বসিয়া কি ভাবে কাঁপিতেছিল তাহা আমি কখনও ভুলিব না। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া শেষে বলিলেন—

"তুমি আমাদের সঙ্গে একটু চা খাবে না?"

কিছুক্ষণ পরে আমাদের খাবার ঘরে একটী সুন্দর নূতন দৃশ্য দেখা গেল, উরসুল্লা টেবিলে বসিয়া চা দিতেছিল, বাবা দুএকবার চমকাইয়া উঠিলেন, তিনি যেন কতদিনের পুরাণ কথা ভাবিতেছিলেন।

কিন্তু মিসেস্ জেসপ কথাবার্ত্তাতে তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিলেন। ডাক্তারও কিছুক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিন বৃদ্ধ বৃদ্ধাতে খুব গল্প আরম্ভ করি-লেন আমাদের একরকম একলা ছাড়িয়া দিলেন।

মিস্ মার্চ্চ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মিসেস্ জেসপ যে ফুল আনিয়াছিলেন তাহাই সাজাইতেছিলেন, জন এক দৃষ্টিতে উরসুল্লা এবং ফুলগুলিকে দেখিতেছিল। আমি যে কোথায় গিয়াছিলাম তাহা কেহই দেখে নাই।

"বা কি সুন্দর!" ফুল সাজান শেষ হইতে না হইতেই এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল।

"ভারি সুন্দর! অন্ধকার হয়ে আসছে বলে ফুলের রং বোঝা যাইতেছে না, কিন্তু গন্ধে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে।"

"টেবিলটা কি আপনার কাছে সরিয়ে দেব?"

"না থাক—আমি নিজেই করিতেছি—আপনি বসুন।"

উরসুল্লা কোন কথা না বলিয়া নীরবে জনের পাশে বসিল। দুজনের উপরই চাঁদের আলো পড়িতেছিল।

খানিক পরে মিস্ মার্চ্চ বলিলেন, "আজ নূতন চাঁদ উঠিয়াছে।"

"তাই নাকি? তাহা হইলে আমার একমাস হইল অসুখ করিয়াছে।"

"আশা করি আপনি শীঘ্রই উঠিয়া বেড়াইতে পারিবেন। নরটনবারী কি সুন্দর জায়গা।"

"আপনি কি এখান হইতে শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন ?"

"না—আমি আমার ভবিষ্যৎ তো জানি না। তবে আমার আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না বলায়, আমার ইচ্ছা আমি মিসেস্ জেসপের কাছে থাকিব।"

"খুব স্বাভাবিক।"

"আশা করি, আপনি খুব শীঘ্র সবল হইয়া উঠিবেন।"

"ধন্যবাদ। আশা করি আপনার প্রার্থনা সফল হইবে। ভগবান জানেন আমার বলের কত প্রয়োজন !"

"যাহা আপনার প্রয়োজন তাহা নিশ্চয়ই দেওয়া হইবে, নিরাশ হইবেন না।"

"আমি ভীত নই। আমি মানুষের মত সংগ্রাম করিব। পৃথিবীতে সকলকেই সংগ্রাম করিতে হয়।"

"আমিও ইহা বিশ্বাস করি।"

"একটু বল পাইলেই আমার ইচ্ছা নরটনবারী ছাড়িয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যাই।"

"কোথায় ?"

"আমেরিকাতে। যুবক—যাহার কাছে টাকা কড়ি, কিম্বা আত্মীয় স্বজনের বল নেই, যাহাকে নিজের হাতের বলে দাঁড়াইতে হইবে—তাহার আমেরিকার মত দেশে যাওয়াই মঙ্গলপ্রদ।"

"খুব সত্য।"

"আপনি যে আমার মতে সায় দেন ইহা খুব আনন্দের বিষয়। যাই হোক্ আমাকে ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতেই হইবে—তাহার কারণ আছে।"

"কি কারণ ?"

জন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—"আপনি যদি কারণ জানিতে চান, তাহা হইলে আমি আপনাকে কারণ বলিব ; যদি আমি ফিরিয়া না আসি, বুঝিতে পারিবেন যে আমি কেবল আমোদ ও খেয়ালের বশে চলিয়া যাই নাই। ভগবান জানেন আমি কি সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং যতদিন আমি এখানে থাকিব আমার উদ্ধার হইবার কোন আশা নাই। আমি ইহার চাপে নিজ জীবনকে নিরাশায় ডুবাইতে চাহি না—আমি আপনার কথামত পৃথিবীতে আমার কাজের অংশ বীরের মত করিতে চাই। কাহারও বলা উচিত নয় যে আমার শক্তি অপেক্ষা আমার বোঝা বেশী। আপনিও কি ইহা মনে করেন না ?"

"আমারও তাহাই বিশ্বাস।"

"যাহা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা আশা করা কি অন্যায় নহে ?"

"জিনিষটা কি এতই অসম্ভবনীয় ?"

"আপনি বুঝিতে পারিবেন না। আপনি জানেন না—আমার এসব কথা বলিবার কোন অধিকার নাই, কিন্তু আপনি আমায় বন্ধু বলিয়াছেন, আশা করি আপনি কখনও আমায় ভুল বুঝিবেন না। কেন না ——। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই, ভগবান্ আপনাকে সুখী করুন।"

"জন, যেও না।"

পৃথিবীর চক্ষে সমান না হইলেও, তাহারা বিশ্বশক্তির চক্ষে সমান এবং পরস্পর পরস্পরের। যখন জেন আলো লইয়া প্রবেশ করিল, তখন জন উরসুল্লার হাত ধরিয়া বাবার কাছে উপস্থিত হইল।

"আমরা উভয়ে পিতৃমাতৃহীন। ইনি আমার ভাবী স্ত্রী. আশীর্ব্বাদ করুন "

বৃদ্ধ পিতা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

সেই তুমি।

যবে মোর আঁখি কোণ হ'তে
ঝরে পড়ে আসার,
কে তখন সুকোমল করে
মুছায় গো সে জল আমার।
চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক মুখখানি
রাখি যবে উপাধান পরে,
কে আমার শিয়রে বসিয়া
রাখে হাত অতি স্নেহভরে।
সুখে দুঃখে মরম মাঝারে
কার মুখ জাগে স্নেহময়ী,
সংসারের দুর্ব্বিপাক মাঝে
বল কার মুখপানে চাই।
সেই তুমি জননী আমার
চির স্নিগ্ধ শান্তির নির্ঝর,
তপ্ত হিয়া জুড়াবার লাগি
আছে তব সুশীতল কর॥

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

NURSING অর্থাৎ সেবা, শুশ্রূষা।

Nursing অর্থাৎ সেবা, শুশ্রূষা; প্রথমতঃ দেখা যাক সেবা, শুশ্রূষা কাহাদের দরকার হয়। যাহারা অক্ষম অসহায় তাহাদেরই সেবা করা, শুশ্রূষা করা দরকার হয়। যাহারা নিজে নিজে সামলাইতে পারে না, তাহাদের সামলাইবার জন্য অপরের সাহায্য দরকার হয়। সুতরাং শুশ্রূষা অনেক রকমের হইতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, লোকেরা বৃক্ষসেবা, পশুপক্ষী সেবা ও রোগীর সেবা করিয়া থাকেন। অনেক মেয়েরা এসব বিষয়ে ব্রত গ্রহণ করেন। বনজঙ্গলে গাছপালা সব আপনা হইতেই জন্মায়, আর আপনা হইতেই বড় হয়, কেহ তাদের সেবাও করে না, শুশ্রূষাও করে না; স্বভাবের নিয়মে তাহারা নিজে নিজেই সামলাইয়া চলে। কিন্তু আমাদের সাধের বাগানে আমরা কত যত্ন করে মাটী তৈরী করি, কত সন্তর্পণে বীজ বপন করি, আর তাহাতে জল সেচন করি, পরে যখন একটু একটু গাছ বাহির হয় তখন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কত সাবধান হই, বেশী জলে পচিয়া না যায়, বেশী রৌদ্র লাগিয়া ঝল্‌সাইয়া না যায়, পোকায় খাইয়া না ফেলে, কিম্বা পাখীতে ঠুক্‌রাইয়া কচি পাতাগুলি নষ্ট না করে, এই সব বিষয়ে কত রকম উপায় গ্রহণ করি। এইরকম আস্তে আস্তে আমাদের যত্নে ও সেবায় গাছগুলি বাড়িতে থাকে। ইহাকেই বৃক্ষসেবা এবং ইংরাজীতে Plant Nursing বলে। আর সেই সাধের বাগানকে Nursery বলে বোধ হয় আপনারা অনেকেই এই রকম গাছের Nursery দেখিয়া থাকিবেন। Victoria Nursery, Empress Nursery, পারিজাত Nursery ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত Nurseryর নাম শুনিয়া থাকিবেন। হয়ত আপনাদের অনেকের নিজের নিজেরও Nursery থাকিতে পারে, সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না। অনেকে পশু পক্ষীরও সেবা করিয়া থাকেন। বনের ভিতরে পশু পক্ষীরা আপনারাই বিচরণ করিতে থাকে, কাহারও আদর যত্নের অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু আপনারা বোধ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, যখন পশু পক্ষী সকলকে গৃহপালিত করা যায়, তখন তাহাদের কত সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়। তখন তাহারা অনেক বিষয়ে নিজে নিজেদের সাম্‌লাইতে পারে না, সুতরাং তাহাদের সেই সব বিষয়ে সাহায্য করিতে হয়। আর রোগীর ও অথর্ব্বদের সেবার বিশেষ রকম প্রয়োজন হয়। মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয়, তখন তাহার শক্তি কমিয়া যায়, সে তখন অনেক বিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই সব বিষয়ে অপরের সাহায্য লওয়া আবশ্যক হয়। রোগীর সেবা করাকেও Nursing বলে; আর বৃদ্ধ বয়সে অথর্ব্ব হইলে তাহারও সেবাকারীর সাহায্য আবশ্যক হয়। রোগীর সেবা করিতে হইলে প্রথমে জানা দরকার রোগী কাহাকে বলে? আপনারা হয়ত বলিবেন কে না রোগী দেখিয়াছে? কে না জানে

রোগী কাহাকে বলে ? বিজ্ঞানের ভাব থেকে বলিলে জীবনীশক্তি, যাহা দেহের মধ্যে কাজ করে, তাহা স্বাভাবিক ভাবে না চলিলেই রোগ। ইহা নিশ্চয় যে স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের কার্য্য সকল যেমন হয় রোগের অবস্থায় কখন ঠিক সেরূপ হয় না, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন কোনও যন্ত্রের ভিতরে অল্প কিছু একটা নষ্ট হইয়া গেলে সেটা বিকৃত হইয়া যায়, তেমনি শরীরের কোন যন্ত্রের কিছু ব্যতিক্রম হইলে মানুষ রোগগ্রস্ত হয়। রোগ হইলে শরীরের শক্তি হ্রাস পায় তখন বাহির হইতে সাহায্য কিম্বা যন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার উপায় করা দরকার। চিকিৎসার দ্বারা রোগীর রোগ দূর করা দরকার। চিকিৎসক হইলেন রোগীর সাহায্যকারী, কারণ অসুস্থ হইলে মানুষকে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যদি আমরা আর একটু বিশেষ ভাবে এ বিষয় দেখি, তবে দেখিতে পাই আর একজন আছেন যিনি চিকিৎসকের অপেক্ষা কম নন, তিনি হলেন শুশ্রূষাকারী। চিকিৎসক রোগীকে দেখিয়া আসিয়া যে সব ব্যবস্থা করেন, যিনি রোগীর ভার লন, তাঁর সেই সব পালন করিতে হয়; না করিলে রোগী রোগমুক্ত হইতে পারে না। রোগীর পক্ষে চিকিৎসকের যেমন দরকার, শুশ্রূষাকারীরও তেমনি দরকার। আমরা সে সব বিষয়ে অত মন দিই না, শুশ্রূষাকারীরও যে বিশেষ কাজ আছে আমরা তাহা ভাবি না। আমরা ডাক্তার ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত হই, ভাবি তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল, সেই জন্যই আশানুরূপ ফল পাই না। যিনি রোগীকে সাহায্য করেন, শুশ্রূষা করেন ইংরাজীতে তাহাকে Nurse বলে। হাঁসপাতালে Nurseদের পোষাকে বুকের উপর একটী Red Cross থাকে, আর তাহাদের কোমরবন্ধে 'Going about doing good' এই মটো লেখা থাকে। Crossটী কিসের চিহ্ন তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন, ইহা হইতেছে আত্মোৎসর্গের চিহ্ন। Nurseএর কাজ করিতে গেলে আত্মোৎসর্গ না করিলে পারা যায় না। সুতরাং এইরকম কার্য্য যাঁহারা করিতে যান তাঁহারা এই আত্মোৎসর্গের ভাবকে সর্ব্বদাই মনে জাগরূক রাখেন। এই Nurseদের যে দল বা সমিতি তাহাকে সেই জন্য Red Cross Society বলে। এই সমিতির লোকেরা সমস্ত দেশ বিদেশের হাঁসপাতালে রোগীদের সেবা করিয়া থাকেন এবং বিষম যুদ্ধক্ষেত্রের আহতদিগের সেবার জন্য তাঁহারা সেখানেও ডাক্তারদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন। রোগীর সেবা অনেক সময়ে বিশেষ বিপজ্জনক। রোগীর শুশ্রূষাকারীর যে কার্য্য তাহা উচ্চ ও মহৎ। ধর্ম্মপ্রচারক যেমন আত্মার অভাব দূর করিতে সাহায্য করেন, শুশ্রূষাকারীও তেমনি রোগীর অভাব পূরণ করেন। ধর্ম্মপ্রচারকের নিকটে গিয়া আত্মার কথা বলা হয়, এখানেও তেমনি শুশ্রূষাকারীর নিকটে দেহের কষ্টগুলি জ্ঞাপন করিতে হয়। ধর্ম্মজগতে যেমন অনেক সাধুর নাম আছে, তেমনি রোগীর শুশ্রূষাকার্য্যেও অনেকের নাম বিখ্যাত আছে। Father Damian এঁদের মধ্যে একজন

প্রধান। তিনি কুষ্ঠরোগীর সেবার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, Nursing Society করিয়াছিলেন। Miss Florence Nightangle মেয়েদের মধ্যে প্রধান। ইনি নিজে সেবা করিয়াছেন, শুশ্রূষাকারিণীর দল সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মজগতে যেমন সাধু মহাত্মাদের নাম পূজিত হয়, তেমনি ইঁহাদেরও নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজিত হইবে। রোগীর শুশ্রূষাকারীর কার্য্য, ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। অনেকে রোগীর সেবাব্রত গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে বৃক্ষসেবা পশুসেবা ইত্যাদি ব্রত মেয়েরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও রোগীর সেবাব্রত গ্রহণ করেন না। ইয়োরোপে অনেক মহিলা এই ব্রত লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সংক্রামক রোগীর সেবা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কলিকাতা নগরীতে যেরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব তাহাতে আমাদের এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অন্য রোগী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সেবার আবশ্যক হয়। এমন কি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সম্যক্ শুশ্রূষার অভাবেই সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হয়। দুঃখের বিষয় যে যখন সেবার অত্যন্ত আবশ্যক তখনই ইহার অভাব। আমরা সকলে জানি যে, সংক্রামক রোগগ্রস্তের সেবার জন্য লোকের অভাব হয়, কিন্তু ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যেসকল সেবাকারী মহাত্মারা তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সেবার জন্য আপন আপন প্রাণ দান করিয়াছেন, যেমন Father Damian। কলিকাতা নগরীতে মহামারীর আগমনে কত লোক আপনাদিগকে সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা কত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সকলেই এই সেবাব্রত বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়া ভয় পান, এবং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না; কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা হাঁসপাতাল সকলের বিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ডাক্তার, Nurse ও অন্যান্য হাঁসপাতাল সংক্রান্ত লোকদের মধ্যে এই বিপৎপাত কত অল্প এবং তাহাতে অনেকটা সাহস জন্মাইতে পারে।

একজন ডাক্তার একটী বসন্ত রোগীকে দেখিয়া গেলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কি কি বিষয়ে সাবধান হন? তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। "It is God who spares us to serve you, but, of course, we make use of all the knowledge bestowed upon us by His mercy." এই কয়েকটী কথাতে সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা কিরূপে করিতে হয় তাহার বিবরণ লিখিত রহিয়াছে।

প্রথমতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস;—সেই বিশ্বাস তোমাকে সাহস দান করিবে। ভগবান তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। এই বিশ্বাস সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকিয়া

তোমাকে অকুতোভয়ে সেবা করিতে সক্ষম করিবে। যদি এই বিশ্বাস না থাকে, যদি একজন তোমার রক্ষক আছেন এ জ্ঞান মনে না থাকে, তাহা হইলে ভয়ে তুমি কথনই অগ্রসর হইতে পারিবে না, তুমি নিজের আত্মীয় স্বজনকেও পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিবে। সচরাচর সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। এই ভগবৎ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য যখন কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ধর্ম্মপ্রচারকগণ ঘরে ঘরে ঈশ্বরের উপাসনা, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। এই কলিকাতা নগরীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দলে দলে পাড়ায় পাড়ায় বিরাট হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি কত কি হইয়াছে, এবং এই সকল ব্যাপারে লোকের মনে এই মহামারী অপেক্ষা প্রতাপশালী এবং যিনি আমাদের মঙ্গলকর্ত্তা ও রক্ষক তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কত আরাম ও শান্তি আনিয়া দেয়। যখন চারিদিকে মৃত্যুভয় তাহার বিকট মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সেই সময়ে যদি সেই চিরমঙ্গলপ্রদ অভয়প্রদ ভগবদাশ্রয়ের কথা মনে করা যায়, তাহা হইলে কত শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। যখন একেবারে অসহায় অবস্থা তখন যদি বিশ্বাসচক্ষে চির আশ্রয়কে সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কি আরাম ও সুখ! সকল ভয় দূরে যায়, প্রাণ সাহসে পূর্ণ হয়। সংক্রামক রোগের সময়ে ভগবানে বিশ্বাস ভিন্ন আর উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন এই যে মৃত্যুভয় ইহা বিশ্বাসকে সদা জ্বলন্ত রাখিবার জন্যই দয়াময় এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন। এই স্থির মৃত্যুভয় সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাই মাঝে মাঝে তিনি এই সকল মহামারীকে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার কথা মনে করিয়া দিবার জন্য, নির্ব্বাণপ্রায় বিশ্বাস উজ্জ্বল করিবার জন্য; এই সকল সংক্রামক রোগ আমাদের মঙ্গলের জন্যই সেই মঙ্গলময়ের বিধান। হে সংক্রামক রোগের সেবাকারী, তোমার বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হউক, তবে তুমি দায়িত্বসাধনে সক্ষম হইবে।

দ্বিতীয় কথা,—সেবার ভাব। ভগবান তোমাকে রক্ষা করিবেন, তুমি অপরকে সেবা করিবে বলিয়া। তোমার সেবা করিবার ভাবই জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। তুমি সেই রোগীর সেবা করিবার জন্যই যেন জীবিত আছ। নিষ্কাম ভাবে তুমি সেবা করিবে, তাহাতে তোমার জীবন যায় ক্ষতি নাই, কারণ তাহার সেবার জন্যই তোমার জীবন, সেই কার্য্যে তুমি উহা উৎসর্গ করিয়াছ, যদি ব্যয় হইয়া যায় তবে উহা সার্থক হইল। ভগবান তোমাকে যে উদ্দেশ্যে রাখিয়াছেন, তাহা সফল হইল।

ভালবাসা, প্রেম ব্যতিরেকে সেবার ভাব মনে আসে না, আর সেই ভালবাসার, সেই প্রেমের জ্বলন্ত প্রমাণ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে যেরূপ দেখা যায় আর তেমন কোথায়? কোলের সন্তান ডিপ্থিরিয়া রোগগ্রস্ত; প্রেমময়ী

মাতা সেই সন্তান কোলে অবরুদ্ধ গৃহে, সেই রোগের বিষপূর্ণ গৃহে, দিবা রাত্রি যাপন করিতেছেন। যখন সন্তানের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয় তখন কত চুম্বন দানে তাহার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন। আর শেষ মুহূর্ত্তে, সেই বিষাক্ত সন্তান দেহ আলিঙ্গনে চুম্বনে ছাইয়া দেন। তখন সংক্রামণের ভয় তিলার্দ্ধও মনে স্থান পায় না।

প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ; অন্য কোনও ভাবের স্থান নাই। আর যখন সেই ডিপ্থিরিয়া রোগে শিশুর শ্বাস অবরুদ্ধপ্রায়, চিকিৎসক আসিলেন, Tracheotomy operation করিলেন, তবুও নিশ্বাস পড়ে না, তখন অকুতোভয়ে সেই চুঙ্গী মুখে মুখ লাগাইয়া ফুৎকার দেন, তখন কি ভাব তাঁহাকে এই কার্য্যে তৎপর করে ও এই কার্য্য সাধনে সক্ষম করে, কিসে তিনি নিজের প্রাণের ভয় একেবারে বিসর্জ্জন দেন, ইহার উত্তর আপনারাই দিন। আমার বলিবার প্রয়োজন নাই। কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল মূত্র বমন প্রভৃতি অসমসাহসিকতার সহিত তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা পরিষ্কার করেন, এই কার্য্যের মূলে কোন্ ভাব প্রধান, তাহা আর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না। আর বসন্ত রোগীর যিনি সেবা করিয়া থাকেন তাঁহার কাছে যদি প্রেম শিক্ষা করিবনা ত কোথায় করিব? প্রেম ব্যতিরেকে সেবা হয় না। যদি সেবাকারী হইতে চাও তাহা হইলে ভালবাসিতে শিখ, ভাল না বাসিলে কখনও কাহারও সেবা করিতে পারিবে না। প্রেমই সেবার মূলে। সেবা প্রেমের নিদর্শন। প্রেমময় ভগবান আমাদের কত সেবা করিতেছেন। তাঁহার সেই অসীমপ্রেমের বিন্দু লাভ করিয়া আমরা যেন সেবাব্রতে ব্রতী হইতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মনেতে প্রেম না থাকিলে আমরা রোগীর সেবা করিতে পারি না, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীর। যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া প্রেমের প্রেরণায় সেবাব্রতে ব্রতী হইলাম, তখন আমাদের জ্ঞান দরকার। সম্যক্‌রূপে সেবা সাধনে সক্ষম হইতে পারি সে জন্য সে বিষয়ে সম্যক্ শিক্ষা দরকার। সেই অনন্ত জ্ঞানপ্রস্রবণ হইতে দিন দিন কত জ্ঞানই আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। আমাদের জীবন পরিচালন সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখীন বিপদ সমূহ উদ্ধারের জন্য দিন দিন আমরা ভগবৎপ্রসাদে কতই না জ্ঞানলাভ করিতেছি। এই সমুদয় জ্ঞান উপার্জ্জনের পর, তাহার সম্যক্ ব্যবহারেই আমাদের জীবন রক্ষার উপায় ও বিপদ সমূহের প্রতিকারের সম্ভাবনা। জ্ঞান শিক্ষা করা ও তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক। সংক্রামক রোগের সেবায় তাহার বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন, এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগেই আমাদের নিরাপদ থাকিবার সম্ভাবনা। ভগবানে বিশ্বাস, তাঁহার সন্তানে প্রেম, ও তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন ও যথাযথ ব্যবহার, এই তিনটী সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সেবাকারীর আবশ্যক। সেই জ্ঞান সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট অতি সংক্ষেপে এবং যতদূর সহজ ভাবে হয় বলিতে চেষ্টা করিব।

আমি পূর্ব্বে সংক্রামক রোগের সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিয়াছি তখন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সেবায় কত বিপদ তাহা বলিয়াছি, এবং সেইখানে সেবাকারীর আত্মোৎসর্গের ভাব কি প্রকারে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তাহাও দেখাইয়াছি, সুতরাং আত্মোৎসর্গ, ভালবাসা ও প্রেম না থাকিলে কেহই সম্যক্‌রূপে শুশ্রূষা করিতে পারেন না। আর এই যে কোমর বন্ধকের লেখাটী, উহাও বলিয়া দিতেছে যে Nurseরা কেবল উপকার করিয়াই বেড়াইবেন। বাড়ীতে রোগ হইলে মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি আপনার লোকেরা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, কোনও কোনও স্থানে বিশেষ দরকার হইলে শিক্ষিতা Nurse আনা হয়। আর বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য যে একজন বিশেষ সেবাকারী সে বিষয়ে আমরা কখনও ভুলিব না। এ সম্বন্ধে রবীবাবুর যে কবিতা তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সকল সেবাকারীদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা বড়ই শক্ত। মেয়েরা Nurse এর কাজ করিতে বিশেষ পটু, না পুরুষেরা, এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। তবে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ স্থানেই মেয়েরা এই কাজ বিশেষ পারদর্শিতার সহিত করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। অনেকেই বলেন Nurseএর কাজ করিতে হইলে যে সকল গুণের দরকার মেয়েদের ভিতর স্বভাবতঃই সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেই জন্যই তাঁহারা এ কাজে বিশেষ পটু হন।

কুরুক্ষেত্রে সুলোচনা যখন সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অভাগী এরূপে কিগো অনিদ্রা ও অনাহারে পোয়াইবি দেহ আপনার ?
নাহি রাত্রি নাহি দিন; থাক প্রলেপের মত লাগি অঙ্গে আহত সবার ?
শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায় হইয়াছে কি দশা তোমার ?
বসিয়া গিয়াছে চোখ, মলিন বিবর্ণ মুখ, ধূলায় ধূসর কেশভার ?
আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ; দেখি নাই তব হাসি মুখ,
এইরূপ রাত্রি দিন ঘুরিয়া মড়ার তরে নাহি জানি পাও কিবা সুখ ?"

তখন সুভদ্রা তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় মেয়েরা Nurseএর কার্য্যে কেন এত স্বভাবসিদ্ধ। সুভদ্রা বলিলেন,—

"ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ ?
রোগে শান্তি দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি, এই ধরাতলে রমণীর বুক ?
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ ?
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ দিদি ! রোগ শোক দুঃখ

স্বজিলা অনন্ত প্রেম পূর্ণ নারী বুক।
আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপে যদি
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়
রমণী জীবন গঙ্গা বহিয়া না যায়?"

এই উত্তর শুনিয়া সুলোচনা বলিলেন,—"মানিলাম নারীধর্ম্ম আর্ত্ত আহতের সেবা" এবং সুলোচনার কথায় এই পৃথিবীর অনেক লোকেই সায় দেন; সেই জন্য Nurseএর কাজে মেয়েদের প্রাধান্য। আমাদের ছোট ছোট মেয়েরা বৃক্ষসেবাব্রত গ্রহণ করে। এই কাজ করিতে করিতে তাহাদিগের বিশেষ একটী শিক্ষা হয়, সেবা সম্বন্ধে মনের ভাব যেরূপ হওয়া উচিত সেইটী ক্রমশঃ বিশেষরূপে বাড়িতে থাকে। অপরকে কি প্রকারে আদর ও যত্নের সহিত সাহায্য করিতে হয়, তাহাই বিশেষরূপে শিখিতে থাকে। অপরের জীবন যাপনের এবং বর্দ্ধনের পক্ষে কি প্রকারে সহায়তা করিতে হয়, সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে থাকে। পরে যখন পৃথিবীর অন্য কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ যখন তাহারা মাতৃত্ব লাভ করে, তখন তাহাদের সেই সেবার ভাব ও আদর যত্ন করিবার ইচ্ছা ও অপরকে সহায়তা করিবার শিক্ষা, শিশু সন্তানের লালনপালন ক্রিয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোগী ও অথর্ব্বদিগের সেবা শুশ্রূষা কার্য্যে তাহাদের নিপুণতা জন্মাইয়া দেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে এই Nursing অর্থাৎ শুশ্রূষাকার্য্য অনেকটা এক রকমের। যদিও অবস্থাবিশেষে এবং ব্যক্তিবিশেষে ইহার প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব আছে, তবুও মনের ভাব ও শিক্ষা এই সকল সম্বন্ধেই অনেকটা এক রকম। যে কোন প্রকারেরই Nursing হউক না কেন, এই কাজটী খুব উচ্চ ও মহৎ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেয়েরা নানা প্রকার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, বৃক্ষ সেবা, রোগী সেবা, এই দুইটীকে ব্রতস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সন্তান পালনকে ব্রত বলা যায় কি না আপনারা বিবেচনা করুন। যদিও আজকাল অনেকে এই শেষোক্ত Nurseএর কাজ ব্রতস্বরূপ লইতেছেন, এবং এমনকি অনেকেই এই উপায়ে তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, তবুও যে ভাব এই কার্য্যে রমণীদিগকে নিয়োজিত করে, সে ভাব যে কতদূর মহৎ এবং পবিত্র তাহা বলা যায় না। এমন কি বিশ্বজননীর যে প্রেম তাহা এই মাতৃভাবের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। গানেতে আমরা শুনিয়াছি,—"জননী সমান করেন পালন।"

আর কবি যে সুভদ্রার মুখ দিয়া নারীধর্ম্মের বর্ণনা করাইয়াছেন সেই সুভদ্রাই আবার বলিতেছেন:—

"জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগৎ, শিশু কিছু নাহি জানে আর;
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে ভ্রাতা ভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।

পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্ত সুখ পুণ্যতীর্থ সাগরসঙ্গম।"

প্রেমধর্ম্ম এই। সুতরাং সন্তানের স্নেহ প্রেমকে অনন্ত বিস্তৃতি দান করে। আর সেই সন্তানের লালন পালন কার্য্য কত যে মহৎ, বিশুদ্ধ ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা বলা যায় না। যাঁরা এই গুরুভারের দায়িত্ব যত বেশী বুঝিতে পারেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের জন্য তত চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সেবার মূলে যে ভাব নিহিত থাকে তাহা স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু সে বিষয়ে শিক্ষা দরকার আছে। সভ্যতার বিস্তারের সহিত আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই এই সন্তানপালন ক্রিয়া কষ্টকর মনে করেন এবং সেই ভার অপরকে দিয়া অনেক সময়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। যদিও অনেক সময়ে সম্পূর্ণরূপে এই দায়িত্ব অপরকে দেন না, কিন্তু খুব বেশী রকমে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অপরের শিশুসন্তানের লালনপালন ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি মহৎ কার্য্য করেন এবং অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আবার সেই সুভদ্রা সুলোচনাকে বলিতেছেন—

"আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র যে হয় কি মহত্ব তার?
পরের পুত্রের মাতা, পরের মাতার পুত্র যে হয় সে পুণ্যপারাবার।"

আপনারা বোধ হয় অনেকেই এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। বাড়ীর পুরাতন চাকর চাকরাণীরা কি প্রকারে শিশু সন্তানদের ভালবাসে ও আদর যত্ন করে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, হয়ত ছেলের মা ছেলের কান্না থামাইতে পারিতেছেন না, অথবা তাহাকে সামলাইতে পারিতেছেন না, কিন্তু পুরাতন ঝি কত আদর যত্নে তাহাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা দান করে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মা ছেলেকে বকিয়াছেন বা মারিয়াছেন এবং তাহাতে সেই ছেলের ঝি বিরক্ত হইয়াছে অথবা কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, এই সন্তানপালনের কাজ কি মহৎ ও বিশুদ্ধ। যে কেহই এই কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনের ভাব একটা খুব উচ্চ ভাবের দিকে প্রধাবিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

স্বর্গযাত্রীর প্রতি।

স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী সাধ্বীসতী সুশীলাদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

স্নেহের ভগিনী, তুমি আজ তোমার আদরের গৃহসংসার শূন্য করিয়া অসময়ে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তিময় অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছ। এখানকার শোক-সন্তপ্ত রোগজীর্ণ দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তোমার প্রাণপক্ষী আজ দিব্য বেশ ধারণ করিয়া পুণ্যময় অমরলোকে চিরশান্তিদায়িনী জননীর কোলে দেবাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমানন্দ ও অক্ষয় শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছে। কিন্তু এখানে তোমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজন, তোমার স্নেহময়ী শোকজীর্ণা বৃদ্ধা মাতৃদেবী, তোমার অতুল স্নেহের পিতৃহীনা অবোধ বালিকা কন্যাগণ যে তোমাকে এ সংসারে এত শীঘ্র হারাইয়া আজ দুঃখের সাগরে নিমগ্ন। শিশুদের তুমি নিজ স্নেহপক্ষপুটে নিয়ত ঢাকিয়া অসীম স্নেহের অঞ্চলে বেষ্টন করিয়া সকল দুঃখ কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; আজ তাহা ভুলিয়া তাদের কোথায় রাখিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইলে? তোমার নীতিবিদ্যালয়ের আদরের বালিকা ছাত্রীগণ আজ তোমার অভাবে দুঃখে নিয়মাণ। তাহাদের নীতি-শিক্ষার কাজ যে তোমার আদর যত্ন ও উৎসাহের অভাবে শুষ্ক যায়। এখানকার সকল কাজ ফেলিয়া, কাহার স্নেহের ডাক শুনিয়া, কোন্ মহা আহ্বানে আজ তুমি সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তহৃদয়ে সন্ন্যাসিনীর বেশে এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলে? কোন্ দেশের স্নেহভরা সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়া এখানকার সকল স্নেহ মায়া মমতাকে বিসর্জ্জন করিয়া এত শীঘ্র প্রস্থান করিলে?

শান্তিভিখারিণী, এ পৃথিবী কি তোমায় আর একবিন্দুও শান্তিদান করিতে পারিল না? তোমার শান্তিহারা হৃদয় দেশে দেশে, পথে পথে, দ্বারে দ্বারে শান্তি ভিক্ষা করিয়া ফিরিল, কোথাও কি একবিন্দু শান্তিও মিলিল না? তাই সেই সকল শান্তির প্রস্রবণ চিরশান্তিদায়িনী জগজ্জননী আজ তোমাকে ডাকিয়া তাঁর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। প্রিয় ভগিনী, আমরা তোমার যথার্থ আদর স্নেহ যত্ন কিছুই করিতে পারি নাই। তোমার প্রতি আমাদের যার যাহা কর্ত্তব্য দায়িত্ব ছিল, মনে হয়, তাহার কিছুই করা হয় নাই। যাহার যেটুকু স্নেহ ভালবাসা আদর যত্ন করিবার কথা ছিল, উচিত ছিল, যতটুকু প্রাণভরা স্নেহদানে সুখী করিবার সামর্থ্য ছিল, যতটুকু সেবার আবশ্যক ও অবসর ছিল, তাহার কিছুই করা হইল না। এই কর্ত্তব্যের ত্রুটীর কথা মনে হইয়া তোমার বিচ্ছেদ আজ তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। আজ আর একটী বার যদি তোমার দেখা পাইতাম, খুব ভাল করে প্রাণ-ভরে স্নেহ করিতাম, ব্যাকুল হ'য়ে চরণ ধরে একবার ক্ষমা চাহিতাম।

দেবি, তুমি আজ দিব্যধামবাসিনী, পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত; তুমি মহা সাধনার বলে, কঠোর তপস্যার ফলে আজ স্বর্গসুখের অধিকারিণী। তোমার সকল সাধনা আজ পূর্ণ। তোমার দ্বারা জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা আজ সার্থক হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তোমার মত একজন স্নেহময়ী ভগিনীকে এত শীঘ্র অকালে হারাইয়া আমাদের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ। আমাদের মধ্যে আজ তোমার স্থান শূন্য, আর কে তাহা পূর্ণ করিবে? তোমার কার্য্য যে সবই অসম্পূর্ণ রহিল, আর কে তাহা সম্পন্ন করিবে? যে আদরের নীতিবিদ্যালয়কে তুমি প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া যার জন্য ব্যস্ত হইয়া কাজ করিতে ছুটিয়া আসিতে, তোমার সে কাজ যে পড়িয়া রহিল? যে সুন্দর নীতিবিদ্যালয় অকালে কালের ভীষণ বজ্রাঘাতে দগ্ধ হইয়া, সকল সৌন্দর্য্য হারাইয়া, জীবনীশক্তিহীন হইয়া, মৃতপ্রায় অবস্থায় প'ড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তুমি তাহাকে স্নেহবারি সিঞ্চনে প্রাণপণ যত্নে সঞ্জীবিত পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। তুমি তাহার উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিজের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করিয়া অকাতরে কত পরিশ্রম যত্ন করিয়াছ। ইহার জন্য আমরা তোমার নিকট চিরঋণী। কার্য্যের পুরস্কার ভগবান্ তোমায় দান করিয়া ধন্য ও সুখী করিবেন।

স্নেহময়ী ভগিনী, এ সংসারে তুমি পরম সৌভাগ্যবতী হইয়া জন্মিয়াছিলে। অতুল স্নেহের আধার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও পরে ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিতুল্য দেবমূর্ত্তি পরম গুণময় দেবতার চরণে স্থান লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছিল। শতজন্মের তপস্যার ফলে পবিত্রহৃদয় দেবতুল্য স্নেহময় দেবতার অতুল স্নেহলাভে আদরিণী রাজরাণী পরম সুখ সৌভাগ্যশালিনী হইয়া জন্ম সার্থক হইয়াছিল। আবার কয়দিনের জন্য মহাপরীক্ষার অনলে পড়িয়া বিশুদ্ধ খাঁটীসোণায় পরিণত হয়ে আজ তুমি সেই দেবসন্নিধানে পৌছিয়াছ; আজ তোমার সেই আনন্দময় দিব্যমূর্ত্তি, তোমার সেই আনন্দ সম্মিলনের মধুর দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল। তবে থাক ভগ্নি, সেই অনন্ত অক্ষয় নিত্যানন্দধামে চিরশান্তিতে বাস কর। এবং পৃথিবীর শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের জন্য, দুঃখী জগতের জন্য ভগবানের চরণে চিরশান্তি ভিক্ষা করিও।

গোলার ধাক্কা।

সৈন্যগণের মনে গোলার ধাক্কা সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। তাহারা বলে, "গোলা গা ঘেঁসিয়া চলিয়া যাওয়ায় শরীরের ভিতরে নানাপ্রকার ক্ষতি হইতে পারে।" গোলার আঘাত চিহ্ন বা শরীরের উপরে কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথচ নানাপ্রকার রোগ এই আঘাত হইতে ঘটিতেছে। সৈন্যগণ ইহাকে "ওয়া-

ইণ্ডিড" বলে। অস্ত্রচিকিৎসক গণ এ ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়ে সংশয়শূন্য নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, একখণ্ড ভারি লৌহপিণ্ডের আঘাতেই এরূপ ঘটিতেছে। উপরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন অনেক সময়ে দেখা যায় না। ইহার কারণ যাহাই হউক এবং যেটিই সত্য হউক না কেন ইহাকে কিছু নয় বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে পারেন না। এই প্রকার আঘাত পাইয়া অনেকে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে এই প্রকার ধাক্কায় সৈন্যগণের স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। অনেকে ইহার ফলে নিজের অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। ডাঃ এ, ফিলিও এই ধরণের একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, আইপ্রেস সমর সংঘর্ষে একটি সৈন্য খাদের নীচে সম্পূর্ণরূপে মাটি চাপা পড়ে ও লোকটিকে উদ্ধার করিবার পর তাহার জ্ঞান হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার স্মৃতিশক্তি তখন একেবারে লোপ পাইয়াছে দেখা গেল। সে এই ঘটনার আগেকার কিছুই মনে করিতে পারে নাই। যখন তাহাকে লণ্ডনের হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় তখন সে তাহার বাপ মাকে চিনিতে পারে না। যখন তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সে বলে যে, সে কখনও পূর্ব্বে সে বাড়ী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে গুলি চিনিতে পারে নাই। যখন তাহাকে গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হয়, গির্জ্জায় লোকেরা কি করিতেছে সে তার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে যুদ্ধ সম্বন্ধে তার আদৌ কৌতূহল দেখা যায় নাই; কোথায় যুদ্ধ চলিতেছে তাহাও সে জানে না এবং জানিতে ইচ্ছাও করে না। হিপনটিজম দ্বারা যখন তাহাকে সম্মোহিত করা হয় তখন তাহার লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া আসে এবং সে অবস্থায় তাহার জীবনের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার আইপ্রেস যুদ্ধে কেমন করিয়া দুরবস্থা ঘটিল তাহাও বলিয়াছিল।

আর একটি হাঁসপাতালে এই প্রকারের আর একটি রোগী আছে। সে ঐ রূপে গোলাবর্ষণের সময় মাটি চাপা পড়ে। মাটির ভিতর হইতে উদ্ধার করিবার পরে তার সমস্ত শক্তি ফিরিয়া আসিল, কেবল তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল। যাহা হউক শীঘ্রই সে নিজের কাজে যোগদান করিল। ইহার কয়েকদিন পরে তাহার কণ্ঠনালী ফুলিয়া উঠে এবং তজ্জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। হাঁসপাতালে থাকিবার সময় তাহার এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি হয়। মনোবিজ্ঞানে যাহাকে Dissociation of Ideas বলে, এই সৈনিকটির তাহাই হয়। একটি ঘটনা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনাকে আমাদের স্মৃতিপটে আনয়ন করে; যেমন নেপোলিয়ানের ছবি দেখিয়া আমাদের নেপোলিয়ান 'মানুষকে' মনে পড়ে; অথবা নেপোলিয়ানের কথা মনে করিতে গিয়া নেপোলিয়ানের ন্যায় অন্যান্য বীরের কথা মনে পড়ে—এইরূপ যে বন্ধনসূত্র দ্বারা

অনুরূপ ধারণা আমাদের মনের মধ্যে একটির পর একটি আসিয়া পড়ে তাহাকে Association of Ideas বলে। কোনও রূপ মানসিক ব্যাধি হইলে এই যে ধারণার মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র রহিয়াছে ইহা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহাতে আমরা একটির পর আর একটি বিষয় মনে আনিতে পারি না। এই ব্যাধি মানুষকে সময় সময় অতি পরিচিত স্থানকে অচেনা করিয়া, অতি পরিচিত লোককে অপরিচিত করিয়া তোলে। এই সৈনিকটি একদিন হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আর হাঁসপাতালে ফিরিতে পারে নাই, ২।৩ দিন হারাইয়া গিয়াছিল। ইহাকে যখন বিলাতে আনা হয় তখন দেখা যায় যে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতেছে। ইহার কারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্য নহে, মানসিক ব্যাধি। লোকটি হাত পা নাড়িবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল।

যে সকল চিকিৎসকগণ এই প্রকার রোগীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন তাঁহাদের একটি বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রোগী যাহাতে রোগের বিষয় অনবরত না চিন্তা করে, যাহাতে রোগী বিমর্ষ বা একেবারে নিশ্চুপ না বসিয়া থাকে। ছোট ছোট কাজ দিয়া রোগীর মনকে বেশ একটু কাজে লাগানো দরকার। এইরূপ শক্তিহীন রোগীদিগের উপযুক্ত কাজ দেওয়াও বিশেষ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সাধারণতঃ তাহাদিগকে সেলাই করিতে, বয়ন করিতে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ দেওয়া হইতেছে। একটা বড় রকমের প্রকৃত কাজ তাহাদের নিকট আশা করা অন্যায়। কাজের সঙ্গে বিশ্রাম এবং সেই সঙ্গে বলকারক পথ্য এবং যথাযোগ্য ঔষধ দিলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

হিপনটিজম এই সকল মানসিক ব্যাধির প্রধান চিকিৎসা। কয়েকটি সামরিক হাঁসপাতালে ঐ উপায়ে আশ্চর্য্য রকম ফললাভ হইয়াছে। রোগীকে সম্মোহিত অবস্থায় বেশ দৃঢ় বিশ্বাস এবং শক্তি সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়ায় রোগীর মনে ধীরে ধীরে শক্তি আসিতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় তাহাদিগকে যে সকল বিষয় উৎসাহ দেওয়া যাইতেছে, সম্মোহক নিদ্রার পরে সেই সকল বিষয়ে তাহাদের বাস্তবিক শক্তি বাড়িতেছে।

গোলা ফাটিয়া কেমন করিয়া মানুষকে এমন করিয়া দেয়, সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই করা হয় নাই। কেহ বলেন, গোলা ফাটিয়া বাতাসে যে চাপ দেয় তাহাতেই শরীরের রন্ধ্র দিয়া সেই চাপ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অনিষ্ট করিতেছে। কেহ কেহ আবার অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়া ইহাকে নানা জটিলতর পথে লইয়া যান। কারণ যাহাই হউক ইহার ফল সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। এইরূপ ভাবে যাহারা রোগগ্রস্ত তাহাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাদের কাজ করিবার সামর্থ্য কখনও হইবে কি না বলা যায় না। তাহাদের রোগ দু'দশ দিন বা দু'চার মাসের নহে, তাহাদের মৃত্যুও নাই; কাজেই এমনতর ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যে তাহাদের যেন কোন

কষ্ট না হয়; সুচিকিৎসা ও সুপরিচালিত হাঁসপাতালে উহাদের স্থান হওয়া উচিত। এমন হাঁসপাতাল এখনও হয় নাই। অচিরে এই শ্রেণীর হাঁসপাতাল হওয়া প্রয়োজন। আজীবন ব্যাপী ব্যাধিভার লইয়া যাহারা বাঁচিবে তাহাদের ব্যাধিমুক্ত বা বাঁচাইবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত প্রয়োজন।

রুশিয়ার মদ্যবর্জ্জন।

ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের প্রারম্ভেই রুশগভর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা সৈন্যদিগের মধ্যে মদ্যপান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভড্‌কা (Vodka) নামক এক প্রকার মদ্য সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই রাজাজ্ঞার গুরুত্ব কত অধিক এবং তাহার প্রবর্ত্তনে দেশের কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রুশিয়ার রাজস্বসচিব কিছুদিন পূর্ব্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যখন আমি সম্রাটের আদেশে সমস্ত সাম্রাজ্যে ভড্‌কার ব্যবহার বন্ধ করিলাম, তখন আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এইরূপ একটী গুরুতর বিষয় কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আমার আশঙ্কা হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা স্বপ্নের ন্যায় অলীক, ইহা বাস্তবের আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু এই কয় মাসে দেশের যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাতেই আমার সমস্ত ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, এখন আমি ইচ্ছা করিলেও এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। সমস্ত নরনারী উচ্চকণ্ঠে ইহা সমর্থন করিবে।

গত বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভড্‌কার ব্যবসায় গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং পরিচালনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সরকারের প্রচুর লাভ হইত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবসায়ে প্রায় ১৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রাজস্বের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোনও জাতি যে কোন সময়ে এত বড় একটা লাভের পথ সহজে বর্জ্জন করিতে পারে না। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় যখন অর্থের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক, এই প্রকার কার্য্য করা সহজ নয়; তবে কি জন্য রুশিয়া এইরূপ একটি মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত করিলেন?

প্রথম উদ্দেশ্য সৈনিকদিগের কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি করা। প্রথমতঃ যাহাতে সৈন্যগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেন্দ্রস্থানে মিলিত হইতে পারে তজ্জন্য মদ্যপান নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফল অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এত দ্রুত কার্য্য হইতে লাগিল যে কেহ তাহা কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। ইহার সুফলে প্রীত হইয়া সম্রাট মহোদয় গত সেপ্টেম্বর মাসে আদেশ প্রচার করেন যে, যত দিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, তাঁহার আজ্ঞা বলবতী থাকিবে। তাঁহার আদেশ কতদূর কার্য্যকরী

হইয়াছে তাহা বিলাতের টাইম্‌স (Times) পত্রে বিশিষ্ট যুদ্ধসংবাদ দাতার উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি প্রায় ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত রুশীয় সেনার সহিত অবস্থান করিতেছি, কিন্তু একদিনের তরেও একটী মাতাল সৈন্য বা সৈনিক কর্ম্মচারী দেখিতে পাই নাই" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাটের আদেশ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ ব্যয়সংক্ষেপ করা। ইংলণ্ডের অস্ত্রসচিব মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ কিছুদিন পূর্ব্বে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে মদ্যপানের জন্য আশানুরূপ যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে। অপর পক্ষে রুশিয়ার রাজস্বসচিব বলিতেছেন যে, মদ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়াতে কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমজীবীর কার্য্যকরী শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় সমাজের উন্নতি সাধন। ইহাই এই সুব্যবস্থার চরম সুফল। বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে রুশিয়ার ব্যবস্থা পরিষদ (Duma) সাম্রাজ্যে মাদকতার বহুল প্রচার দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্রাট বহুকাল হইতে অমিতাচারের স্রোত বন্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রজাগণের ধর্ম্মনীতি ও কার্য্যকুশলতার বিনিময়ে রাজকোষ পূর্ণ করা নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য। যুদ্ধের প্রারম্ভে এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। সম্রাট নিজের বাক্য কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে সমস্ত জাতি তাহার সমর্থন করিল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রুশিয়ার সেভিংস ব্যাঙ্ক (Savings Bank) সমূহে ৭০,০০০ পাউণ্ড সঞ্চিত ছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাহার পরিমাণ ২৯,১০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, দেশে মিতাচারের ফলে লোকসাধারণ মিতব্যয়ী হইয়াছে। দেশে নানাপ্রকার অপচয় নিবারিত হইয়াছে।

শুধু যে যুদ্ধের সময় ভড্‌কা (Vodka) ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। গত অক্টোবর মাসে সম্রাট আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, রুশ গভর্ণমেণ্ট আর কখনও মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় করিবেন না।

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে। ফরাসী দেশে ও ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মানবজাতির এই মহাশত্রু নিপাত করিতে না পারিলে কোনও বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই, লয়েড্ জর্জ্জ মহোদয় বলিয়াছেন যে, ইংরাজজাতিকে কয়েকটী শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তন্মধ্যে মাদকতা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। ইহাকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য শত্রুকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য হইয়া আসিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান সময়ে যুরোপের মহাযুদ্ধ সকল সময়েই লোকের আলোচনার ও ভাবনার বিষয় হইয়াছে। প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্রে যুদ্ধবার্ত্তা পাঠ করা অনেকের পক্ষে প্রাতঃকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছে। সকলেই এখন যুদ্ধের শেষ দেখিতে ব্যস্ত। কেহ যদি শান্তিসংস্থাপনের স্বপ্নের কথাও বলে, তাহাও লোকে আগ্রহ করিয়া শুনে। কিন্তু যাঁহারা এসকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত যুদ্ধের অন্ত দেখিতে পাইতেছেন না—এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরও যে কত দিন চলিবে এবং অন্য কোন্ কোন দেশ যে এই যুদ্ধের এক বা অন্য পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে তাহাও কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

কিছুদিন হইল জর্ম্মণগণের প্রবল গতি যেন কিছু বাধা পাইয়াছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমায় কোন পক্ষ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ সৈন্য জর্মণীকে পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সমস্ত পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে জর্ম্মণগণ যেন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে পূর্ব্বক্ষেত্রে রুশিয়া রাজ্যেও জর্ম্মণীর গতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেছে। যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় জর্ম্মণী রুশরাজ্যে যতদূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইটালীও মহা বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। অষ্ট্রীয়াকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। জর্ম্মণগণ শত্রুর দেশে স্থির হইয়া কখনও থাকিতে পারিবে না—জয় করিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলেই পরাজিত হইতে হইবে, অথবা পলায়ন করিতে হইবে। তাই মনে হয়, যখন জর্ম্মণগণ আর তেমন জয়লাভ করিতে পারিতেছে না, তখন তাহাদিগের পরাজয় অদূরে। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা এক ভগবানই জানেন।

যুরোপের অবস্থা কতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু গত বৎসর আমাদের দেশ যেমন যুদ্ধের সংবাদে ও যুদ্ধের ফলে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, এ বৎসর তাহা অপেক্ষা অনেক শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। গত বৎসর পাটের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে কৃষিজীবিগণের বড় দুর্দ্দিন হইয়াছিল এবং সমস্ত দেশ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবৎসর পাটের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে সে অভাব চলিয়া গিয়াছে। জর্ম্মণরণতরী বঙ্গসাগর প্রভৃতিতে জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল এখন বৃটিশরণতরীর প্রভাবে তাহাও দূর হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য কোন কোন বিষয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য অপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি আমরা অনেক পরি-

মাণে শান্তভাবে জীবন যাপন করিয়া আপন আপন লক্ষ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারিতেছি। শান্তি যে কত মূল্যবান্, ব্যবসায় বাণিজ্য অব্যাহত থাকা যে কত প্রয়োজন, অশান্তি ও দুর্দিন আসিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া গেল।

একদল যুবক এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা দল বাঁধিয়া লোকের ধন অপহরণ করিয়া ধনী হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদিগের এই অসংকার্য্যে বাধা দিলে লোকের প্রাণনাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। আজকাল সংবাদপত্রে যে সকল ডাকাইতি ও নরহত্যার কথা শুনা যাইতেছে তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। ইহারা নাকি বঙ্গদেশের ভদ্রসন্তান—আপনাদিগের উন্নতি করিতে অসমর্থ হইয়া এই ভয়ঙ্কর পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণ শান্তি রক্ষা করিতে ও অপরাধীকে ধৃত করিয়া বিচারাধীন করিতে যে ন্যায় ও রাজবিধি অনুসারে কার্য্য করিতেছেন এই বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকগণ সেই সকল রাজপুরুষের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প। চারিদিকে ডাকাইতি ও হত্যা হইতেছে। বালেশ্বরের জঙ্গলে সে দিন ৫জন যুবক রাজপুরুষগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে। আবার সেদিন কলিকাতা মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে একটি পুলিশ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়াছে। এরূপ ভয়ঙ্কর হত্যা ও নানারূপ দুষ্কার্য্য করিয়া যে কাহারও শুভ হইতে পারে না এ কথা কে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে?

শুশ্রূষা বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সত্যেন্দ্র নাথ সেন এম্. বি, মহাশয়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এবার প্রকাশিত হইল। ইহা মহিলাদিগের বিশেষ হিতকর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইহার পর মনোবিজ্ঞান বিষয়েও একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল। যাঁহারা ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ইঁহাদের শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাসকল শ্রবণ করিতে সুবিধা পান না, তাঁহাদিগকে সেই সকল বক্তৃতার সার অবগত করিতে আমরা চিরদিনই যত্নবান। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে বিধবাগণের বৈধব্যব্রত পালন কিরূপ হওয়া প্রার্থনীয় এ বিষয়ের কোন প্রচলিত বিধি বা নিয়ম নাই। কেহ কেহ বিবাহিত জীবনে যেরূপ অশন বসন ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতিতে জীবন ক্ষেপণ করিতেন, বিধবা অবস্থাতেও প্রায় সেইরূপ করিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ নারী ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্যের কোন ব্যবস্থা না পাইয়া প্রাচীন সমাজের বৈধব্য বিধি পালন করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিয়া থাকেন। এই উভয়ের কোনটিই ঠিক মনে হয় না। যিনি অন্তরে স্বামিশোকে ক্লিষ্ট হইয়া বাহিরে দশজনের সঙ্গে কোনরূপে বাস করিবেন তাঁহার আহার পরিচ্ছদ বাক্য ব্যবহার সকলই বৈরাগ্যের প্রকাশক হইবে। অপর দিকে প্রাচীন সমাজে বিধবার জীবনে কোন আশা কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কোনরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া যাওয়া, এক উপবাস ইত্যাদি দ্বারা শরীরকে নির্য্যাতন করা কার্য্যত মৃত্যুকেই আশা করা—ইহা কখনও মঙ্গলময় দেবতার উপাসিকার জীবনের ব্যবহার হইতে পারে না। ইহা অস্বাভাবিক ও আনষ্টকর। প্রাচীন সমাজে প্রচলিত বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত থাকা উচিত নহে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩২২। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় দেবতা, তুমি নরনারীর মঙ্গলের জন্যই তাহাদিগকে পরিবারবদ্ধ করিয়াছ, সমাজের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছ। পরিবার ও সমাজবন্ধন ত্যাগ করিয়া কেহ উচ্চ প্রেম বা আত্মত্যাগ সাধন করিতে পারে না; কিন্তু দেখ, প্রিয়জনের সেবা করিতে ব্যস্ত হইয়া ও তাহাদিগের সুখে দুঃখে মুগ্ধ হইয়া আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই। পরিবার ও সমাজ না হইলেও তোমাকে ধরিতে পারি না, অপর দিকে তাহাদিগের সেবায় ডুবিয়াও তোমাকে ভুলিয়া যাই; তাই প্রার্থনা করি, তোমার পুত্রকন্যাগণের হিতের জন্য এমন একটি আশ্রম তুমি নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত কর, যেখানে বাস করিয়া নরনারী একত্রে তোমার পূজা উপাসনা ও স্তব স্তুতি করিয়া ধন্য হইবে এবং নিঃস্বার্থ প্রেমে প্রতিবেশীর সেবা শুশ্রূষা সাহায্য শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তোমাকে পাইতে পারিবে। দয়া করিয়া তুমি এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান করিয়া দেও।

একটী আশ্রম অত্যন্ত প্রয়োজন।

(বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন।)

স্বামী। এ শরীরে আর চলে না। কয়েকটা যায়গায় যেতে হয়েছে, এখন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, ভোরবেলাতেই আবার বাহির হইতে হইবে। ন—র স্ত্রীর অসুখ নাকি খুব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ডাক্তারেরা ভয় পাইয়াছেন—আমি এ সংবাদ

শুনিয়াও যাইতে পারি নাই ; মনটা ব্যস্ত রহিয়াছে, সকালে যাইয়া সংবাদ জানিতেই হইবে। তার পর বোধ হয় সকালে একত্র উপাসনাও ঘটিবে না। বোম্বাই অঞ্চলের দেশসেবক পণ্ডিত গো——কাল আসিবেন, আমি একবার তাঁকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তাই বাড়ী ফিরতে বেলা হইবে।

স্ত্রী। তোমার যেমন স্বভাব, বৃদ্ধ হইয়াছ, একটু পরিশ্রম করিলেই কাতর হইয়া পড় ; তবু ক্রমাগত এটা ওটা লইয়া ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইবে—তার পর বাড়ী আসিয়া বলিবে আর নড়িতে পারি না। চিরকাল এই দেখিতেছি। যাহা ইচ্ছা কর। তোমাকে কিছু বলা বৃথা—আমারও কাল সকালে অনেক কাজ, বড় বউর ত যে শরীর তার উপর আবার ছেলের অসুখ, সে হয়ত খোকাকে লইয়া থাকিবে, এদিকে সংসারের সব কাজ রহিয়াছে, তার উপর আজ আবার ডাল ভিজাইয়াছি—কাল বড়ী দিতেই হইবে। তুমি বেলা করিয়া আসিলে তখনই উপাসনা হইবে। তুমি যেন বাড়ী ফিরিতে মেলাই বেলা করিও না। বেলায় খাইলে তোমার শরীর খারাপ হয়।

স্বামী। বড় বউর শুধু শরীর খারাপ নয়, মনই বেশী খারাপ। কাল খোকা কাঁদছিল বলে তুমি বউকে বড্ডো বক্‌ছিলে, আমি দেখলাম বউ কিছু বলিল না, কিন্তু যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইল। তার ছেলে তার কাছে কাঁদছে, তোমার কথা বলবার দরকার কি ছিল?

স্ত্রী। তুমি ত খালি আমার দোষই দেখ। বউ ব'সে ব'সে শিলাই কচ্ছে, এদিকে খোকা কেঁদে খুন হচ্ছে, এসব আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না। এই সেদিন বঁটি রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখেছিল, খোকা বঁটির উপর পড়ে খুন হচ্ছিল, তাতেও কি আমি কিছু বলিব না! যদি এমন সব দেখতে হয়, তবে আমি এ সংসারে থাকতে চাই না, বউ যা ইচ্ছে করুক, আমি গিয়া অন্য কোথাও থাকি। আমার এমন সংসারে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি আমার কোন কথাই না থাকিবে, যদি আমার সাক্ষাতে অন্যায় কার্য্য হইবে আর আমার কিছু বলিবার অধিকার থাকিবে না, তবে আমি কেন এমন অবিচারের সংসারে থাকিতে যাইব? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি এখানে থাক, তোমার ত আর কিছুতে পায় না, আমাকে যে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে হয় ; তা আমি পারিব না, আমাকে তুমি আর কোথাও পাঠাইয়া দেও। আহা, কচি খোকা আমার! তার প্রতি অন্যায় করিবে আর আমি কিছু বলিতে পারিব না, তার চেয়ে আমার মরিয়া যাওয়াও ভাল। আমি কিছুতেই এসংসারে থাকিব না, তা আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। একালে বউরা শাশুড়ীর অধীন হইবে না, তবে শাশুড়ী কেন তার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিবে!

স্বামী। তোমার কথা পূর্ব্বেও শুনিয়াছি, এখনও শুনিতেছি। তোমার একটা

কথা বুঝিতে হইবে যে সেকালে মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে হইত, শাশুড়ীর কাছে সব বিষয় শিখিত ও চিরদিন সব বিষয়ে শাশুড়ীর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে জানিত। তার মধ্যেও শাশুড়ী বউএ ঝগড়া না হইত তা নয়, আর এখনকার অবস্থা কত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েরা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ও যোগ্য হইয়া সংসার করিতে প্রস্তুত হইয়া বিবাহ করিতেছে ও নিজেদের মনোমত সংসার করিতে চাহিতেছে, ইহারা সে ভাবে শাশুড়ীর কর্তৃত্ব মানিবে কেন ? আর দেখ ভগবান যাহার কোলে ছেলে দেন তার বুকে যেমন দুধ দেন, শরীরে তেমনই বল দেন, মনেও তেমনই বুদ্ধি দেন। সন্তান হইবার পূর্ব্বে যে সময় পাওয়া যায় মেয়েরা যদি সে সময়টা ভাল শিক্ষা লাভ করে তাহা হইলে শাশুড়ী ছাড়া সংসার বেশ চালাইতে পারে। তোমার এজন্য এত অধীর হওয়া ঠিক নয়। বউকে আপনার সংসার আপনার ইচ্ছামত চালাইতে দেওয়াই ভাল, তাহাতে তাহারও শিক্ষা হইবে এবং মনে হয় এইরূপ ব্যবস্থা ছেলে-মেয়েদে শিক্ষার পক্ষেও ভাল।

স্ত্রী। তুমি তো মনে কর আমি এখন মরিয়া গেলেই হয়। কিন্তু এই তো সে দিন বউ জ্বর হইয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন কে ছেলে দেখিল, কে তার শুশ্রূষা করিল, কে তোমার সংসারের সমস্ত কাজ করিল ? আমি মরিয়া গেলে যদি এ সব কাজ ভাল হয়, তবে না হয় আমি এখনই মরি। তুমি ত বরাবরই বল বউকে সংসার ছাড়িয়া দাও, তোমার বউ যে পারে না তার কি ? যদি সংসারের আমি কেউ নই, তবে অসুখ বিসুখেইবা আমি খাটিতে যাইব কেন ? আর এই যে আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেছি– ছেলে নাওয়ান খাওয়ান ইত্যাদি সংসারের যত কাজ সবই তো আমি করি—তখনতো বউ বলে না যে তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। বেশ আমি একদিকে চলিয়া যাই, বউ ছেলেকে মেরেই ফেলুক আর যাই করুক আমার তা ভাববার দরকার নাই।

স্বামী। তুমি মিছে রাগ করিলে চলিবে কেন ? অবস্থাটা বেশ স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ না ? অসুখ হইলে, কি তেমন অবস্থা হইলে অবশ্য সাহায্য খুব দরকার, না হলে দিন চলে না, তাহা বলিয়া চিরদিন এক সঙ্গে থাকিয়া মন খারাপ করিবার দরকার কি ? আমি আমার নিজের কথাও ভাবিতেছিলাম যে ছেলেরা যখন যোগ্য হইয়া সংসার করিতেছে, তখন তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সংসার করে তাই ভাল। আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি হয়ত বিশেষ কোন অবস্থা ঘটিলে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে তার জন্য আমার তাহাদের পরিবারে বাস করিবার বিশেষ প্রয়োজন কি ? তুমি বলিবে, তবে ছেলেরা সংসার করিয়া মা বাবাকে তাড়াইয়া দিবে, তাতেই কি তাদের কুশল হইবে ? এই কি ভগবানের অভিপ্রায় ? ফলে আমি সে ভাবে কথা বলিতেছি না। আমাদের পুত্র পুত্রবধূ আমাদের প্রতি

একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তাহারা আমাদের এরূপ আলোচনা শুনিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে, আমি সে ভাবের কথাই বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে পুত্র ও বধু যেরূপ সংসার করিতে আরম্ভ করিয়াছে আমরা ত তাহা করিয়া শেষ করিয়াছি। পুনরায় কেন নাতী নাতিনী লইয়া নূতন করিয়া মায়ায় আবদ্ধ হই? এখন আমাদের পক্ষে একটা উচ্চতর ভূমিতে বাস করা কি উচিত নয়?

স্ত্রী। তুমি কি বলিতে চাও আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চয় জানি আমি এ বাড়ীতে না থাকিলে খোকাও বাঁচিবে না, আর বউরও ভয়ানক কষ্ট হইবে। ছেলে হয়েছে, কি একটু বয়স হইয়াছে বলিয়া বউ সংসারের কি জানে? তোমরা শিক্ষিতা মেয়ে বলেই একেবারে যেন গলিয়া যাও, আমি ঢের দেখেছি, লেখা পড়া শিখিলেই মেয়েরা সংসার করিতে শিখে না, তোমার ইচ্ছা হচ্ছে একটা কিছু বিপদ ঘটাইবে তা আমার কথা ত বাসি না হইলে মান্য পাইবে না, কাজেই এখন তুমি কি করিতে চাও তাই বল। তুমি যে উচ্চতর ভূমিতে বাস করিবার কথা বল তা শুনিয়া আমার ধৈর্য্য থাকে না, আমরা কোন্ নীচ ভাবে বাস করিতেছি, আর এর চেয়ে উচ্চ কি আছে?

স্বামী। আমি তোমাকে একটা প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা বলিব বলিয়াই আজ এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছি, তুমি আমার জন্য অনেক অভাব অসুবিধা সহ্য করিয়াছ ও কষ্ট পাইয়াছ, এবং আমার অনুরোধে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছ ফলে আমি বিশ্বাস করি যে ভগবান আমায় দুর্ব্বল জানিয়া আমার জীবনসংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্যই তোমাকে আমার জীবন-সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছেন। তুমি আমার জন্য কত আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছ, আমার ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা হয়, আমার ব্রত পালন হয় সে জন্যও কত চেষ্টা করিয়াছ উপাসনার ক্ষেত্রেও আমি তোমার নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি, সেবার কার্য্যেও তুমি আমার পার্শ্বে সেবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছ। এখন আমার মনে একটা নূতন ভাব আসিয়াছে, তাহা তোমার সাহায্য না পাইলে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না। তোমার একটা স্বভাব এই যে আমি যা কিছু বলি তখনই তুমি তাহারই প্রতিবাদ করিবে। চিরদিনই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছ, কিন্তু মনে করিয়া দেখ চিরদিনই তুমি আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছ, আর যেন একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছ। এখন যে কথা বলিতেছি তাহাও যদি সেই ভাবে প্রতিবাদ কর, তবে আমি কি করিব জানি না। কারণ এটা উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়, এখানে দুজন একমন একপ্রাণ হইয়া করিয়া উঠাই কঠিন. ইহার মধ্যে একজনের মনে সন্দেহ থাকিলে হইতেই পারিবে না।

স্ত্রী। তোমার কথাটা কি তাহা না শুনিলে আমি কি বলিব বল? তবে

ইহা তো তুমি জান যে আমি যতই প্রতিবাদ করি না কেন, তুমি যখন যাহা করিতে চাহিয়াছ, আমি কিছুতেই তোমার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হই নাই; তবে যাহা অন্যায় মনে হয় তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমাদের মত আমি কথায় ভুলিয়া থাকিতে পারি না, যেখানে মিছে ভড়ং কপটতা তার ভিতরে আমি নেই। তুমি কি বলিতে চাহিতেছ বল।

স্বামী। দেখ, আমরা ধর্ম্মমণ্ডলীর আশ্রয়ে ও ভগবানের কৃপায় ইহাই জানিয়াছি যে ভগবান প্রেমময়, তিনি আমাদের প্রতি চিরদিন কৃপা করিতেছেন এবং তাঁহার কৃপাই আমাদের ইহলোক ও পরলোকের আশা ও আনন্দের সামগ্রী। আমরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে পিতা মাতা ভাই বন্ধু দান করিয়া তাঁহাদিগের প্রেম সম্পদে আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। তিনিই পুনরায় আমা-দিগকে পিতা মাতা করিয়া প্রেম করিতে শিখাইয়াছেন। আমরা যে সংসারে আত্মনির্ভর করিয়াছি তাহাও মূলতঃ তাঁহারই ব্যবস্থা সংসারে মায়া মমতা মান অভিমান প্রভৃতি লইয়া যত সুখ দুঃখ পাইয়াছি তাহাও তাঁহারই বিধান। আমরা প্রথম জীবনে আপনা-দিগের পুত্র কন্যাগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য অনেক সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা করিয়া প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু মনে করিয়া দেখ তাহার ভিতর একটা মমতা,—আমার পুত্র, আমার কন্যা, এই বোধ সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে যেন মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; সে প্রেম যে ভগবানের দান, পুত্র কন্যাকে ভালবাসা যে দয়াময় ঈশ্বরের বিধান ও ইহা দ্বারা যে তাঁহার পূজা করা হয় এ কথা তখন মনে স্থান পায় নাই। তাহা শুদ্ধ অপত্য-স্নেহ হইলেও যেন ইতর জন্তুর অপত্য-স্নেহের অনুরূপ। তাহার মধ্যেও সময় সময় ভগবানের প্রেম দর্শন করিয়াছি সত্য, কিন্তু মোহ কখনও কাটিয়া যায় নাই। আর দেখ, আজ আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। আজ পৌত্রকে আমরা ভালবাসি, কিন্তু জানি ইহার পিতা মাতা ইহাকে ভাল বাসিতে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। তাই এখন আমার অন্তরে এই আলোক আসিয়াছে যে আমরা যদি পুত্র কন্যা-দের নিকট বাস করি বা অন্য কোথাও থাকি, আমরা দুজন সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে প্রেম করিব। তাহাদিগের সংসার তাহারা স্বাধীনভাবে করিবে, আমরা তাহাদের পুত্র কন্যা বিষয়ে আর সে মোহে ভুলিব না। আমরা প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে পরামর্শ দিব, সেবা করিব, সাহায্য করিব, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু করিব না। তুমি এখনই বলিবে যে নিজ বাটীতে পর হইয়া থাকিব কেমন করিয়া, এবং তাহাদের প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করিব, অন্য সময় কি করিব? এই কথাটিই আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাই। আমরা দুজনে তাহা-দের বাটীতে অতিথি ভাবে বাস করিব এবং ভগবান্ আমাদিগকে এতদিন যে প্রেম মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধন করিতে বাধ্য করিয়াছেন, এখন মুক্তভাবে সুখে

প্রতিবেশীর প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের সেবা করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে সে প্রেম সাধন করিব।

স্ত্রী তোমার কথাটা ভালই লাগিতেছে, কিন্তু আমাদের দ্বারা হইয়া উঠিবে কি? আমরা কি জানি? আমরা বৃদ্ধ বয়সে অধিক কি করিতেই বা পারিব? আর আমরা যে ভাবেই সেবা করিতে যাই না কেন লোকে তাহা ভাল ভাবে লইবে কেন? আর ছোট ছেলে পালন, কি কঠিন রোগের শুশ্রূষা এ সব তো আমার দ্বারা আর হইবে না। আমি লোকের বাড়ী যাইয়া কি করিতে পারিব তাও জানি না। তুমি একটা বড় কাজ আরম্ভ করবে, তারপর লোক হাসিবে, সে কি ভাল কথা হবে?

স্বামী। এ কাজ যে সহজ কাজ নয় তা আমি বেশ জানি। তবে আমার মনে এই পরিষ্কার ভাব আসিতেছে যে মায়ার সংসারে বাস করিবার দিন যখন শেষ হইয়াছে, পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করা ভয়ানক নির্ব্বুদ্ধিতা; এবং এখন আমাদের যে সময় ও শক্তি অবশিষ্ট আছে তাহা নিঃস্বার্থ ভাবে নরনারীর সেবায় ব্যয় করাই ভগবানের অভিপ্রায়। আমরা যদি অধিক কিছু না করিতে পারি তাহাতে ক্ষতি কি? যাহা পারি তাহাই করিব। এক জনের বাড়ীতে অপর কোন লোক নাই, গৃহিণীর কঠিন পীড়া, গৃহকর্ত্তা অন্নের সংস্থানে ব্যস্ত, আমরা দুজন সেখানে উপস্থিত হইলাম, তুমি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিলে, আমি দোকান হইতে ঔষধ আনিয়া দিলাম, এটুকুত আমাদের দ্বারা হইতে পারে? যাহারা আমাদের সেবা চায় না, আমরাত আর জোর করিয়া সেবা করিতে যাইব না? তুমি ত জান কত বাড়ীতে কত লোকের রোগের সময় শুশ্রূষা হয় না, কত বাড়ীতে শোকে সান্ত্বনা দান করিবার কেহ নাই, কত ছেলে মেয়ে একটু সুশিক্ষা পাইতেছে না। ফলে আমার মনে হয় যে সকল লোকের উদরান্নের সংস্থানের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় না ও বিশেষ কোন সেবার কার্য্য নাই, তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবার কার্য্য করা উচিত। সে কথা যাক, এখন তুমি এইরূপে প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া সংসারে অতিথি (অনাসক্ত) হইয়া থাকিতে প্রস্তুত আছ কি না তাই আগে বল।

স্ত্রী। তোমার কথাটা আমার ভাল লাগিল সত্য, এরূপ কিছু করিতে পারিলে অবশ্য ভাল হয়, কিন্তু লোকে যে বড় বড় ব্রত লয়, লোকের সুখ্যাতি পাওয়াটাই যেন তার মূল অভিপ্রায়। এ সব দেখে শুনে আমার ব্রত লওয়া বিষয়ে বড় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। তোমাকে বলিব কি, মানুষ লোক দেখান রকম একটা কিছু করিলেই আমার সন্দেহ হয়। আমি তাহা করিতে যাইব না, তবে আমা দ্বারা যতটা হয় ও তুমি যাহা করাইয়া লইতে পার, তার জন্য চেষ্টা করিব। এ কথা কাহাকেও বলিবে না। তবে আমি বলি যে যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন, যাঁহাদের সংসারে করিবার কোন

কাজ নাই তাঁহাদের জন্য একটা কোন নিয়মবদ্ধ সেবার ব্যবস্থা করিলে তো বেশ কাজ হয়।

স্বামী। আমি সেই বিষয়টাই কিছুদিন হইল ভাবিতেছি। তোমার আমার মত অবসর প্রাপ্ত লোক যেমন একরূপ সমাজের সেবা করিয়া প্রেমময় পরমেশ্বরের কার্য্য করিতে পারে—তেমনই যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন, সংসারে তেমন কোন কর্ত্তব্য নাই, এবং পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই, তাঁহাদের দ্বারা সমাজের মহা উপকার হইতে পারে এবং এই সেবার কার্য্য করিয়া তাঁহারাও প্রেমময় পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া পরম সুখী হইতে পারেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মে, হিন্দুধর্ম্মে, জৈনধর্ম্মে অনেক আশ্রম আছে, ধর্ম্মশীলা নারীগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন, সুযোগ অনুসারে সমাজের সেবা করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মত বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থা ও দেশের অবস্থা অনেক অংশে পৃথক্ তাহা সত্য। এখন আমাদের সমাজে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান বা হিন্দু সন্ন্যাসিনীর দল গঠন হইতে পারে না, কিন্তু এখনও ধর্ম্ম সাধন ও সমাজের সেবার জন্য অসংসারী নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া বিশেষ আশ্রমে বাস করিতে পারেন। আমার মনে হয় সকলে চেষ্টা করিয়া এইরূপ আশ্রম স্থাপন করিলে সমাজের শান্তি ও দেশের মঙ্গল হইবে এবং নারীগণ ধর্ম্মের উচ্চতম সুখলাভ করিতে পারিবেন। ফলে তুমি যে ব্রত লওয়াকে বা আশ্রমবাসিনী হওয়াকে শুধু লোক দেখান ব্যাপার মনে কর, ইহা কখনও ঠিক নয়। মানুষের ধর্ম্মভাবকে এরূপ সন্দেহ করাতে আপনার অনিষ্ট হয়। তুমি আপনিও কোন ব্রত লইবে না, অন্যে ব্রত লইয়া সেবিকা হইলেও তুমি সন্দেহ করিবে ইহা বড় অন্যায়।

স্ত্রী। আমি ব্রত লওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলি না। আর যাহারা যে ভাবে ব্রত লইবার লইবে, আমার কথাই বা শুনিবে কেন? কিন্তু কতকগুলি বিধবা একটা আশ্রমে থাকিলে যে ধর্ম্মসাধন ও সেবা হইবে, তাহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। সেই বিধবাশ্রমে দেখিয়াছি বিধবা মেয়েগুলি কত নীচ ব্যবহার করিত, পরস্পরে হিংসা করিত, অবসর পাইলেই নানারূপ দুষ্কার্য্য করিত। আমার মনে হয় বিধবারা কয়েকজন একত্র কিছুদিন বাস করিলেই অশান্তি, অপবিত্রতা ও অন্যান্য দোষ উপস্থিত হইবে। যে সকল বিধবার অবকাশ আছে, শক্তি আছে, শিক্ষা আছে, তাহারা নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই কত লোকের কত সেবা করিতে পারে। পুরুষ মানুষের অধীনে খুব কড়া শাসনে না থাকিলে বিধবাগণ কখন একত্র ভালভাবে থাকিতে পারিবে না।

স্বামী। আমি ও রকম বিধবাশ্রমের কথা বলি না। আমি বলিতেছি যে যেমন প্রাচীন সমাজের ধর্ম্মশীলা নারী শেষ জীবনে ধর্ম্মসাধন করিতে কাশী বৃন্দাবন

প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করেন, অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের সেবা করেন, সেইরূপ নারীগণ শুদ্ধ সাধনের জন্য সেই ভাবাপন্ন অন্য সকল মহিলাগণের সঙ্গে এক আশ্রমে বাস করিবেন। যাহাদের চিত্তের চঞ্চলতা যায় নাই, সংসারে আসক্তি রহিয়াছে তাহারা সেখানে যাইবে না। আর যাঁহারা এরূপ আশ্রমে বাস করিবেন তাঁহারা একত্র উপাসনা, পাঠ আলোচনা, সংগীত, ধ্যান, চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে সময় ব্যয় করিবেন। তাঁহারা সামাজিক বা পারিবারিক উপাসনাতে ধর্ম্মসাধকদিগের সহিত যোগ দিবেন, আপনারাও গৃহস্থের গৃহে যাইয়া সৎপ্রসঙ্গ উপাসনা সঙ্গীত প্রভৃতি করিবেন।

স্ত্রী। এরূপ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে অতি অল্প লোকই ইচ্ছা করিবে, তবে যাহাদের কোথাও কেহ নাই তাহারা যাইতে পারে। কিন্তু শান্ত হইয়া থাকিয়া ধর্ম্মসাধন কতজন লোক করিতে পারিবে তাহা আমি বলিতে পারি না। মেয়েরা সমস্ত দিন ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মকথা উপাসনা প্রার্থনা লইয়া থাকিবে ইহাতো আমার মনে হয় না, বিশেষ খাওয়া দাওয়া লইয়া মহা গোল লাগিবে। আর যাহাদের আপনার লোক—পুত্র পুত্রবধূ—কন্যা, জামাতা, নাতি নাতিনী আছে তাহারা কেন এরূপ ভাবে ধর্ম্মসাধন করিতে যাইবে?

স্বামী। আমি কি কথা বলিতেছি তাহা বোধ হয় তোমার মনে এখনও পরিষ্কার হয় নাই। আমি বলি যে চিরকালই ধর্ম্মশীলা নারীগণ সংসারকে উচ্চ ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল জানিয়া শেষ জীবনে পুত্র বা কন্যার সংসারে বাস না করিয়া তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। এ যুগের মহিলাগণের পক্ষেও সেইরূপ প্রয়োজন। প্রভেদ কেবল এই হইবে যে এ যুগের মহিলাগণ সমবিশ্বাসী ধর্ম্মসাধকগণের বাসস্থানের অনতিদূরে আশ্রম স্থাপন করিয়া আশ্রমে ধর্ম্মসাধন করিবেন, বিশ্বাসী মণ্ডলীতে সর্ব্বদা উপাসনাদিতে যোগ দিবেন, শ্রদ্ধেয় সাধকগণের উপদেশ ব্যাখ্যা ইত্যাদি শ্রবণ করিবেন; অপর দিকে প্রয়োজন অনুসারে গৃহস্থের গৃহে সেবা করিতে উপস্থিত হইবেন। যাঁহাদিগের পুত্রকন্যা আছে তাঁহারাও আশ্রমে বাস করিবেন, অথচ প্রয়োজন অনুসারে পুত্র কন্যার বা অন্য সকল পরিবারের রোগ শোক কষ্ট বিপদে তাহাদিগের সেবা করিবেন। আপনাদিগের কঠিন পীড়া হইলে বা বার্দ্ধক্যবশতঃ শরীর একান্ত অপটু হইলে পুত্র পৌত্রাদির আশ্রয়ে শেষে আসিবেন। যাঁহাদিগের সেরূপ কেহ নাই তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমেই থাকিবেন এবং আশ্রমবাসিনী অপর নারীগণ তাঁহার সেবা শুশ্রূষাও ধর্ম্মসাধনের ভাবে সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এইরূপ একটি আশ্রম হইলে নারীগণ উচ্চ ধর্ম্ম সাধন করিয়া পরম সুখ পাইবেন।

স্ত্রী। এরূপ আশ্রম হইলে মন্দ হয় না, হওয়া প্রার্থনীয় বটে, তবে বড় কঠিন ব্যাপার। আর আশ্রমটা তো কথার কথা নয়, ইহাতে অনেক টাকা চাই, নিয়ম

ব্যবস্থা সব হওয়া চাই, যদি কোন বড়লোক তেমন সব ব্যবস্থা করিয়া দেন তবেই বোধ হয় হইতে পারে। এরূপ একটা আশ্রম হইলে বেশ উপকার হয় বটে।

স্বামী। আমি এইরূপ আশ্রমকে যে অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা এই যে, মেয়েরা গৃহে বাস করেন, বালিকাকাল হইতেই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন, বয়স হইলে সে ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া যায়; দুই চারিটি সন্তানের মাতা হইলে উপাসনা প্রার্থনা, কি আত্মচিন্তা অথবা পরের মঙ্গলচিন্তার অবসরই থাকে না। যখন তাঁহাদের নিজ জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইয়া যায়, পুত্রকন্যাগণ সংসার করিতে আরম্ভ করে তখনও তাহাদিগের পুত্র কন্যা লইয়া পুনরায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, চিরদিনই সংসারে ডুবিয়া থাকেন। এরূপ আশ্রম হইলে তাঁহারা সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ভগবানের কৃপাসাগরে ডুবিতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, একটি সাধন আশ্রম হইলে নিকটস্থ গৃহস্থের গৃহে কঠিন পীড়া বা অন্য-রূপ বিপদ হইলে ইহারা দুজন দুজন করিয়া সেবা করিয়া মহোপকার সাধন করিতে পারেন। তৃতীয় কারণ এই যে, পুত্র কন্যা বা অন্য আত্মীয়স্বজনের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিলে তাহাদের পারিবারিক উন্নতি সাধনের বাধা হয়, তাহাদিগের পুত্র কন্যাগণের শিক্ষারও অনিষ্ট হয়। একথা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? পূজা উপাসনাতে যোগ ভক্তির সহিত ভগবানকে লাভ করা ও নিঃস্বার্থ প্রেমে নরনারীর সেবা করা পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই যে মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। এইরূপ একটি আশ্রম না হইলে সে সাধনপথই খোলা হইবে না। তুমি যে টাকার কথা ও সুব্যবস্থার কথা বলিতেছিলে, সে কথা সত্য বটে; কিন্তু মানুষ অন্তরের সহিত যে বস্তুর অভাব বোধ করে তাহা মোচন করিতেও বিলম্ব হয় না। যদি আমাদের সমবিশ্বাসী সকলে ইহাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মনে করেন, অচিরে প্রতি নগরে এরূপ সাধন আশ্রম স্থাপিত হইবে।

স্ত্রী। এরূপ হওয়া তবে সত্যই প্রয়োজনীয় এবং আমাদেরও আশ্রমের ভাবে সাধন করাই উচিত এখন বেশ বুঝিতেছি।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উনবিংশ অধ্যায়।

ফিনিয়স, এই ভিজে সেঁতসেতে দিনে তোমায় রাস্তায় বাহির করিতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই; কিন্তু তুমি কাছে থাকিলে আমি একটু বল পাই।

জন মিষ্টার বার্থউডকে তাহার সহিত উরসুলার বিবাহের কথা জানাইতে যাইতে-

ছিল। যখন আমরা বাড়ীর নিকট পৌছিলাম জনের চেহারা বদলাইয়া গেল, সে গৃহে যে সে কিরূপ অভ্যর্থনা পাইবে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

বাড়ীর দরোয়ান "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স" নাম শুনিবা মাত্র যেন দয়া করিয়া একটু চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"মশায়, মিষ্টার বার্থউড এখন ভয়ানক ব্যস্ত, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোন আশা নাই, অন্যদিন আসিবেন।"

"তাঁহাকে এ ভাবে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া আমি ভয়ানক দুঃখিত, কিন্তু আমাকে আজ দেখা করিতেই হইবে।"

জন দরোয়ানের পশ্চাতে খাবার ঘরে ঢুকিল এবং আপনার চঞ্চল মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া কম্পিত হস্তে ঘণ্টার দড়ি টানিল।

"আমি যে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহা কি তুমি তোমার প্রভুকে বলিয়াছ?"

"হাঁ মহাশয়।" ঠিক এই সময় ছোট ছেলেটী যে খবর দিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আপনার যাহা দরকার একটা কাগজে লিখিয়া দিন।"

"তাঁহাকে বল আমি নিজে তাঁহাকে সে কথাগুলি বলিতে চাই, অন্য কাহাকেও দিয়া বলিয়া পাঠান অসম্ভব, এ রকম ভাবে তাঁকে জ্বালাতন করা অন্যায়, কিন্তু কি করিব অন্য উপায় নাই।"

"যে আজ্ঞা মহাশয়।"

কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি কাছারী ঘরে আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করিতে পারেন।" আমরা ভিতরে ঢুকিলাম, মিষ্টার বার্থউড নিজের কাছারীঘরে বসিয়াছিলেন, জন ঘরে ঢুকিল তিনি দেখিতে পাইলেন না কিম্বা হয়তো দেখিয়াও দেখিলেন না।

"মিষ্টার বার্থউড!"

"কে মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, নমস্কার।"

"নমস্কার, মহাশয়, আমি আপনার কয়েক মিনিট লইতে চাই।"

"বলুন, বলুন।"

"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন আমি আমার কথা আড়ালেই বলিতে চাই।"

"এখানে সকল কথাই সকলের সাক্ষাতে বলিতে হয়।"

"তাহা হইলে অন্য গৃহে চলুন। কিন্তু আজই আপনাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" জানি না হঠাৎ বার্থউডের কি খেয়াল হইল সকলকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। "এবার যা বলিবার শীঘ্র শীঘ্র শেষ করুন।"

"মহাশয়, মিস্ উরস্যুল্লা মার্চ্চ আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন—"

"তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তার নাম করিবেন না—"

"মহাশয় দয়া করে অন্ততঃ আমার সামনে তাঁর সম্বন্ধে এমন অভদ্র ভাব ব্যবহার করিবেন না।"

"কেন তুমি কোথাকার কে? ঠেলা গাড়ী করিয়া চামড়া বিক্রী করিতে, তা কি ভুলে গিয়েছ নাকি?"

"মহাশয় আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না, সেই মহিলাটীর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

"সে আমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ কাটিয়াছে, সুতরাং তাহার কথায় আমাদের কি প্রয়োজন? তোমারই বা একজন মহিলার ঘরের কথায় প্রয়োজন কি?"

"অধিকার—সেই বিষয় তো আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, কয়েক মাসের ভিতরই আমি তাঁহার স্বামী হইব।"

বার্থ উডের মাথায় যেন বাজ পড়িল; "ওহে তুমি কি বলিতেছ? মেয়েরা খামখেয়ালী হয়, কিন্তু তোমার মত—"

"মহাশয়, সাবধান হইয়া কথা বলিবেন, আমার সামনে আমার স্ত্রীর অপমান করিবেন না।"

"আচ্ছা মানিয়া লইলাম। এখন আমায় কি করিতে হইবে?"

"আপনি তাঁহার অভিভাবক, সেজন্য আপনাকে তিনি যে আমার স্ত্রী হইবেন এ সংবাদটা দেওয়া প্রয়োজন অনুভব করিলাম। আর আপনি জানেন আমার কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু উরসুল্লার আছে, ইহার জন্যই আমি নিজেকে এত দূরে রাখিয়াছিলাম; কিন্তু এখন তিনি আমার এবং কোন পার্থক্যই তাঁহাকে নিজের করিবার জন্য বাধা দিতে পারিবে না। জগৎ বলিতে পারে যে আমি তাঁহাকে টাকার লোভে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। তিনি আমাকে বোঝেন, তিনি যখন তাঁহার সমস্ত জীবন আমাকে দিতে প্রস্তুত, তখন আমি কি কাপুরুষের ন্যায় জগতের ভয়ে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিব?"

"উরসুল্লাকে বলিও সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জোর যার মুল্লুক তার—তাহার সম্পত্তির এক পয়সাও দিব না।"

"সম্পত্তি সম্বন্ধে কথা বলিতে আমি আসি নাই, আমার যা বলিবার তাহা বলিলাম, মহাশয় নমস্কার।" আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় উরসুল্লার সহিত দেখা হইল।

জন এখন নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে চলিল। আমি ও মিসেস জেসপ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। জন প্রত্যহ বিকাল বেলা মিসেস জেসপের বাড়ী যাইত। জন ও উরসুল্লার ভালবাসার ভিতর কোন রকম চাঞ্চল্য ছিল না। উরসুল্লা নিজের কাজে

ব্যস্ত থাকিত, জনও জেসপদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু উরসুল্লার গলার শব্দ পাইবামাত্র নীরবে একবার তাহাকে দেখিয়া লইত।

আজ সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে একত্র হইলাম, খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে জন চলিয়া গেল, উরসুল্লা তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলে মিসেস জেসপ তাহাকে খাবার ও আচার ইত্যাদি শিখিয়া লইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন ঠিক সেই সময়—

"কোথায় সে, কোথায় সে? উরসুল্লা, তোমার নাকি শীঘ্র বিয়ে?"

"কে কেরোলাইন?" "হাঁ।"

"ছোট বেলায় মাথার ঠিক থাকে না! তুমি কি ভুলে যাচ্চ যে সে সামান্য মুচি!"

"তিনি মিষ্টার জন হ্যালিফ্যাক্স। দয়া করিয়া তাঁর সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বন্ধ করিলে ভাল হয়।"

"আমি তো কোন ক্ষতি করিতে চাহিতেছি না"

"কিন্তু কথাটা বদলাইয়া ফেলিলে কেমন হয়?"

কেরোলাইন নিজের মনে কত কি বলিতে লাগিল, উরসুল্লা তাহার কোন উত্তরই দিল না।

"পুরুষেরা এমন স্বার্থপর হয়, দেখ না তোমার মত এমন সুন্দর মেয়েটীকে কি দুরবস্থায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!"

উরসুল্লা আর নীরব থাকিতে পারিল না। "কেরোলাইন, তিনি যে আমার কাছে কি জিনিষ তাহা তুমি জান না, আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, কিন্তু তাঁহার আলোচনা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দাও।"

"উরসুল্লা, তুমি এই দরিদ্র ছেলেটীকে সঙ্গী করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন বলিতে পার কি?"

"কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাঁহাকে আমি প্রাণের সহিত ভক্তি করি, বিশ্বাস করি, কেন না তিনি আমার বিপদে কত সহায় হইয়াছেন। তাঁহার ভালবাসার আমি গৌরব করি—এবং তাহা হইতে কেবল আমার অনুপযুক্ততা ছাড়া আর কিছুই বিচ্যুত করিতে পারিবে না।"

"বিশ্বাস, ভক্তি ও সব লম্বা কথা ছেড়ে দেও, তুমি কি তাহাকে ভালবাস?" উরসুল্লা বিনম্র ভাবে চক্ষু উঠাইয়া বলিল, "জন জানেন।"

বিংশ অধ্যায়।

শরৎকালের শেষাশেষি তাঁহাদের বিবাহ অতি নীরবে হইয়া গেল। জনের মত ছিল যে এমন একটা পবিত্র বন্ধনের সময় বাহিরের গোলমাল যত কম হয় ততই ভাল।

যখন আমি বাড়ী আসিয়া পিতাকে বিবাহের সংবাদ দিলাম, তিনি যেন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলেন না। বিবাহ জিনিষটাই যেন পিতা ভাল বাসিতেন না। বলিলেন "যাক্, যখন হইয়া গিয়াছে তখন আশা করি তাহারা সুখী হইবে। মেয়েটীকে বেশ ভাল মেয়ে মনে হয়। জন চলে গেছে, ফিনিয়স, এসে আমার পাশে বস। তুমি যে চিরকাল পিতার পাশে থাকিবে, বিবাহ করিয়া পালাইবে না, ইহাও একটা আনন্দের সমাচার।"

যখন জন তাহার নূতন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন একদিন আমরা দেখা করিতে গেলাম। দুজনেই বাগানে কাজ করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল, কিছুক্ষণ পরে উরসুল্লা আমাদের উভয়কে একলা ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। জন একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, যখন দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল তখন আমার দিকে তাকাইল।

সে যে কত সুখী তাহা তাহার চোখ হইতেই বুঝা যাইতেছিল। জন আমাকে তাহার বাগান দেখাইতে লইয়া চলিল—সেই সময় উরসুল্লা একটী চিঠি লইয়া উপস্থিত হইল. উভয়ে একসঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিল—পড়িতে পড়িতে উরসুল্লার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল, জন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, তোমার স্বামীকে কেউ কিছু বলিবে না ইহা ভাবাওতো তোমার অন্যায়। যাক্, বার্থউড নাই বা আমাদের টাকা দিল, তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের সুখ তো আর কাড়িয়া লইতে পারিবে না? দারিদ্রতার ভিতর লোক সুখী হইতে পারে ইহা আমরা দেখাইব, প্রতিবাসীদের কথায় কাণ দিব না।"

আমি তাহাদের সংসার দেখিতে আরম্ভ করিলাম। উরসুল্লা অতি গৌরবের সহিত জনের বই দেখাইতে লাগিল, বলিল, "আমি তো বাজনা টাজনা কিছুই জানি না, কাজেই সব বইতে ভরা।"

"উরসুল্লা, আমার মা করোনেট বাজাতেন, তুমি না একবার বলেছিলে তুমি করোনেট জান।"

"মার কথা কখনও তো আমায় বলনি, তাঁর জিনিষ কিছু কি আছে?"

জন অতি যত্নে রক্ষিত একটী বাইবেল বাহির করিল, তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল "Guy Halifax, Gentleman."

উরসুল্লা অতি আনন্দের সহিত জনের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি জানিতাম তুমি উচ্চ বংশের ছেলে। আর না হইলেই বা কি হইত, তুমি আমার যে জন সেই জনই থাকিতে।"

জন আমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইতে চলিল, আমি জনের কাছে এতটা আশা করি নাই, কিন্তু উরসুল্লা জনকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বন্ধুবান্ধব সকলকেই আপন

করিয়া লইয়াছিল ও আমাকে ঠিক ভাইয়ের মত ভালবাসিত, সে জোর করিয়া জনকে আমার সহিত পাঠাইল।

রাস্তায় কিছুক্ষণ আমরা তাহার কথা বলিলাম, কিন্তু জন যেন তার সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে চাহিতেছিল না।

বাকি সমস্ত রাস্তা কি করিয়া জন আটার কলের উন্নতি করিতে পারিবে, উভয়ে তাহার আলোচনা করিতে করিতে চলিলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শীত ও বসন্তকাল নীরবে কালের আবর্ত্তে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আমি (ফিনিয়স) খুব অসুখে পড়িয়াছিলাম। বাহিরে আসা যাওয়া একরূপ বন্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু জন ও উরসুল্লা আমায় খুব ঘন ঘন দেখিতে আসিতেন। এই অসুখের সময় উরসুল্লার হাসিভরা মুখ ও যত্ন আমার নিকট তাহাকে নিজের বোনের মত করিয়া তুলিল এবং আমিও ধীরে ধীরে মিসেস হ্যালিফ্যাক্স বলা ছাড়িয়া দিয়া উরসুল্লা বলিতে আরম্ভ করিলাম।

গরমের দিনে যখন বড় বেলা একলা কাটাইতে ভয়ানক কষ্ট হইত, তখন আমি জনের বাড়ীতে পলাইয়া গিয়া বাগানে আপেল গাছের নীচে বসিয়া থাকিতাম। এখন সে বাগানের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেন সুন্দরতায় ভরিয়া গিয়াছে।

একদিন জুলাই মাসের রাত্রে তারায় ভরা আকাশের নীচে আমি ও জন বেড়াইতেছিলাম। উরসুল্লাও অনেকক্ষণ ছিল, পরে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া জন তাহাকে ঘরের ভিতর পাঠাইয়া দিল।

"ভাই ফিনিয়স, সমস্তই যেন কি রকম আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে!"

"কি আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে?"

"সমস্তই—না, না, সমস্ত না, কিন্তু একটা বিষয় যাহা আমি তোমায় এতদিন বলি নাই, যাহা উরসুল্লা তোমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। ফিনিয়স এই বড় দিনের আগেই আমি পিতা হইব। আমার ও উরসুল্লার ছোট মাথার উপর এত শীঘ্র একি দায়িত্ব ও এ কি আশীর্ব্বাদ। কত সন্ধ্যা আমরা কি করিয়া এ আশীর্ব্বাদের ও দায়িত্বের উপযুক্ত হইব আলোচনা করিতে করিতে কাটাইয়া দিয়াছি।"

"ভগবান্ তোমাদের শক্তি দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

"তিনি করিবেন বিশ্বাস করি, সেজন্যই আমরা নির্ভীক।"

শীতকালে জনের একটী মেয়ে হইল। তাঁহারা ছেলে পাইবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়ে দেখিয়া তাঁহাদের আর কোন দুঃখ রহিল না। জেল আহ্লাদে

আটখানা হইয়া কাপড়ে জড়ান মেয়েটীকে সকলকে দেখাইয়া দেখাইয়া ঘুরিতে লাগিল।

জনের আনন্দ আমি কি করিয়া প্রকাশ করিব। একদিন পরে শান্ত ও হাসিভরা মুখে সে আমার কাছে আসিল, কিন্তু আমি শুনিলাম, প্রথমে যখন তাহার কোলে মেয়ে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন সে বালকের মত কাঁদিয়াছিল।

জানি না কোন্ বন্ধনে শিশুটী আমাকে বাঁধিল, শিশুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ আমার জীবনে এই প্রথম। তাহাকে মিউরিয়েল জয় হ্যালিফ্যাক্স নাম দেওয়া হইল। সে নামটী যত পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যতার মূর্ত্তি হইয়া আজও আমাদের অন্তরে জাগিতেছে— চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে লিখিতেছি।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিউরিয়েল জন্মগ্রহণ করিল, এবং ফেব্রুয়ারীর ৯ই তারিখে তাহার নামকরণ হইল। সে দিনটী একটী বিশেষ দিন। মিষ্টার এবং মিসেস জেসপ, আমার বাবা এবং আমি সেদিন জনের বাড়ীতে আহার করিলাম।

কুড়ি বৎসর পরে বাবা আজ বাড়ীর বাহিরে খাইতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমাদের কত আনন্দ হইয়াছিল। খাওয়া শেষ হইলে বাবা মেয়েটীকে না দেখিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন, জন বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান আমাদের খুকুকে দেখিয়া যাইবেন না?" বাবা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন; মনে হইতেছিল যেন কত দিনকার পুরাণ স্মৃতি তাঁহার মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছে। অল্পক্ষণ পরে উরসুল্লা মেয়েটীকে লইয়া উপস্থিত হইল।

বাবা কেবল একবারমাত্র মা ও মেয়েকে দেখিলেন, তাহার পর চোখ ফিরাইয়া লইলেন। উরসুল্লার যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু অন্য সকলের তাহার খুকুর উপর মনোযোগ দেখিয়া যেন সে বাবার ব্যবহার ভুলিয়া গেল।

মিসেস জেসপ মেয়েটীকে কোলে লইয়া বলিলেন, "মেয়েটী ঠিক বরফের মত নরম ও সাদা, বরফ পড়ার ঋতুতে হইলেই বেশ মানাইত।"

উরসুল্লা—"হাঁ আর এত শান্ত, গলার শব্দ প্রায় শোনাই যায় না। সমস্ত দিন চুপ করিয়া চোক বন্ধ করিয়া পড়িয়া আপনার মনে খেলা করে। এই দেখুন আপনার কাপড় কেমন ধরিয়াছে। এত ছোট মেয়ের এত বুদ্ধি কখন দেখিয়াছেন কি? সমস্তই নিজের আঙ্গুল দিয়া ধরিয়াছে। দেখিবেন একটু আস্তে আসুন।"

দরজা খুলিয়া ডাক্তার ঘরে ঢোকাতে মেয়েটী চমকাইয়া উঠিল। জন বলিল "একটু শব্দেই এত চমকাইয়া উঠিতে আমি কাহাকেও কখন দেখি নাই, ইহার মধ্যেই এ তার মার ও আমার গলার স্বরের ভিন্নতা বুঝিতে শিখিয়াছে।"

ডাক্তার একটু যেন বিরক্তির সহিত বলিলেন, "শ্রবণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ।" উরসুল্লা বুদ্ধিমতী মেয়ের মত তাড়াতাড়ি কথা উল্টাইয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল। মেয়েটীর

চোখ কাহার মত হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ও নিজেই বলিল, "বাপের মত হইয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ তো আজও পাইলাম না, মা দিনরাত চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে। এই যে চোখ খুলিয়াছে, চলতো সোনা! জানালার কাছে গিয়া ডাক্তারকে নিজের সুন্দর চোখ দেখাইবে।"

চোখ দুটীর গড়ন-পিঠন ভারী সুন্দর, কিন্তু তবুও যেন কি রকম—অনেক শিশুর চাহনী অদ্ভুত হয়, কিন্তু ইহার চাহনী যে একেবারেই লক্ষ্যশূন্য, যেন একেবারে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না।

ডাক্তার জেসপ যেন চাহনী লক্ষ্য করিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

উরসুল্লা—"বাপের মত চোখ না?"

ডাক্তার—"আলো না হলে তো বলা যায় না, আলো আনিয়া দেখিবার এখনই এত প্রয়োজন কি, কাল দেখিলেই হইবে।"

ডাক্তারের সে পরিবর্ত্তন জন লক্ষ্য করিয়াছিল। উরসুল্লাকে বলিল, "খুকুকে আমার কাছে দিয়া আলোটা একটু লইয়া এসো তো।"

উরসুল্লা চলিয়া গেলে জন খুকুকে জানালার কাছে লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ তাহার চোখ দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি কি আমাদের বাছার চোখ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করেন?"

উরসুল্লা ঘরে ঢুকিতেছিল, শেষ কথাগুলি শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা খুকুর চোখ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন?"

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না। ডাক্তার মেয়েটীর বন্ধ চোখ খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মেয়েটী কিছুক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিল, মা পাগলের মত দৌড়াইয়া মেয়েটীকে আঁকড়াইয়া ধরিল—"বাছার চোখে কিছু হয় নাই, মিছামিছি উহার চোখে আঘাত দিবেন না, আমি কাহাকেও আমার বাছাকে ছুঁইতে দিব না।"

"উরসুল্লা!"

জনের এক ডাকে উরসুল্লার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, সে অনেক যত্নে নিজের চোখের জল সামলাইতে চেষ্টা করিল ও বলিল—

"আমায় ক্ষমা কর, আমি যে কি রকম ভয় পাইয়াছি। ওর চোখ আর দেখিও না।"

জন—"আর একটীবার দেখিতে দাও। একবার ভাল করিয়া দেখা হইলে আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইব। ফিনিয়স, আমার হাতে আলোটা দেও তো ভাই।"

উরসুল্লা জনের শান্ত, ভালবাসাপূর্ণ অথচ দৃঢ় ভাব দেখিয়া বিনা আপত্তিতে খুকুকে তাহার কোলেই থাকিতে দিল। শিশু বাপের ডাক শুনিয়া নিজের চক্ষু দুটী উন্মীলন করিল। ডাক্তার আলোটী তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরাইলেন, একবার এত নিকটে

লইয়া গেলেন যে প্রায় চক্ষুতে ঠেকিয়া গেল, কিন্তু বালিকার চক্ষুতে আঘাতও লাগিল না, সে চক্ষুও বন্ধ করিল না। ডাক্তার আলো মাটিতে রাখিয়া দিলেন।

"ডাক্তার! তবে কি আমাদের বাছা—" বলিতে বলিতে জন নিজেই আলোটী লইয়া চোখের সামনে ঘুরাইল—"এ যে একেবারেই দেখিতে পায় না, তবে কি এ অন্ধ?"

"জন্ম অন্ধ।"

কাল কাল চোখ দুটী দেখিতে একেবারে নিখুঁত, কিন্তু জগতের কিছুই দেখে নাই এবং দেখিবেও না। "অন্ধ" কথাটি কত ধীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু মায়ের কাণে সে কথাটি যেন বাজের মত পড়িল। সে সকলকে ঠেলিয়া শিশুকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া পাগলিনীর মত তাহার চোখ পানে তাকাইল। হায় শিশু, মায়ের যাতনাভরা চাহনীর প্রতিদানে তুমি কি একবারও তাকাইবে না?

"জন! জন! জন!" ব্যাকুল ভাবে উরসুল্লা ডাকিয়া উঠিল যেন 'জন' তাহাকে নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। জন নীরবে নিকটে গিয়া ব্যথিত উরসুল্লার কাছে দাঁড়াইল। উরসুল্লা একটু সামলাইয়া উঠিলে বলিল "উরসুল্লা, ইহাও তাঁহারি দান আমাদের মঙ্গলের জন্য।"

মিসেস জেসপ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বাছারা, তোমাদেরই বেশী কষ্ট। ও যে শিশু, যা কখনও পাইল না তাহার অভাব কখনও অনুভব করিবে না, ও সুখী হইতে পারিবে। দেখ কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া হাসিতেছে।"

মায়ের মন কিন্তু এত অল্পেতে প্রবোধ মানিল না। নীরবে শিশুকে বুকে লইয়া ঘুরিতে লাগিল ও ঝর ঝর করিয়া চোখ হইতে জল গড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পাছে বাছার ঘুমের ব্যাঘাত হয় ভয়ে চোখের জলও যেন থামিয়া গেল।

কে যেন পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আরাম কেদারায় বসাইয়া দিল। দেখিলাম—বাবা। তিনি নিজেও তাহার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাতটি নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইলেন, বলিলেন,—"উরসুল্লা, মা আমার, শোক করিও না, আমার একটী অন্ধ ছোট ভাই ছিল, কিন্তু তার মত সুখী আমি অতি অল্প লোককেই দেখিয়াছি।"

বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বাবাকে এত ভালবাসাপূর্ণ দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। তিনি আবার বলিলেন,—"একবারটী তোমার খুকুকে আমার কোলে দেওতো মা।" উরসুল্লা মেয়েটীকে তাঁহার কোলে তুলিয়া দিল, তিনি তাহার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "ভগবান্ এই শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন, নিশ্চয়ই তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন।" বাবা কথাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তাদের দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, সেই দৃঢ়তা যেন সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। সেই আশীর্ব্বাদ যেন এর মধ্যেই মিউরিয়েলকে

স্পর্শ করিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন বিশ্বপিতা সেই অসহায় শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছেন।

পিতা উরসুল্লার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আজ তবে আসি, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

জন ও উরসুল্লা যাইতে বাধা দিল না, আমরাও এই সময়ে উভয়কে একলা থাকার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বুঝিলাম।

উরসুল্লা বাবার হাত ধরিয়া বলিল, "আপনি আবার শীঘ্র আসিবেন।"

"হয়তো আসিব। কিন্তু কে বলিতে পারে। স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী হও। জন, উরসুল্লার প্রতি কখনও দৃঢ় ব্যবহার করিও না, উহার দোষ ধরিও না, সে যে ছেলে মানুষ তাহা মনে রাখিবে।" বলিতে বলিতে বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বুঝিলাম অতীতের কাহিনী ভাবিতেছেন।

সমস্ত রাস্তায় বাবা আমার সহিত একবার কি দুবার কথা কহিলেন, সবই আমার ছেলে বেলার কথা। বাবা যে কখন সে কথায় মনোযোগ দিয়াছিলেন কিম্বা তাঁহার যে সে সব কাহিনী মনে থাকিতে পারে তাহা তো একদিনও ভাবি নাই। যখন আমরা বাড়ীর ভিতর পৌছিলাম বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি তোমার কাছে থাকিব?"

"না, না, তোমায় ক্লান্ত দেখাইতেছে তুমি ঘুমা[illegible]ত যাও, আমায় এখন দরকারী চিঠি লিখিতে হইবে।"

আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, বাবা আমাকে আবার ডাকিলেন।

"ফিনিয়স, তোমার কত বয়স হইয়াছে, চব্বিশ না পঁচিশ?"

"পঁচিশ বৎসর বাবা।"

"এত বেশী! তবুও এত ক্ষীণ, ভগবান তোমার সহায় হউন, তোমায় শক্তি দিন, যেন তুমিও তোমার পিতার মত আয়ুষ্মান হও।"

আমি অতি আনন্দের সহিত ঘুমাইতে গেলাম। বাবা যে আমায় এত স্নেহ করিবেন ও আমরা যে উভয়ে এত সুখী হইব তাহা কখনও আমি ভাবি নাই।

মধ্য রাত্রে জেল আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার খাটের নীচে বসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি ছোট বেলার মা বাবার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দশটার সময় জেল সমস্ত বন্ধ করিয়া, প্রত্যহের অভ্যাস অনুসারে বাবাকে ঘুমাইবার সময় হইয়াছে বলিতে আসিল। তিনি কোন উত্তর দিলেন না, মনে হইল দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়া তিনি লেখাতে ব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য সে চলিয়া গেল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে আবার আসিল। দেখিল সেইখানে সেইরূপ ভাবে বসিয়া

আছেন, একটী হাতের উপর মাথা রহিয়াছে, অন্য হাতে কলম, যেন একান্ত মনে লেখা দেখিতেছেন। কাগজে লেখা ছিল ;—

"প্রিয় বন্ধু—

কাল আমি—— "

সেখানে লেখা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়াছে। "কাল" পিতাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। বাবার মৃত্যু দশ বৎসর হইল হইয়াছে। বাবার সৎকারের পর সেই যে জন নিজের বাড়ীতে আনিয়াছে আজও তাহার কাছে তাহার ভাইয়ের মত রহিয়াছি। কিছুদিন পরেই আমরা বুঝিতে পারিলাম চামড়ার কারখানা হইতে কিছুই লাভ হইতেছে না, সুতরাং আমাদের ব্যয় স্বচ্ছলতার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাহা বিক্রি করাই ঠিক হইল, কেবল আটার কল ব্যবসায়ের জন্য রহিয়া গেল।

এই পরিবর্ত্তন যেন বৃদ্ধা জেলের প্রাণে সহিল না, সে মারা গেল এবং তাহাকে বৃদ্ধ পিতা মাতার চরণতলে প্রোথিত করিলাম। সেণ্ট মেরীর লেন আমার সব প্রিয়জনদের বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম, সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না।

জন ও উরসুল্লার প্রাণভরা ডাক "ভাই ঘরে চল" আমার উদাস মনকে যেন ঝাঁকা দিয়া বলিল এখনও ভালবাসার জিনিষ রহিয়াছে।

আমি না যাইবার অনেক ওজর করিলাম, কেন না কোন দম্পতির সহিত থাকিয়া তাঁহাদের সুখে ব্যাঘাত দেওয়া অন্যায় মনে করিতাম।

আমি আমার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব, এবং যদি নেহাৎ কাজ না করিতে পারি তাহা হইলে বাবার সম্পত্তি দিয়া কোন প্রকারে খরচ চালাইয়া লইব ভাবিলাম। কিন্তু জন কিছুতেই আমার কথা শুনিল না। উরসুল্লা বসিয়া শেলাই করিতেছিল, মেয়েটী তার কোলে শুইয়া হরবোলার মত কত কি শব্দ করিতেছিল, সে মিউরিয়েলের হাত আমার হাতের উপর রাখিয়া বলিল, "ফিনিয়স, দেখ মিউরিয়েলও তোমায় চায়।" আমিও রহিয়া গেলাম।

হয়তো এই জন্য পৃথিবীতে, কেবল জন ছাড়া, অন্ধ মিউরিয়লকে সকল অপেক্ষা ভালবাসিতাম। জনের গৃহ এখন শিশুর কোলাহলে পরিপূর্ণ। অন্ধকার বাড়ীটী এবং বাগানটি এখন শিশুর কলরবে ভরপুর। মিউরিয়েলের এক বৎসর পরেই

বাচাল গুইয়ের জন্ম হইয়াছিল। সে তার মার মত দেখিতে এবং মায়ের আব্দারে ছেলে তাহার পিঠে আর দুটী ছেলে এডবিন ও ওয়ালটার হইয়াছে। কিন্তু মিউরিয়েলই একমাত্র "বোন্", আর "বোন্" কেহ চায় নাই, সকলেই "একমাত্র অন্ধ বোন্" থাকাতে খুব সুখী।

আমাকে যদি নাম দিয়া সেই বালিকার ব্যাখ্যান কেহ করিতে বলিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে তার মার দেওয়া "জয় (আনন্দ) নামে না ডাকিয়া 'শান্তি" বলিয়া ডাকিতাম। বালিকা যেন শান্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

সে ধীরে ধীরে চলিত, নরম সুরে কথা কহিত—আর তাহার ছোট্ট মুখখানি কি আশ্চর্য্য স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল। কি বেড়াইবার সময়, কি চুপ করিয়া বাবার কাছে বসিয়া সেলাই করিবার সময়, কি গল্প শুনিবার সময় সকল অবস্থাতেই মিউরিয়েলের সেই একই ছবি। কেহ তাহাকে কখন রাগিতে কিম্বা চঞ্চল ও অসুখী হইতে দেখে নাই। সে যে শান্তিরাজ্যে বাস করিত সেখানে যেন সংগ্রামপূর্ণ পৃথিবীর কোলাহল পৌঁছিত না।

বলিয়াছি ছেলেবেলা হইতেই মিউরিয়েল শান্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিল। জন এক এক দিন খাটিয়া খুটিয়া ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া যখন গৃহে ফিরিত, মিউরিয়েল তাহার শান্ত মূর্ত্তিখানি লইয়া তাহার নিকট আসিলেই জনের সকল অবসাদ, সকল বিরক্তি দূর হইয়া যাইত। উরসুল্লা সমস্ত দিন সংসারে খাটিয়া খুটিয়া কিসে জনকে সকল সাংসারিক চিন্তা হইতে দূরে রাখিবে ভাবিয়া ভাবিয়া সময় সময় সংসার সংগ্রামে পড়িয়া একটু বিরক্ত হইয়া উঠিত, সেই সময় মিউরিয়েল একবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেই একেবারে শান্ত হইয়া যাইত। অন্ধ বালিকাটী কাছে থাকিলে কাহারও কর্কশ ও রূঢ় হইবার যেন সুযোগ থাকিত না।

"মেয়েটী অন্ধ" বলিয়া দুঃখ করিলে আমার মনে হয় জন ও উরসুল্লার আশ্চর্য্য মনে হইত। যখন তাহারা দেখিল শিশু অঙ্গহীনের অভাব মনে করে না, তার জীবন পরম পিতার আশীর্ব্বাদে যেন রক্ষিত তখন তাহাদের আর কোন দুঃখ রহিল না। তাহার জন্য পিতা মাতাকে কোন কষ্টই কখন সহ্য করিতে হয় নাই। অন্য ছেলে মেয়েরা কতবার কত রোগে ভুগিয়াছে, কিন্তু মিউরিয়েল কখনও কোন রোগে ভোগে নাই।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ আমরা অনেক দিন মনে রাখিব ঘরে সকলেরই জ্বর আরম্ভ হইল, দেবতার কৃপায় ওয়ালটার প্রায় মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। যখন সকলেই বেশ আরোগ্য হইল, একদিন বিকালে বাগানে সকলে বনভোজন করিবার জন্য একত্র হইলাম।

জন উরসুল্লার হাসিভরা মুখের—যে হাসি সুখে দুঃখে সমভাবে মুখে বিরাজ

করিত—দিকে তাকাইয়া বলিল, "এবার আমরা তোমাকে কিছুদিনের জন্য ছুটী দিব।"

যত সব অনাসৃষ্টি! আমার হয়েছে কি? আচ্ছা ফিনিয়স, তুমিই বল, "আমাকে কি ত্রিশ বৎসরের ও একঘর ছেলের মা বলিয়া মনে হয়?"

"তুমি যাই বল, অন্ততঃ ছেলেদের খাতিরে আমরা ছুটীতে লংফিল্ড যাইবই।"

লংফিল্ডের ছোট্ট বাগানবাড়ীটিই আমাদের সকলের কাছে নন্দন কাননের সমান ছিল। আমাদের ঘরটী বেশ সুন্দর হইলেও সহরের ভিতর হাওয়ায় ছেলেরা যেন একটু খোলা বাতাস পাইবার জন্য ব্যাকুল হইত। লংফিল্ডে যাবার কথা শুনিয়া সব ছেলেরা যেন একেবারে আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল।

গুই লাফাইতে লাফাইতে বলিল, "আমি নৌকা চালাইব, আর যতগুলি ঘোড়া আছে সব গুলির উপর চড়িব।"

কার্য্যপ্রিয় সুশীল এডবিন বলিল, "আমি হাঁস মুরগী রক্ষণাবেক্ষণ করিব, আর শস্য কাটাবার ভার লইব।"

ছোট খোকা ওয়ালটার আধ আধ মিষ্ট স্বরে বলিল, "আল আমি খেলবার জন্য একতা ভেলা খুঁজে বাল কলবো।"

জন মিউরিয়েলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমার ছোট্ট মেয়েটী কি করিবে?"

"মিউরিয়েল্ সমস্ত দিন বসে বসে পাখীর গান শুনবে।"

"আমার 'আশীর্ব্বাদ' তাই করিতে পাইবে।" জন অনেক সময় আদর করিয়া মিউরিয়েলকে 'আশীর্ব্বাদ' বলিয়া ডাকিত। সত্যসত্যই সে জন হ্যালিফাক্সের জীবনের আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইয়াছিল। তাহার ছোট্ট মুখখানি সে যখন বাপের মুখের কাছে আনিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে জনের ছোট্ট প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই লাগিত না, যেন জনের ভিতকার সকল ভাল গুণগুলি সেই ছোট্ট মুখখানিতে মাখান ছিল। উভয়কে দেখিলে সাধারণ পিতা ও কন্যা মনে হইত না, মিউরিয়েলকে জনের দূত বলিয়া মনে হইত। মিউরিয়েল জনের আদরের প্রথম কন্যা—চিরদিনের জন্য জনের কাছে দূতস্বরূপ হইয়াছিল।

লংফিল্ড যাওয়া ঠিক হইলে আমরা তিন্ জনে সমস্ত আয়োজনের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলাম; কি কি জিনিষ অতি আবশ্যকীয়, কোন গুলি না হইলে চলে, কোন্ কোন্ বৃথা আড়ম্বর কমাইয়া দিলে আমরা প্রতিবৎসর ছেলেদের লংফিল্ডে লইয়া যাইতে পারিব এই সব আলোচনা হইতে লাগিল। ঘর সংসারের কথাবার্ত্তা আমাদের বিরলে করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। জন ও উরসুলার সময় সময় মতের পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের সুখ ও শান্তি, সেজন্য প্রথম

অবস্থায় অতি দরিদ্রতার ভিতরও কোন কষ্ট হয় নাই, জীবনের সে অংশ অতি সুখের ভিতরই কাটিয়া গিয়াছিল। এক উদ্দেশ্য আমাদের সকলকে দৃঢ় করিয়া পরস্পরের সহিত বাঁধিয়াছিল; ইহা আমাদের সহিষ্ণু, স্বাবলম্বনপ্রিয় ও আত্মত্যাগী করিয়াছিল। আমার মনে হয় যৌবনে দুঃখ দরিদ্রতার অভিজ্ঞতা হইলে সমস্ত জীবনে একটা মহা লাভ হয়, ইহার পর জীবনপথে চলা সহজ হইয়া যায়।

উরসুল্লা দুইটী চাকরের স্থলে একটীতে কাজ চালাইয়া লইবে বলিল, এবং মনে মনে স্থির করিল তার সাধের সিল্কের গাউন করিবে না। বলিল, "আমার সাধ হয় আমরা সর্ব্বদা গ্রামে থাকি।"

জন উরসুল্লার দিকে তাকাইয়া—যেন সে তাহার সকল সাধ পূর্ণ করিতে পারিলে সুখী হয়—বলিল, "তোমার কি তাই সাধ? হয়তো কোন দিন তোমার সাধ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।"

"যখন বার্থউড আমাদের প্রাপ্য টাকা দিবেন তখন? হয়তো যে সময় আমরা টাকা পাইবার কোন আশাই করিব না, সেই সময় টাকা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তোমার সাধের কাপড়ের কলও এনডারলীতে খুলিতে পারিবে।"

জন বিষাদ হাসি হাসিল। প্রত্যেক লোকেরই এক একটী প্রিয় সাধ থাকে, পনের বৎসর ধরিয়া জন এই সাধ মনে পুষিতেছিল। কেবল যে লাভের আশায় ইহা করিবার সাধ ছিল তাহা নয়, লাভ হইবে ইহা তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের ভাল করিবার সুযোগ পাইবে ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

জন বলিল, "দেশের হবিাভবিা একজন হওয়া আমার মত লোকের কপালে বড়ই শক্ত।"

"কেন এখনই তো সকলে তোমায় কত মান্য করে। কাল রাত্রে ফিনিয়স, তুমি যদি মিটিংএ থাকিতে, যখন লুভাইটমদের ফাঁসি দেওয়ার বিরুদ্ধে বলিতেছিলেন, তখন সভা এত নিস্তব্ধভাবে শুনিতেছিল যে একটী পিন পড়িলেও শোনা যাইত। আমার বড় গৌরব অনুভব হইয়াছিল।"

"কিসে? করতালি ও চিৎকার শুনিয়া?"

"একটুও না। আমার স্বামী দরিদ্রদের হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, সকলে তাঁহাকে কত ভালবাসে ইহা দেখিয়াই আমার আনন্দ হইয়াছিল।"

ফিনিয়স। "ইহার মধ্যেই জন একজন হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ায় কোন গোলমাল হইলে ধনী কি দরিদ্র আদালতে না গিয়া মীমাংসা ও পরামর্শের জন্য জনের কাছে আসিয়া থাকে। কত ঝগড়ার মীমাংসা করিয়া কত গৃহে জন শান্তি আনিয়া দিয়াছে।"

জন কেবলমাত্র একটু হাসিল। সে নিজ সম্বন্ধে কখনও কিছু বলিত না। তাহার

জীবনের প্রধান মাহাত্ম্য ছিল যে সে নিজের মাহাত্ম্য নিজে উপলব্ধি করিত না। নদী হাজার গভীর ও প্রশস্ত হইলেও যেমন সহজ স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া চলে সেও সেইরূপ চলিয়াছিল।

হঠাৎ জন কান খাড়া করিয়া বলিল, "শোন শোন মিউরিয়েল গান করিতেছে।" প্রায়ই মেয়েটী গোলমালের ভিতর হইতে পলাইয়া গিয়া বাজনা বাজাইয়া একলা বসিয়া গান গাইত।

জন। "মিউরিয়েল কি সুন্দর বাজায়, আমার ইচ্ছা করে তাহাকে একটী পিয়ানো কিনিয়া দি।"

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয় পিয়ানো অপেক্ষা অরগান সে বেশী পছন্দ করিবে, সেদিন মন্দিরে যদি তাহার চেহারা দেখিতে।"

"ঐ শোন বাজনা বন্ধ হইল। গুই দৌড়িয়া গিয়া তোমার দিদিকে লইয়া আইস।"

কিছুক্ষণ পরে গুই দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল, "বসবার ঘরে দুজন খুব বড়লোক আসিয়াছেন, একজন আমার মাথায় হাত দিয়া কত আদর করিলেন।"

গুইর মা বাবা হলঘরে গিয়া ভদ্রলোকদিগকে অভিবাদন করিলেন।

একটী ভদ্রলোক বলিলেন, "মিসেস হ্যালিফ্যাক্স, তোমায় কতদিন দেখি নাই, তুমি আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, না?"

"না, লর্ড লাক্সমোর, আসুন আমার স্বামীর সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দি।" উরসুল্লা খুব আত্মসম্মানের সহিত নিজ স্বামীর সহিত আলাপ করাইয়া দিতে অগ্রসর হইল। লর্ড লাক্সমোর তাহার ভাব দেখিয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কেন না স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাঁর মত বড়লোকের পদার্পণে যে কৃতার্থ হইয়াছেন এ ভাব একটুও প্রকাশ করিলেন না—কিন্তু বাহিরের ব্যবহারে লর্ড লাক্সমোর চিরকালই খুব ভদ্র, তাই তিনি নিজেই সকলের দূরত্ব ভাবটা দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

"মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, অনেকদিন হইতেই আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল, এবার উরসুল্লার সাহায্যে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

উরসুল্লাও এবার "মিসেস লেডী বার্থউড কেমন আছেন" ইত্যাদি সংবাদ নিতে আরম্ভ করিল।

লর্ড লাক্সমোর—"এই যে আমার ছেলে রেবনেলের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" আঠার বৎসরের ছেলেটী অগ্রসর হইয়া প্রতিনমস্কার করিল। অতি অল্পক্ষণ পরে বাগানে গিয়া ঢুকিল, আর মিউরিয়েলের সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

লাক্সমোর—"উরসুল্লা, তুমি রেবনেলকে অনেক দিন আগে দেখিয়াছিলে, না?

উহার দিদি উহাকে ছেলে বেলায় ভয়ানক আদর দিতেন, রেবনেল সম্প্রতি সেন্টওমার কলেজ হইতে পড়া শেষ করিয়া বাহির হইয়াছে।”

রেবনেল ভুল শুধরাইয়া বলিল. “সেণ্টওমার কাথলিক্ কলেজ হইতে।” লাক্সমোর তাড়াতাড়ী কথা চাপা দিয়া বলিলেন, “কাথলিক্ কি প্রটেস্‌টেণ্ট তা নিয়ে কি হবে? মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স. আমরা কেহই এখন কাথলিক নই, আশা হয় লাক্সমোরের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্বাধীনতা পান বা না পান নিজেকে প্রটেস্‌টেণ্ট বলিয়া জনসাধারণের কাছে স্বীকার করিবেন। ভাল কথা বিল সম্বন্ধে আপনার মত কি?”

জন বলিল “আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলকেই নিজ বিবেক অনুসারে চলিতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং সকল সচ্চরিত্র লোকদিগের—তাহার ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন রক্ষা করাই ষ্টেটের কর্ত্তব্য।”

“মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনার মতের সহিত আমার মত খুব মেলে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে সকল ধর্ম্মমতই একটা বৃথা আড়ম্বর।”

জন—“মহাশয়, আপনি যদি আমার মত এই বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। আমি সকলের ধর্ম্মমতকেই খুব শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাহাতে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করা কিম্বা প্রশ্ন করা অন্যায় মনে করি। আমরা প্রতিজন উহার সম্বন্ধে ভগবানের কাছে দায়ী।”

লর্ড লাক্সমোর—“সত্যি উরসুল্লা, তোমার স্বামীর কথা বলিবার খুব একটা শক্তি আছে, আমি শুনিয়াছি তিনি একজন বিখ্যাত বক্তা।”

উরসুল্লা হাসিল, কিন্তু জন তাড়াতাড়ী বলিয়া উঠিল “না, আমার বক্তা হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, তবে সময়ে সময়ে যা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহা সহজ ভাষায় সাধারণের নিকট ধরিতে চেষ্টা করি মাত্র।”

লর্ড লাক্সমোর—“এই যা বলিয়াছ, সাধারণের তো বুদ্ধি সুদ্ধি ভেড়াবৎ, তাদের চালিয়ে নিয়ে যাবার লোক চাই, আমরা লর্ডরাই হইলাম তাহাদের চালক; তবে মাঝে মাঝে একজন মধ্যবিৎ পরিবারের বক্তারও, এই যেমন তুমি, প্রয়োজন হয়: যাক্ এ সব গভীর কথা এখন থাক, এখন ছুটো সংসারের কথা বলিতে চাই। আমার ইচ্ছা জন, তুমি এনডারলী মিলের ভার লও, তুমি আমার প্রজা স্বরূপ থাকিবে।”

জন—“অসম্ভব, ও সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা না বলাই ভাল।”

লর্ড লাক্সমোর—“কেন অসম্ভব, তা কি আমার জানিবার অধিকার নাই? আমি তোমাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।”

জন—“না ইহাতে আমাদের লুকাইবার তো কিছু নাই, আমি মিলের ভার লইতে পারি না, কারণ আমার কাছে টাকা নাই।

লর্ড লাক্সমোর—“আমায় ক্ষমা করো, কিন্তু আমি খুব ভাল করিয়া জানি মিষ্টার মার্চ তাঁর মেয়ের—তোমার স্ত্রীর জন্ত অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।”

উরস্থলা আর স্থির থাকিতে পারিল না। “স্ত্রীর টাকা কি স্ত্রীর একটী কড়িও আমার স্বামী পান নাই, রিচার্ড বার্থউড তাহা দেন নাই, এবং স্বামীও আদালতে গিয়া টাকা আনা অপেক্ষা দিনরাত মুখের রক্ত তুলিয়া স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের ভরণ-পোষণের জন্ত উপার্জ্জন করা ভাল বিবেচনায় তাহাই করিতেছেন।”

“তুমিও কি জনের মতে মত দাও?”

“নিশ্চয়ই। আমি চিরকাল গরীব থাকিতেও সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার স্বামী টাকার জন্ত আদালতে খেঁচাখেঁচী করিয়া শরীর ও মন উভয় নষ্ট করেন ইহা আমি চাই না।”

জন এই সময় ধীর ভাবে বলিল, “আমাদের সম্বন্ধে কথা না বলিয়া অন্ত কিছু কথা বলিলে হইত না?”

লর্ড লাক্সমোর যেন একটু চিন্তিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “না, না, বিষয় বদলাইবার প্রয়োজন নাই, এই সংবাদ যদি সংবাদ পত্র লেখকেরা জানিতে পারে তাহা হইলেই একটা বিভ্রাট ঘটিবে; এই সম্বন্ধে বার্থউডের সঙ্গে আমার একটু কথাবার্ত্তা দরকার।”

লর্ড লাক্সমোর থামিলেই জন অন্য কথা আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তিনি বিদায় লইলেন।

জন অনেক রাত্রে কাজ করিয়া ফিরিল। সংসারের অনেক বোঝা থাকিলেও জন বাড়ী আসিলেই উরস্থলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত, জনও যেন জীবনের সকল সংগ্রাম ভুলিয়া যাইত। সে ধীরে ধীরে আগুনের পাশে আসিয়া বসিল।

উরস্থলা—“তোমার একটী দুর্ব্বলতা আছে, সেটা কি জান? সেটা বেশী আগুনের সেক ভালবাসা।”

জন—“না খাইয়া মরিতে পারি, কিন্তু ঠাণ্ডা সহ্ করিতে পারি না। ছেলে মেয়েরা শুইয়াছে?”

“হাঁ এই মাত্র। লংফিল্ডে যাওয়া হইবে বলিয়া তাহাদের কত স্ফূর্ত্তি। আমি তো ভাবিয়াছিলাম আজ সমস্ত রাত জাগিবে।”

“তোমার কি বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে?”

“একটু।”

“সমস্ত দিন খুব খাটিতে হইয়াছে?”

“হাঁ।”

“আমি ও উরস্থলা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম জন খুব ক্লান্ত হইয়াছে। আমি আস্তে আস্তে আরাম কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া গেলাম। জন খালি কেদারা পাইয়া

তাহাতে হাত পা ছাড়াইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার চেহারায় কি এক চিন্তা রেখা পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সে উরসুল্লার হাতের সেলাই লইয়া বসিল।"

"তোমার কোট সেলাইয়ের কি অন্ত নেই? সব সময়ই তোমায় সেলাই করিতে দেখি।"

"আমাদের সেলাই করিতেই হয়। ছোট ছেলেদের কাপড় চোপড় শীঘ্র শীঘ্র ছোট হইয়া যায়, সেলাই করিতে তো খুব ভাল লাগে; কিন্তু কাপড়গুলি একটু দেরীতে ছিঁড়িলেই ভাল হয়।"

জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

উরসুল্লা তাড়াতাড়ী বলিল, "আমি কিন্তু হারবার মেয়ে নই। আচ্ছা দেখ তো এ কাজটা কেমন সুন্দর, এ কাজটা এবার বন্ধ করিতে হইবে, কারণ লংফিল্ডে গেলে এ সব সৌখিন জিনিষ করিবার সময় হইবে না।"

জন সেলাই হাতে করিয়া দেখিয়া রাখিয়া দিল। তারপর বলিল, "উরসুল্লা, আমাদের যদি লংফিল্ডে যাওয়া না হয়, তাহা হইলে কি তোমার খুব কষ্ট হইবে?"

"লংফিল্ডে যাওয়া হইবে না!" উরসুল্লার গলার স্বরেই বোঝা গেল তার মনে কতটা লাগিল।

"হাঁ, খরচে কিছুতেই কুলাইয়া উঠিবে না। তুমি কি খুব নিরাশ হইলে?"

"হাঁ, ছেলেদের উৎসাহের কথা মনে হইলে যাওয়া হইবে না ভাবিতেও কষ্ট হয়।"

উরসুল্লা যতক্ষণ সামলাইয়া না উঠিল খুব মনোযোগের সহিত সেলাই করিতে লাগিল, তারপর সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনের বোঝার ভাগটা কি আমায় একটু দেবে না? ছেলেদের জন্য কোন দুঃখ নাই, তুমি আমায় সমস্ত কথা বলো।"

জন তাহার ব্যবসায়ে যে লোকসান হইয়াছে ও ধার হইয়াছে তাহা বলিল। এ অবস্থায় তাহাদের খরচ না বাড়াইয়া কমানই উচিত তাহাও বলিল। উরসুল্লা নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আর কিছু বলিবার নাই?"

জন—"না"।

উরসুল্লা—"আমাদের লংফিল্ডে যাওয়া নাই বা হইল, এখানে তো আমোদ করিবার অনেক জিনিষ আছে।"

জন যাইবার সময় আমায় জানাইল "লংফিল্ডে যাইবার স্বপ্ন চূর্ণ হইয়াছে।" সেদিন জনকে পীড়িতের মত দেখাইতেছিল। উরসুল্লা এ সময়ে বুদ্ধিমানের মত নীরবে সেলাই করিতে থাকিল। কিছুক্ষণ পরে জন ঘুমাইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে উরসুল্লার চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল। ইহা দুঃখের ক্রন্দন নয়,

আনন্দের ক্রন্দন। জনের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের মা হইয়া সেবা করিবার অধিকার ভগবান দিয়াছেন বলিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিল।

হঠাৎ হল ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া সকলকে জাগাইয়া দিল। জন নামিয়া গেল, যখন উরসুল্লা নীচে গেল, দেখিল জন চিঠি পড়িতেছে, সে উরসুল্লাকে নীরবে চিঠিখানি ধরাইয়া দিল। সত্যই ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা। চিঠিখানি এই ;—

"মিষ্টার জন হ্যালিফ্যাক্স,

মহাশয়!

আপনার স্ত্রী পূর্ণবয়স্ক হওয়াতে আমি মিষ্টার মার্চ্চের উইলমত আগামী মাসে তাহার সকল টাকা সুদ সমেত পাঠাইয়া দিব।

রিচার্ড বার্থউড।"

উরসুল্লা পড়া শেষ হইলেই বলিয়া উঠিল, "তোমাকে আর মুখের রক্ত তুলিয়া খাটিতে হইবে না।"

জন —"ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমাকে ও ছেলে মেয়েদের রক্ষা করিলেন।" যখন আমি ঘরে ঢুকিলাম উরসুল্লা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ফিনিয়স, তোমার ভাইটী এখন বড়লোক হইয়াছেন, সামলে কথা বোলো।"

জন—"হা তোমার বোন এখন সিল্কের গাউন পরিয়া ঘুরিবেন, কেমন সুন্দর দেখাইবে।"

"যিনি এত বড় পরিবারের পিতা, এত বড় একজন ব্যবসাদার, তাঁহার এ রকম ছেলেমানুষি করিতে লজ্জা করে না?"

আমরা অনেকক্ষণ আগুনের পাশে বসিয়া গল্প গুজব করিলাম। জন ও উরসুল্লা উভয়েই, তাহাদের যা কিছু সব আমারও নিজের, এ ভাবটা আমার মনে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

উরসুল্লা যখন উঠিল জন দুষ্টুমী করিয়া ডাকিয়া বলিল, "মিসেস হ্যালিফ্যাক্স, আপনার সিল্কের গাউন কবে অর্ডার দিতে হইবে?"

(ক্রমশঃ)

রূপের খনি।

আজি চারিদিকে ফুটেছে কি চারু
শারদ শশীর রূপ!
গিয়াছে পালায়ে বিশ্ব ছাড়িয়া
ঘন আঁধারের স্তূপ।

নাহি কোনখানে পাপ মলিনতা,
নাহি আঁধারের লেশ ;
স্থল ধরণী পরেছে যেন বা
পূত বিধবার বেশ।
সুনীল বসনে আবরিয়া তনু
বাড়ায়ে বদন খানি,
আকুল নয়নে ধরণীর পানে
খুঁজিছে কারে না জানি।
এমন মধুর স্নিগ্ধ রূপের
জ্যোতির বিমলচ্ছায়—
লভিয়া বিশ্ব মুগ্ধ বিবশা
তাহারে লভিতে চায়।
এই রূপ লাগি সারা সংসার
মত্ত হইয়া ফিরে ;
নাহি মানে বাধা যদি অহরহ
বিপদেও তারে ঘিরে।
মত্ত পাপিয়া ফিরে অনুদিন
রূপসুধা করি পান,
দূর হতে শুধু নয়নে হেরিয়া
তৃপ্ত তাহার প্রাণ।
মত্ত ভ্রমর কমলিনী পাশে
ফিরে গুণ গুণ রবে,
রূপেতে বিভোর মধু পান তরে
হারায় জীবন তবে।
মানবেরো প্রাণে রয়েছে নিহিত
রূপের প্রবল তৃষা,
ধ্যান ধারণায় কত মহাজন
কাটায়েছে দিবা নিশা।
শুধু কোন্ এক অনন্ত রূপের
অজ্ঞাত মুরতি লাগি,
কাটায়েছে কত ঋষি মহাযোগী
মধুর যামিনী জাগি।

যে দিয়েছে রূপ শারদ শশীরে
সুন্দর মোহন সাজে,
যে দিয়েছে রূপ নদী জলধির
ফেনিল তরঙ্গ মাঝে,
যে দিয়েছে রূপ গগন-গবাক্ষে
সুনীল বসনে ঢাকি,
যে দিয়েছে রূপ ধরণীর অঙ্গে
বৃক্ষ লতা তৃণ আঁকি,
যে দিয়েছে রূপ পদ্মের কোরকে
সিরাজি গোলাপ ফুলে,
যে দিয়েছে রূপ পাপিয়া কোকিলে
মধু-মত্ত অলি-কুলে,
যে রূপের ছবি ভাতিছে সতত
সরল শিশুর মুখে,
যে রূপের ছবি রয়েছে নিহিত
ফুলের কোমল বুকে,
যে রূপের লাগি অন্ধ জগত
অধীর উন্মত্ত চিত,
জগতের প্রতি বস্তুর মাঝে
সে রূপ প্রতিফলিত।
আছে মানবের হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত রূপের খনি,
তারি প্রতিরূপে দেখিলে বুঝিবে
কি সুন্দর এ অবনী॥

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

জন্মদিনে নিবেদন।

প্রথম যেদিন মায়ের কোলেতে দেছিলে জনম মম।
অতি ক্ষুদ্র এক কি সৌরভময় শুভ্র যূথিকার সম॥
দিনে দিনে কত বরষ গিয়েছে আবার এসেছে আজ।
কতকাল ধরে আসিবে এমনি জানি না হে মহারাজ!

তোমার বিশাল এ বিশ্বের বুকে কত কত যুগ আগে।
তোমারি বুকেতে এ ছোট হৃদয় ভরে দিয়ে অনুরাগে—
ও সুন্দর করে ও পবিত্র করে জনম দিয়েছ মম,
শুভ কি অশুভ জনম আমার জানি না হে প্রিয়তম !
জনম অবধি পিতামাতা কোলে কত প্রেমে কত স্নেহে।
ভাই ভগিনীর প্রীতির মাঝারে সেই মধুময় গেহে॥
হাসিয়া খেলিয়া কাটিয়াছে মোর কত শত দিবা নিশি।
প্রতি সন্ধ্যাকালে মার স্নেহক্রোড়ে ভাই বোনে মিলিমিশি॥
কতই অপূর্ব্ব রাজা ও রাণীর গল্প শোনার যে সুখ।
সুয়ো দুয়ো রাণীর সুখ ও দুঃখে ভরিয়া উঠিত বুক॥
রাতের বেলায় আকাশের গায় কত শত উঠে তারা।
সবে মিলে তারা গুণিয়া গুণিয়া হইতাম আত্মহারা॥
নিদ্রাদেবীর শান্তিময় বক্ষে অসীম সুখের সাথে।
ভাই বোনে মিলি একত্রে মিশিয়া ঘুমাতাম প্রতি রাতে॥
প্রভাতে আবার ফুলের বাগানে ছুটাছুটি কত খেলা।
পাখী প্রজাপতি মধু লুটে পড়ে কত যে আনন্দ মেলা॥
কত যে বন্ধুর প্রীতির বাঁধন ঘিরেছিল শত ডোরে।
দিয়েছ কতই আনন্দের রাশি শৈশব জীবন ভোরে॥
তাহার পরেতে দেখালে তুমি যে মধ্যাহ্ন জীবন বেলা।
সুখ ও দুঃখের ছোট বড় কত নব ও বিচিত্র খেলা॥
পিতার মাতার বুকের স্নেহের নিকট হইতে মোরে।
নিয়ে এলে কত অজানার পথে চির জীবনের তরে॥
নূতনের মাঝে দিলে পিতা তুমি কত প্রিয় ভাই বোন।
ছোট হিয়া সাথে বাঁধিলে তুমি যে কি স্নেহপ্রেম বন্ধন॥
জানাইলে তুমি কত আপনার সুখের পরশ দিয়ে।
আপন বক্ষেতে নিলে যে আমায় দুঃখের মাঝারে নিয়ে॥
হয়নি এখন জীবন গঠন তাই বুঝি আরো চাও।
বিচিত্র তোমার প্রেমের মাঝারে নিয়ে যাও মোরে যাও॥
দিনের পরেতে কেটে যায় দিন বরষ আসিছে ঘুরে।
তোমার রাগিণী বাজাও নিত্য এ জীবন-বীণার সুরে॥
মনে পড়ে আজ কতকাল আগে এসেছি হে রাজরাজ !
কর্ম্মময় এই জগতের মাঝে করি নাই কোন কাজ॥

কত বন্ধু কত প্রিয়জন প্রতি করেছি যে কত দোষ।
বিনা কারণেও কত শত বার করিয়াছি মিছা রোষ ॥
প্রতিদিন কত অপরাধভার করিয়াছি শুধু জমা।
জানি পিতা, নাহি নাহি এ জগতে একটুও তার ক্ষমা ॥
যত কিছু মনে আছে পাপ দোষ আজিকে তাহার লাগি।
তোমারি চরণে কাতর পরাণে পিতা, আমি ক্ষমা মাগি ॥
তোমার প্রেমের মূরতি আঁকিয়া অন্তরেতে মোর দাও।
ছোট জীবনের যত কিছু ভার প্রভু, তুমি তুলে নাও ॥
প্রতি দিবসের জীবনের কাজে বাড়িবে তোমারি সুর।
পবিত্র তোমারি প্রেমে ও পুণ্যেতে করো হিয়া ভরপূর ॥
ছোট বলে যেন নিজেরে কখন না করিব অবহেলা।
ছোটর মাঝেতে খেলিছ যে তুমি কতই মধুর খেলা ॥
ছোট হৃদয়ের ভকতি ও প্রেম স্নেহ ভালবাসা রাশি।
সুখের দুঃখের পরশ যা কিছু মোর এ ক্রন্দন হাসি ॥
সার্থক হইবে পরশে তোমার রাতুল চরণ তল।
দুর্ব্বল হৃদয় পাবে প্রতিদিন নব আশা নব বল ॥
যা কিছু পেয়েছি, পাইনি, সকলি তোমারি মাঝারে আছে।
যা কিছু রয়েছে, গিয়াছে, সকলি তোমাতেই রহিয়াছে ॥
মম অন্তরের যা কিছু দুঃখ অভাব বেদনা রাশি।
তোমার ঐ পুণ্য জ্যোতির পরশে প্রভু, আজ দাও নাশি ॥
সকল বিশ্বেরে আপনার করি বুকেতে টানিয়া লব।
বজ্র আঘাতে আসিবে যা কিছু আনন্দে সকলি সব ॥
তোমার হাতের বেদনার দান প্রতিদিন নব নব।
নত হয়ে ওই চরণের তলে বুক পেতে তুলে লব ॥
এত যে আনন্দ, এত সুখরাশি দিয়েছ জীবন ভরে।
ভকতি প্রণতি ছোট হৃদয়ের লুটায় চরণোপরে ॥
পিতা, আজি শুধু এই চাই তব চরণতলেতে আমি।
ভকতির চক্ষে ছোট এই বক্ষে হেরিব তোমায় স্বামী ॥
মনের যা কিছু অশান্তি ও ব্যথা মুছে দাও ওগো দাও।
আমার যা কিছু রেখেছি লুকায়ে কেড়ে নাও প্রভু, নাও ॥

কি—

নিবেদন।

প্রভু !

তুমি আপনার স্নেহছায়া দিয়া,
নিয়ে যাও মোরে প্রেম-নন্দন-কাননে,
যেথায় নির্ঝর ঝরে শীতল করিয়া ;
নিকুঞ্জের গীতধ্বনি পশিছে গগনে।

তোমার সঙ্গীতসুর কণ্ঠে মোর দিও,
তোমার প্রেমের ভাষা শিখায়ো যতনে,
কুসুম বিছান পথে মোরে তুমি নিও ;
আপনার ছায়া খানি দিও মোর মনে।

শ্রীমতী কিরণপ্রভা দে।
রৈবতক, দেওঘর।

আবেদন।

যাহা কিছু দিয়ে সংসারে তুমি
পাঠায়েছ মোরে আজ,
তার চেয়ে কিছু বেশী চাহিনাকো
ওগো প্রিয় হৃদিরাজ !

ছিন্ন কর গো মোহ-বন্ধন,
দূর করে দাও দুঃখ-ক্রন্দন ;

স্নেহ-রশ্মিতে অন্তর-ঘর
মণ্ডিত কর আজ।

পুণ্য প্রেমের আলো সম্পাতে
আঁখি দুটী কর ঘোর,
তোমার গরিমা প্রদীপ জ্বালাক
অন্তর কোণে মোর।

নিভাইয়া দিয়া বাসনার আলো,
তব গৌরব দীপ খানি জ্বালো ;

ছিঁড়ে ফেলে দাও স্বার্থ-মগন
শত আকাঙ্ক্ষার ডোর।

পুষ্পিত কর মর্ম্মের মাঝে
শুভ্র সরল হাসি,
চরণে তোমার লুণ্ঠিত হোক
তুচ্ছ কামনা রাশি।
ত্যাগের পুষ্পে সহিত হিয়া
অর্ঘ্য সঁপেছি তোমারি লাগিয়া,
নব গরিমার দীপ্তিতে তাহা
আজিকে উঠুক ভাসি।
নির্ম্মল কর অন্তর খানি
স্নিগ্ধ শিশির সম,
পুষ্পের মত কর সুরভিত
সুন্দর নিরুপম;
অরুণ আলোকে আশ্বাস বাণী,
মুখরিয়া মোর ছোট হিয়া খানি,
পুণ্য প্রভায় মণ্ডিত করি,
তুলুক হে প্রিয়তম॥

শ্রীমতী কিরণপ্রভা দে।
রৈবতক, দেওঘর।

প্রধান সম্বল।

("ভারত-মহিলা" হইতে উদ্ধৃত।)

এদেশের শিক্ষিত নরনারী মাত্রেই জেরিমি বেন্থামের নাম জানেন। ইনি হিত-বাদের প্রবর্ত্তক। জনষ্টুয়ার্ট মিল্ প্রভৃতি বহু জগৎ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি এই মতের অনুগত হ'য়ে ছিলেন। হিতবাদ মানে, যাতে সবচেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে বেশী হিত হয়, তাই মানুষের কর্ত্তব্য। বেন্থাম একজন মহা প্রেমিক লোক ছিলেন। এই বংশে কুমারী এথেল বেন্থাম জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ডাক্তার—এম্. বি, এম্, ডি. বি, এস্। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু-চিকিৎসায় ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। ইংলাণ্ডে এঁর খুব নাম। এখন ইনি উত্তর কেন্‌সিংটনের শিশু-হাসপাতালের অধ্যক্ষ। এই হাসপাতাল পরলোকগত শ্রীমতী মেরী মিড্‌ল্টন এবং শ্রীমতী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডো-ন্যাণ্ডের স্মৃতি রক্ষার জন্য "মহিলা-শ্রমজীবি-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মিসেস্ ম্যাক্‌ডোন্যাণ্ড্ নারীদের কাজের আদর্শ সম্বন্ধে একবার ব'লেছিলেন—

"আমরা নারী, আমরা জগৎটাকে এমন ক'রে তুল্‌বো, যে এ জগতে কোন শিশু যত্নের অভাবে প্রাণ হারাবে না। এই আমাদের কাজের লক্ষ্য।"

আমরা এদেশে বসে মনে করি, ইংরাজ মেয়েরা ঘরসংসারের কাজকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্যই কেবল ঝগড়া করেন। কিন্তু তাঁরা যে কেন এত ঝগড়া করেন, এত কষ্ট স্বীকার করেন, তা বিশেষ করে তলিয়ে দেখবার বিষয়।

যুক্তরাজ্যে, প্রতি বৎসর প্রায় ১২,৫০,০০০ শিশুর জন্ম হয়। এতগুলি জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশসাধন সহজ ব্যাপার নয়। ছেলেদের মা বাপেরা বুঝবে এখন,—তাছাড়া অনাথাশ্রম প্রভৃতিতে যত আশ্রয় পায়, পাবে,—যাদের সন্তান পালনের শক্তি নাই তাদের ছেলে হয় কেন,—এইরূপ জবাব কোন কাজের নয়। আমাদের এদেশে জাতীয় জীবন একটা ভাবমাত্র, তার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। জাতীয় জীবনের গোড়ায় একতা একপ্রাণতা বোধ। আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধটাই প্রবল ও সুস্পষ্ট। আমরা সভাসমিতিতে দেশের জন্য প্রাণ দান ক'রে বাড়ী এসে নির্ব্বিকার চিত্তে স্বার্থের পুঁটুলী বাঁধি। রামামুচির ছেলে কয়টা না বাঁচ্‌লে এবং সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ও শিক্ষিত মানুষ না হ'লে তোমার আমার কি হয়, দেশের কি ক্ষতি হয়, তার ধারণা আমরা সহজে কর্‌তে পারি না। কিন্তু জীবন্ত জাতি অতি সহজেই এ সকল বুঝতে পারে।

দেশের গরিব দুঃখী, কুলী মজুরদের ছেলেরা সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম মানুষ না হ'লে দেশের কি ক্ষতি হয়, বর্ত্তমান সময়ে তা এমন স্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে যে, বেশী বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধে লাখ লাখ সৈন্যের আবশ্যক হ'চ্ছে। অধিকাংশ সৈন্যই দেশের গরিব দুঃখী জনসাধারণের ছেলে। যাদের রক্ষার জন্য দেশ দায়ী নয়, তাদের প্রাণ নেবার দাবী কেমন করে সঙ্গত হবে? দাবী করলেই তো পাওয়া যায় না। যদি বলিষ্ঠ লোক না থাকে, চাইলে কি হবে? এতো যুদ্ধের সময়ের কথা। শান্তির সময় জাতীয় জীবনের মূল্য কিছু কমে না। বরং এখনই জীবনের যেন কোন মূল্য নাই। শান্তির সময় জীবনের যে কোন দিকে চাও, জনসাধারণ সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ও শিক্ষিত না হ'লে, জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

যুবকগণ সুস্থ না হ'লে কোন কাজ ভাল করে যথাসময়ে কর্‌তে পারে না। বালকগণ সুস্থ না হ'লে লেখা পড়া শিখ্‌তে পারে না। শিশুগণ সুস্থ না থাকিলে বাঁচেই না, যারা বাঁচে তারা অকর্ম্মণ্য হয়। এমনি ক'রে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতার উন্নতির ব্যবস্থা কর্‌তে গিয়ে ধরা পড়েছে যে গলদ রয়েছে একবারে গোড়ায়। সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন হ'তে প্রথম চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্য-রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে, অনেকেই অকালে প্রাণত্যাগ করে, যারা

বাঁচে, তাদের শরীর ঠিক করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সদ্যো-জাত শিশুগণই দেশের আশা ভরসা, শক্তি ও প্রধান সম্বল। প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য-রক্ষা সকল দেশের সকল জাতির জীবনীশক্তি। ইংলণ্ডের মত দেশেও এখনও এ বিষয়ে কত কম্‌বার আছে, তা জান্‌তে পার্‌লে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা হ'তে পারে।

প্রায় দশ বছর আগে, মিস্ বেন্থাম নিউকাসেল্ অন্-টাইনে চিকিৎসা ক'রতেন। তিনি কিছুকাল চিকিৎসা করার পর বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, অনেক গরিব প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসা অভাবে মারা যায় এবং চিরজীবন কষ্টভোগ করে। তিনি অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর, আর একজন সহযোগিনীর সঙ্গে গরিবদের পল্লীর কাছে একটি ঘর ভাড়া কর্‌লেন। সেখানে গরিব প্রসূতিগণ বিনা পয়সায় তাঁদের সাহায্য পাবে বলে চারিদিকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল। চারিদিক হ'তে দলে দলে স্ত্রীলোক আস্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ তাঁদের দুজনের পক্ষে সকলকে দেখা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। চার বছর এই ভাবে কাজ করে তিনি হাতে কলমে বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, অধিকাংশ গরিব প্রসূতি গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত যত্ন ও সেবার অভাবে জীবন-ব্যাপী কষ্ট পায়, জীবন যন্ত্রণাময় হয়, এবং তাদের ছেলেরাও চিররুগ্ন হ'য়ে জন্মায়। শত শত নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়াছে যে তাহারা তাদের নিজেদের জন্য বা সন্তানদের জন্য কি কি বিধি ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত তার কিছুই জানে না। এই জ্ঞানের অভাববশতঃ অসংখ্য জীবন মৃত্যু ও ব্যাধির গ্রাসে পড়ে।

শত শত শিশুর অসুখের কোন চিকিৎসাই হয় না। কারণ, মাতা পিতা দরিদ্র, মাকে খেটে খেতে হয়, ছেলেকে ডাক্তার দেখাবার বা ঔষধ খাওয়াবার পয়সাও নাই, সেবার সময়ও নাই। শৈশবে কোন রোগের চিকিৎসা না হলে ভবিষ্যতে তা হতে স্থায়ী কুফল ফলে। কিন্তু চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শিশুরা যাতে সুস্থ থাকে, এবং অসুস্থ না হয় তার ব্যবস্থা করা। কত গরিব পরিবারে সামান্য রকম আঘাত, প'ড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, ঘা হওয়া প্রভৃতির কোন চিকিৎসা বা ব্যবস্থাই করা হয় না। মা হ'য়ে জানে না কেমন করে কি কর্‌তে হয়, অথবা তার অবসর নাই। কিন্তু এই সব সামান্য কারণেই বহু স্থলে স্থায়ী রোগ দাঁড়ায়। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাই সকল রোগের ও অকাল মৃত্যুর কারণ। অর্থাভাবে যারা আলো বা বাতাস বর্জ্জিত গৃহে বাস করে, তারাই সব চেয়ে বেশী রোগ ভোগ করে এবং অকালে প্রাণ হারায়। প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা কর্‌তে হ'লে, সব চেয়ে প্রথমে তাদের বাসস্থানের উন্নতি সাধন কর্‌তে হবে। অবাধ আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু জীবনের সর্ব্বপ্রধান সম্বল। তারপর আর-সব।

কুমারী বেন্থাম বলেন—"এখনও আমরা বুঝ্‌তে পারিনি যে প্রসূতি ও শিশুদের

রক্ষণাবেক্ষণ কত বড় জাতীয় কর্ত্তব্য। স্কুলের ছেলে মেয়েদের শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'তে এদিকে কিছু পরিমাণে দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আরও বহু পূর্ব্বে হওয়া উচিত। আগে বাঁচবে, তবে তো স্কুলে যাবে? স্কুলে যাওয়ার বয়স হ'তে হ'তে অনেক শিশু মারা যায়, অনেকের শরীরে রোগ বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। প্রথম দুই বছরই জীবনের বনিয়াদ। স্কুলের ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা হয় রোগ দূর কর্‌বার জন্য। কিন্তু শিশুগণ স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ শরীরেই জন্মায়; তারপর যাতে তাদের শরীরে রোগবীজ প্রবেশ না করে সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঁচ বছর বয়সের সুস্থ সবল নীরোগ শিশু যাতে স্কুলে যেতে পারে আমরা সেই চেষ্টা কর্‌ছি। লাখ লাখ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে; কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল না থাক্‌লে শিখবে কে? শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বৃথা। শিশু যাতে একেবারে নীরোগ থেকে বর্দ্ধিত হয়, তার আয়োজন কর্‌তে হবে। প্রসূতি, সদ্যোজাত শিশু এবং স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্ব অবস্থার শিশুদের জন্য শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। গৃহ, খাদ্য, বস্ত্র, সেবা প্রভৃতির উপর সকলেরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে; সব চেয়ে বেশী প্রসূতির ও শিশুদের স্বাস্থ্য।

"শত শত শিশু গর্ভে অবস্থান কালেই মারা যায়। শত সহস্র শিশু সুব্যবস্থার অভাবে প্রসব কালেই প্রাণ হারায়। এই সব জীবন জাতীয় সম্বল, জাতীয় শক্তি। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডে বহু সংখ্যক সুস্থ সবল যুবক প্রাণত্যাগ করেছেন, আরও কর্‌বেন। এখন শিশুদের জীবনের মূল্য কত বেড়ে গিয়েছে। এখন আর এ বিষয়ে অগ্রাহ্য করা চলে না। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর্‌তে হবে, আমরা যত শিশু বাঁচাতে পারি তার ত্রুটি না হয়। শিশুদের মাতাগণের সেবা শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, অর্থাভাব দূর কর্‌তে হবে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। প্রধান কথা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস এবং পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের উপযুক্ত আয়। তা হলে কত শত শিশুকে অকাল মৃত্যু হ'তে বাঁচান যায় তার সীমা নাই। আমরা গরিব প্রসূতিগণকে অর্থ সাহায্য ক'রে দেখেছি তারা সেই অর্থ দিয়ে ভাল গৃহে গিয়ে এবং একটু ভাল খেয়ে যথেষ্ট ভাল থেকেছে এবং তাদের শিশুগণ প্রায় শতকরা দুজন মারা গিয়েছে। এই সামান্য অর্থ সাহায্য না কর্‌লে, হয়ত তার দশগুণ শিশু অকালে মারা যেত। এইরূপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে আমরা চেষ্টা কর্‌লে, শিশুদের অকাল মৃত্যু একবারে রোধ কর্‌তে পারি। এ কাজে জাতীয় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

বালকদিগের পুষ্টির অভাব।

সহর বা নগরের পাঠশালায় ও স্কুলে যে তরুণ সুকুমারদল পাঠ করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অভুক্ত, অপুষ্ট, শ্রীহীন, বলহীন, স্বাস্থ্যহীন। তাহারা কোন বিশেষ ব্যাধিগ্রস্ত নয়, কোন রোগ যন্ত্রণায় কাতর নয়, তথাপি তাহারা অক্ষম অসুস্থ দুর্ব্বল। পল্লীগ্রামে পাঠশালার ছুটির পর যে বালকদল আনন্দে কোলাহল করিয়া গৃহে ফিরিতেছে, তাহাদিগকে দেখুন, আর বৈকাল ৪টার পর সহরের স্কুল হইতে যে শিক্ষার্থিগণ বাহির হইতেছে, তাহাদিগকে দেখুন, সেই ভবিষ্যতের জাতির ও সমাজের আশা ভরসা বালকদিগকে দেখুন, দেখিবেন, কাহার আনন বিশুষ্ক মলিন, কাহার দেহ অতি শুষ্ক তালপত্রসম, কাহারও আকৃতি খর্ব্ব বয়সোপযোগী বর্দ্ধিত হয় নাই, কত জীর্ণশীর্ণ ভগ্ন দেহ। কোথায় শক্তিমান দেহ, পরিণত আকৃতি, বালকসুলভ আনন্দ, বিপুল প্রাণের প্রবাহ ?

শিশুকালে প্রকৃত পুষ্টির অভাবেই বালকদিগের এইরূপ অস্বাভাবিক বর্দ্ধন। কেহ কেহ বলেন কোমল স্বাস্থ্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, বা উপদংশগ্রস্ত, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বা মদ্যপায়ী পিতামাতার সন্তানগণ এরূপ দুর্ব্বল কোমল ক্ষীণপ্রাণী অপরিণত হয়। তবে অধিকাংশ নবজাত শিশুই স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে, নিয়মিতরূপে যত্ন সহকারে সেবাশুশ্রূষায় লালনপালন করিলে শিশু সবলদেহ পূর্ণ পরিণত হয়। শিশুকালে মাতা পিতার লালনপালন দোষেই তাহারা স্বাস্থ্যসুখ হারাইয়া দুর্ব্বহ দুঃসহ ভারস্বরূপ জীবন দুঃখে বহন করে। গরিবের ঘরে যাহারা জন্মায় তাহারা বস্তুতই কৃপার পাত্র। মাতা নানা গৃহস্থালী কর্ম্মের মধ্যে ৫।৬টি শিশুসন্তানের উপযুক্ত সেবা করিতে পারেন না, পিতা অস্বচ্ছলতাবশতঃ পুত্রকন্যাদিগকে পুষ্টিকর আহার সামগ্রী খাওয়াইতে পারেন না; অস্বাস্থ্যকর গৃহে অনিয়মিত জীবন যাপনে, মাতাপিতার ব্যাধি দুঃখ দারিদ্র্যভারে কত শত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহারা মরে না তাহারা এইরূপ অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। গরিবের গৃহে শিশুরা মরে যত্নাভাবে, আর ধনীদিগের গৃহে শিশুরা মরে অতি যত্নে। সেখানে যত্নের অন্ত নাই, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ান, ধূলা লাগিবে বলিয়া তাহারা খেলা ছুটাছুটি করিতে পায় না; বেশী হাওয়া লাগিবে বলিয়া গৃহের দরজা জানালা বন্ধ; সে রাজার মতন বেশে সজ্জিত মণিহার শোভিত শিশুর 'খেলাধূলা আনন্দ সকলি যায় ঘুরে, বসন ভূষণ হয় যে বিষমভার।'

শিশুপালন যে কি দায়িত্বপূর্ণ পুণ্য কর্ত্তব্য তাহা সৎসন্তানদের মাতারাই জানেন। দেশের বালিকাবিদ্যালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষদিগের সমীপে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনারা ভবিষ্যৎ জাতির মাতৃকুলকে গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন; তাঁহাদের

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কর্ত্তব্য সন্তানপালন; এই শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে অভিজ্ঞ হন তাহার ব্যবস্থা করুন।

শিশুর আহার, বিহার, বেশভূষা, নিদ্রা ইত্যাদি সকল অভ্যাসগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আহারের নিয়মিত সময় থাকিবে, মধ্যবর্ত্তী কালে শিশু কোন আহার গ্রহণ করিবে না। কোন কোন মাতা, আমার ছেলে খুব কম খায় বলিয়া দুঃখ করেন, কোন কোন দিন জোর করিয়া খাওয়াইয়া বালকদিগের রোগ আনয়ন করেন; তাঁহারা জানেন না এ অগ্নিমান্দ্যের কারণ শিশুর অনিয়মিত আহার।

শিশুর শয়নকাল সর্ব্বদা নিয়মিত হওয়া উচিত। ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকের ১০।১১ ঘণ্টা এবং দশ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালকের ৮।৯ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। শিশুকাল হইতে যদি নিয়মিতরূপে ঘুমাইবার অভ্যাস গঠিত হয় তবে স্বাস্থ্যের সমূহ মঙ্গল হয়।

রাত্রি জাগরণ ও দিবায় উত্থান খুবই মন্দ অভ্যাস। কোন কোন পরিবারে শিশুগণ ১০।১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত জাগে। শিশুদিগের বৃদ্ধির জন্য নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন। সকাল সকাল শুইয়া উষায় জাগিলে দেহে ও মনে এক নূতন শক্তি ও আনন্দের আবির্ভাব হয়। শয়নগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মুক্ত হওয়া উচিত। শিশুর ক্রীড়া বেশভূষা ইত্যাদি সকল দিকে মাতার স্নেহের ও যত্নের দৃষ্টি থাকিবে। শিশুকালে সদ্‌অভ্যাস গঠিত হইলে এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে পালিত হইলে শিশু সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ বালক ও প্রকৃত পুরুষ হইবে।

শিশুকে যথার্থরূপে লালনপালন না করিলে, মাতাপিতাকে পরে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, শিশুর কথা আর কি বলিব। বালকের নিত্য অসুখ, মাতাপিতার চিন্তা ও কষ্টের অবধি নাই, পুত্রটি কৃশ, দুর্ব্বল, মলিন, ক্ষীণপ্রাণ। সংক্রামক ব্যাধির করালকবলে পতিত হইবার খুবই সম্ভাবনা; হাম, বসন্ত, হুপিংকাশি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মারোগ ইত্যাদি দ্বারা অতি সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। ব্যাধির পর ব্যাধি হইতেছে, মাতাপিতা জানেন না এ শিশু অপালনের ফল; বালকের মাংশপেশী দৃঢ় নয়, শীঘ্রই শ্রান্ত হয়, ক্রীড়া করিতে চায় না, রক্তসঞ্চালন অতি মৃদু, মাঝে মাঝে শীতস্ফোট (chilblain) হয়, অগ্নিমান্দ্য হয়, 'দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন',—এ সকলই শিশু অযত্নের ফল।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অনিয়মিত ভোজন, অস্বাস্থ্যকর গৃহে ও পল্লীতে বাস এবং মাতাপিতা হইতে প্রাপ্ত ব্যাধি ও দৌর্ব্বল্য এই কয় কারণেই দেশের বহু বালক অসুস্থ পঙ্গু, তেজহীন স্বাস্থ্যহীন।

বালক কেন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে না, তাহা জানিতে হইবে, তাহার ওজন লইতে হইবে, বার বার চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং কারণ নির্ণয়

করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। বঙ্গীয় পিতৃমাতৃগণের এ মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে এ ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী চিরকাল অর্দ্ধমৃত থাকিবে।

(স্বাস্থ্যসমাচার।)

কুসংস্কার।

"In all superstition wise men follow fools."—Bacon,

"Automatism in intelligence turns conduct
into stupid idolatry."

১। কুসংস্কারের স্থান।

সামাজিক রীতিনীতি দ্বিবিধ আজ্ঞাধীন—এক নির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা, যেমন শাস্ত্রাজ্ঞা, রাজাজ্ঞা প্রভৃতি ; আর এক অনির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা, যেমন লোকাচার, মানসম্ভ্রম জ্ঞান, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতি। এ সকলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞা মাত্রে অর্থাৎ প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা, রাজাজ্ঞা, এবং স্বাভাবিক নিয়মাবলী প্রভৃতির শক্তি, সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধিহীন, অপরিচ্ছিন্ন ও সমভাব ; কিন্তু লোকাচার প্রভৃতি অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞার (অর্থাৎ যাহাদের উৎপত্তিকারণ চাক্ষুষ গোচর নহে) শক্তি নিয়মবিগর্হিত, নানাবিধ, ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র। আবার সমাজগত বা জাতিগত কোন কোন রীতিনীতি রাজশাসনাজ্ঞাধীন হওয়ায় প্রথম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয়বিধ অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞাজনিত রীতিনীতির মধ্যেই কুসংস্কার বিদ্যমান থাকিতে পারে।

২। শাস্ত্র ও কুসংস্কার।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রপাদপে বহুতর কুসংস্কার আগাছা পরগাছা আশ্রয়লাভ করিয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্মপাদপকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহারা নিজেরা ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া সরল মানবের মনে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে।

অনেক প্রাচীন মত পুরাকালে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য ছিল, তখন তাহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইত না ; এক্ষণে, কিন্তু জ্ঞানাধিক্যে ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করা কুসংস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম পালন করিলে কুসংস্কার হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন—

(১) যে সকল কার্য্যের পারত্রিক ভিন্ন ঐহিক কোন ফল দেখা যায় না তাহা নিরর্থক, অতএব ত্যাজ্য।

(২) হানিকর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য সকল সময়ই ত্যাজ্য।

(৩) ন্যায্য বিচারসিদ্ধ কার্য্য করণীয়।

৩। অসভ্য সমাজে কুসংস্কার।

এই কুসংস্কার নামক মহৎ সামাজিক অনিষ্ট ও লৌকিক দোষ প্রায় সকল সমাজেই অল্লাধিক বিদ্যমান; অসভ্য সমাজেই ইহা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় কুসংস্কার অসভ্যতার আনুষঙ্গিক চিহ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কুসংস্কার ব্যক্তিগত, জাতিগত ও সমস্ত সমাজগত এই ত্রিবিধভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিশ্বাস বিষয়ের অস্বাস্থ্য মাত্রকেই কুসংস্কার সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কুসংস্কারের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধেও নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এক এক সমাজে এক এক ধরণের কুসংস্কার অধিক পরিমাণে বিদ্যমান; এক এক মণ্ডলীর এমন কি এক এক মানবের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কার আছে।

৪। কুসংস্কারের উৎপত্তি।

(ক) অজ্ঞান হইতে।

(খ) ভবিষ্যৎ জানিবার ইচ্ছা হইতে।

(গ) তুলনা দ্বারা সুনীতি হইতে কুনীতির সৃষ্টি।

সুনিয়ম হইতেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সময়ে কুনিয়মের আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রোক্ত অনেক বিধি নিষেধ প্রভৃতির কারণ সাধারণের বোধগম্য নহে, তাহারা কল্পিত কারণ প্রদর্শন করে। তৎপরে তুলনা দ্বারা ঐ কল্পিত কারণের অন্যান্য নিরর্থক ফল উহার সহিত সংযুক্ত করা হয় কিংবা উক্ত সুনিয়মের অনুরূপ যে কোন কার্য্যকে একত্র করিয়া বহুবিধ বিধিব্যবস্থা নিয়মাদির সৃষ্টি করা হয়, ইহার অধিকাংশই কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(ঘ) অপরের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার আশায় বা স্বার্থসিদ্ধির মানসে।

অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য, জনসাধারণের নিকট প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবার মানসে স্বার্থসিদ্ধি করণার্থে পুরোহিত ধর্ম্মযাজকাদি অনেক স্বকপোলকল্পিত কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, শিক্ষা ও প্রশ্রয় দিতেছেন। ফলশ্রুতি ভয়প্রদর্শন নানাবিধ তীর্থের গল্প ও করণীয় অধিকাংশ এই অর্থে সৃষ্ট। রাজবিপ্লব বা ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় অনেক যথেচ্ছাচারিতার উদ্ভব হয়, তজ্জন্য ঐ সময়ে বা কোন দৈব দুর্ঘটনার সময়ে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করে।

(ঙ) স্তুতিবাদক ও কবিদিগের সৃষ্টি।

আর এক প্রকার কুসংস্কার সৃষ্ট হইয়াছে। স্তুতিবাদক কবিদিগের বর্ণনায়। বাদসা সেকন্দর আপনাকে জুপিটর এমনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। তজ্জন্যে

পরবর্ত্তী কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে জুপিটর সেকেন্দরের মাতাকে বিবাহ করেন, কিরূপে সেকেন্দরের জন্ম হয় প্রভৃতি। এইরূপে অধিকাংশ পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছে;—যেমন, কবি কালিদাস সরস্বতী দেবীর বরপুত্র।

ধর্ম্ম ও কুসংস্কার।

এইরূপে সঠিক ধর্ম্মজ্ঞান উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে ভূতাদিগত কুসংস্কার সৃষ্ট হয়, পরে এইরূপ কুসংস্কার সমষ্টিই একপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় (Fetisism); ইহা অসভ্য সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার। বিপরীত পক্ষে আবার প্রকৃত ধর্ম্মে ক্রমে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতগণের অত্যাচারে অনেক কুসংস্কার সংযুক্ত করিয়া সেগুলিকে ধর্ম্মের অংশীভূত করা হইয়াছে।

কুসংস্কারের বিভাগ।

তাহা হইলে বুঝা গেল কুসংস্কার প্রধানতঃ ত্রিবিধ; -(১) শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য—ইহা প্রবল-প্রতাপ-সম্পন্ন, মহা অনিষ্টকর ভ্রমোৎপাদক। (২) সামাজিক এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে জ্যোতিষ ও ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য —ইহাও শক্তিশালী, চিত্তবিমর্ষকারী, ক্ষতিকারক। (৩) মেয়েলী সমাজের অশেষবিধ কুসংস্কার—ইহা নিরর্থক, অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ। যেমন রোমানদিগের সপ্ত সংখ্যা, ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ, আমাদিগের তিন শত্রু, হাঁচি, টীকটীকির বিষয়, পশ্চাতে আহ্বানাদি, পূর্ণকুম্ভ শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি কতবিধ রকমের শত শত বদ্ধমূল কুসংস্কার। যে-সকল দ্রব্যাদি স্বতঃ মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে তাহা বর্জ্জনীয়; ইহার অনেকগুলি আমাদিগের মনকে পূর্ব্ব হইতে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া মনের প্রফুল্লতা হরণ করিয়া কুফল আনয়নের সাহায্য করে।

৫। কুসংস্কারের শক্তি এবং ফলাফল।

কুসংস্কারের উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন প্রবল প্রতাপ অখণ্ডনীয়। ন্যায়ানুগবিচারশাসিত মানব-মনও ইহার প্রতাপে পরাজিত। কদভ্যাস! সম্পূর্ণ নিরর্থকতা উপলব্ধি হওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ অযুক্তিকর বলিয়া ধারণা হইলেও, একেবারে সম্বন্ধহীনতা দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কি এক অদৃশ্য বলের বশবর্ত্তী হইয়া, কি এক অব্যক্তভয়ের অধীন হইয়া মানব-মন ক্রীতদাসের ন্যায় ঘৃণিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। হইতে পারে দৈনিক মাসিক বা বার্ষিক ঘটনাপর্য্যায় কখন কোন দুর্ঘটনা ঐ কুনিমিত্তের দিবসে মাসে বা বর্ষে ঘটিয়া থাকিবে; সে ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটনার নিজ স্রোতেই ঘটিয়াছে, কুনিমিত্তের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, কারণ ঐরূপ দুর্ঘটনা কুনিমিত্তবিহীন হইয়াও অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মন ঐ সম্মিলন দিবস মাস বা বর্ষ তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়া রাখে, অমিলনের সংবাদ আদৌ রাখে না,

কেহ তর্ক করিলে ঠিক তারিখ মাস ও বর্ষের উল্লেখ করিয়া নিজ মতের যুক্তি প্রদর্শন করে।

এই কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মানস কখনও কোন ঘটনা—এমন কি একটি বৃক্ষপত্র পতন, একটি জন্তুর রব সাধারণ নির্ম্মল দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না ; তাহার দৃষ্টিতে সকলই ভয়ের আধার, মনসঙ্কোচনকারী। ক্রমে মনের স্বাস্থ্য হারাইয়া ঐরূপ লোকেরা প্রত্যেক দ্রব্য কেবল মন্দভাবে দর্শন করে অর্থাৎ উহারা pessimists হইয়া দাঁড়ায়।

কদভ্যাস লৌকিক জীবনে যে কুফল প্রসব করে, কুসংস্কারও সামাজিক জীবনে সেইরূপ কুফল প্রসব করে, কারণ কুসংস্কার সমাজের কদভ্যাস। অতএব কুসংস্কার দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। কেবল দুঃখভোগ নয়, নিরুৎসাহে কার্য্যহানি, সুযোগাহরণে বিলম্ব করায় দারিদ্র্য, কলুষিত নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কতবিধ কুফল ইহা হইতে উৎপন্ন। অনেকে বলেন হিন্দুদিগের শাসনকালের শেষ সময়ের কুসংস্কারাধিক্য তাহাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

৬। কুসংস্কারের নিরাকরণ।

সমূলে শাখাপ্রশাখার সহিত একেবারে উন্মূলন করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। যদি তাহার সহিত দুই একটী ভাল প্রয়োজনীয় লতাও ধ্বংস হয় তাহা বরং এক্ষেত্রে ভাল, সেগুলি আবার বসাইয়া লওয়া যাইবে ; কুসংস্কারের কিন্তু মূল থাকিলেই আবার বৃদ্ধি পাইবে। সমূলে উৎপাটন—সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা—যাহা হয় হউক, শাস্ত্রভয় করিও না। অবশ্য যাহার কারণ বা উদ্দেশ্য বোধগম্য তাহা ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। অনুজ্ঞার অক্ষর অপেক্ষা অর্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা বিচারসঙ্গত, অর্থযুক্ত, বিবেকানুমোদিত হইবে তাহাই পালনীয়, কেবল মাত্র অনুজ্ঞা আছে, ফলশ্রুতি আছে, না করিলে অমুক দোষ হয়, সেই ভয়ে কখনই উহা পালন করা উচিত নহে।

আমাদের অন্তরে দ্বিমুখীন বিচার উপবিষ্ট—নীতিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ; একটি আভ্যন্তরিক দৃষ্টি, অপরটি ভবিষ্য বাহ্যিক দৃষ্টি, একটি স্বতঃজ্ঞান (instinct) অপরটি প্রামাণ্য জ্ঞান (Experience)। অন্তরস্থ বহুবিধ সৎবৃত্তির সমবায়ের বিচার-ফলই কর্ত্তব্যজ্ঞান। কর্ত্তব্যজ্ঞান স্বতঃনীতিজ্ঞান ও প্রামাণ্য জ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত। আভ্যন্তরিক জ্ঞান বাহ্যিক আকার ধারণ করিতে অনেকাংশে দেশ-কাল-পাত্র-গত বিকারপ্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। নীতি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নূতন নীতি সৃষ্টি করে। অতএব ন্যায়ান্যায় কোনও অবিচলিত চিরস্থায়ী এক সত্য নহে। আমরা বিবেক-বিচারে সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিব, নচেৎ ভ্রমসঙ্কুল পথে পতিত হইব ; তবে আমরা নিজে যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা না করি।

কুসংস্কার মাত্রেই অযুক্তিকর, উন্নতির অন্তরায়, হানিকর বা বৃথা। ইহাদের

ফলাফল বিশেষরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য ; যাহাতে কোন উপকারিতা দেখা যায় না তাহা পালনীয় নহে ; কল্পিত বা পারলৌকিক হিত উপকারিতা নহে। কলভয় সম্পূর্ণ অলীক। যাহারা এ সকলের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে পর্য্যন্ত ক্রূরভাবে উপহাস করা কর্ত্তব্য। মন নিরানন্দময় উৎসাহহীন বিচলিত করিবার এইগুলি অন্যতম কারণ, তজ্জন্য ইহা হইতে যাহা কিছু কুফল ফলিতে পারে। অতএব চলিত কথায় যে বলে, —"যাহার নাই উত্তর পুব, তার মনে সদাই সুখ" অনেকটা সত্য। এরূপ নিরর্থক সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া অন্যায় ও পাপমধ্যে গণ্য করা যায়। এবম্প্রকার সহস্র সহস্র কুসংস্কার আবর্জ্জনা স্মৃতি হইতে নির্ম্মল ঐশ্বরিক বিশ্বাসস্রোতে সাবধানে প্রক্ষালন করিলে মানসক্ষেত্র স্বচ্ছ করিতে পারিলে আর ঐ সকল ঘটনায় মন মলিন হইতে পারে না বা মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় না। কার্য্যের ফলাফল অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে, ততক্ষণ সেই সকলের চর্চ্চা করা শ্রেয়স্কর। শাস্ত্রভয়, সমাজভয়, লোকলজ্জা, ফলভয়, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিবেকবিচার সঙ্গে লইয়া দৃঢ়রূপে অগ্রসর হও, সন্দেহস্থলে বিশেষ বিচার কর, অদ্য এই মহূর্ত্ত হইতে যাহা কেন হউক না আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস চিরতরে ত্যাগ করিলাম।

উপসংহার, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার।

এক্ষণে এক কুসংস্কার ত্যাগ করিতে গিয়া আমরা যেন অপর কুসংস্কারে পতিত না হই। কুসংস্কার আছে বলিয়াই যেন আমরা শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি কিম্বা যেন একেবারে নাস্তিক হইয়া না দাঁড়াই। কুসংস্কার ধর্ম্মে সমাজে ও লৌকিক জীবনে এই তিন অবস্থায় বিদ্যমান আছে। আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা ভগবানের নামে সুস্থ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সদসৎ বিচারপূর্ব্বক এই চিরানিষ্টউৎপাদক ত্রিধা কুসংস্কারের হস্ত হইতে প্রত্যেকেই উদ্ধার হইতে নিয়ত চেষ্টা করুন—নিজেকে নিজে ফাঁকি না দিয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন, অর্থাৎ নিজের মনের দৌর্ব্বল্য বৃথা কাল্পনিক যুক্তিদ্বারা আবরিত করিতে চেষ্টা না করিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে নিজ আত্মার ও সমষ্টি সমাজের বিশিষ্ট উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(গৃহস্থ, আশ্বিন) শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বি, এল।

ভগবৎসাধনা।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী)

ভগবানকে আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। দূরদেশস্থিত আত্মীয় যেমন কালক্রমে আমাদের স্মৃতির বহির্ভূত হইয়া পড়ে, ভগবানও সময়ে সময়ে তেমনি হয়েন। যখন আমরা পার্থিব অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদে মত্ত হই তখন ভগবানকে ভাবিবার

অবসর পাই না। না ভাবিতে ভাবিতে ভগবানের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক প্রেমটুকু আছে তাহা ক্রমে মলিনতাপ্রাপ্ত হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, আর যে অকিঞ্চিৎকর বস্তুগুলিকে লইয়া সদাসর্ব্বদা আমোদে মগ্ন থাকি সেগুলির প্রতি আমাদের প্রেম বাড়িয়া উঠে। ক্রমে আমরা স্বর্গের পথ পরিত্যাগ করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি এবং অবশেষে ঘোর নরকে পতিত হই। ঈশ্বরপ্রেমও প্রেম এবং পার্থিব অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি প্রেমও প্রেম—তবে বিশেষ এই যে একটী পূর্ণ অবিনাশী অনন্ত অমৃতের খনি, অপরটী অপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী বিষকুম্ভ পয়োমুখ। একটীকে পাইয়া আমরা অনন্ত আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করি, অপরটীকে অবলম্বন করিয়া নিম্ন হইতেও নিম্নতর স্থানে যাইয়া অবশেষে সুগভীর দুঃখময় সাগরে নিপতিত হই।

ভগবানকে হারাইয়া আমরা কিছুতেই চিরসুখী হইতে পারি না। পার্থিব প্রেমের সামগ্রীগুলি অতি নশ্বর—আজ আছে কাল নাই। কাঠের পুতুল দিয়া ঘর সাজাই, পুতুলগুলির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হই। একদিন দৈববিপাকে সেই পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া যায় তখন কাঁদিতে থাকি। আমাদের জীবনকে চিরসুখী ও শান্তিময় করিতে হইলে ঐ পার্থিব নশ্বর বস্তুগুলিকে লইয়া থাকিলে চলিবে না, ভগবৎপ্রেম ও তাহার সাধনা চাই।

ভগবৎপ্রেমের সাধনা কি প্রকারে হয়? প্রেমিক ভক্তগণ এ বিষয়ে অনেক অনেক উপদেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেষ্টারও অভাব নাই, উপদেশেরও অভাব নাই। মহর্ষি নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই এই পথের প্রদর্শক। মোটের উপর কথা এই যে যাহাকে ভাল বাসিতে হয় তাহাকে নিকটে আনিতে হয়, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হয় এবং নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। ভালবাসার জিনিষ নিকটে থাকিলে এবং সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিলে ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং যতক্ষণ ভালবাসার বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ না হইবে ততক্ষণ ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহাকে আমার নিকটে আনিতে হইবে, তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বরকে আমরা কোথায় পাইব? কি প্রকারে তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিব এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব? তিনি ত সচ্চিদানন্দ নিরাকার পরব্রহ্ম। কথাটা বড় শক্ত, কিন্তু যতটা শক্ত বলিয়া বোধ হয়, তত শক্ত নয়। দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইবে—দুগ্ধের মত জলীয় পদার্থ হইতে অমন তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইবে এ কথা জানা না থাকিলে কিংবা কেহ বলিয়া না দিলে আপাতত নিতান্তই অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। দুগ্ধের মধ্যে ওরূপ বস্তু যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, দুগ্ধ দেখিয়া কি তাহা বোধ হয়? অথচ

তুমি দুগ্ধ মন্থন করিতে থাক, ঘৃত উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইলে দেশ দেশান্তরে যাইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে না। তিনি অতি নিকটেই আছেন। দুগ্ধের ভিতরে যেমন ঘৃত লুক্কায়িত থাকে, ঈশ্বরও তেমনি আমাতে লুক্কায়িত আছেন। মন্থন করিয়া তাঁহাকে বাহির করিলেই তিনি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবেন।

এই মন্থনপ্রক্রিয়া অনেক প্রকারের আছে। যিনি যে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করুন না কেন, মন্থনান্তে সকলেই সেই এক প্রেমরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। প্রক্রিয়া-ভেদ হইলেও পদার্থ ভিন্ন নহে। দুগ্ধকে যে ভাবে মন্থন কর, বিলাতী কল দিয়া বা দেশী মউনি দ্বারা কিংবা হাত দিয়াই মন্থন কর, ফলে আর কিছু না—ঘৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের মন্থনদণ্ড ভক্তি, ভক্তিদ্বারা কি প্রকারে ঈশ্বররূপ ঘৃতকে ভাসাইতে হয় এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

ঈশ্বর আমাতে আছেন। কি ভাবে আছেন? ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দুইটী বস্তু লইয়াই আমার আমিত্বটুকু হইয়াছে। এই দুইটী বস্তু অংশাংশী ভাবে নাই, দুগ্ধ ও ঘৃতের ন্যায় ওতপ্রোত ভাবে আছে। আমাতে যে প্রেম আছে, সম্বিত্ আছে সেগুলি ঈশ্বরত্ব। এই ঈশ্বরত্ব আংশিক ভাবে আমাতে প্রকাশ, অবশিষ্ট অপ্রকাশ। মন্থনদ্বারা ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারিলেই ঈশ্বরকে আমরা অতি সন্নিকটে পাইব। পূর্ণতা সম্পাদন কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের এই আংশিক প্রকাশের তারতম্য আছে। আমার কাছে যতটুকু প্রকাশ, তোমার কাছে তাহা অপেক্ষা অধিক, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি সাধকাদিগের নিকট আরও অধিক। শারদীয় পূর্ণ শশধরের কমনীয় কান্তি অব-লোকন করিয়া আমি যতটা বিমোহিত হই, কালিদাস শেক্স্পিয়ার, শেলী চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহা মহা কবিগণ তদপেক্ষা অনেক অধিক বিমোহিত হন। প্রাকৃ-তিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে ভাসমান হন, আমি সেরূপ হই না। আমার সেরূপ হইবার শক্তি নাই। কেন নাই? তাঁহারাও মানুষ, আমিও মানুষ। মনুষ্যত্ব উভয়েতে সমান থাকিলেও ঈশ্বরত্ব উভয়েতে সমান নাই। সাধনা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব বাড়াইয়াছেন, আমি বাড়াই নাই, তাই এতটা পার্থক্য। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরত্ব বৃদ্ধি হয়, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের ঈশ্বরত্ব বৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে যে পূর্ণতায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিব, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আমাদের ভিতরে যে সামান্য একটুকু প্রেম আছে, যাহা দ্বারা আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আনন্দ লাভ করি, আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবকে পাইয়া পরম সুখী হই, তাহা ঐশ্বরিক ভাব।

ঐ ঐশ্বরিক ভাবটুকুকে আমরা সাধনা দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া ভগবানের পূর্ণতার নিকটে আসিয়া উপনীত হইতে পারি। তখন কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও আত্মীয় স্বজনের প্রেমে মাত্র বিমুগ্ধ হইব না, তখন জগৎময় সেই সৌন্দর্য্য দেখিব, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই জানিব না। শোক, তাপ, দুঃখ, অভাব ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না. আনন্দময় হইয়া যাইব। তখন একদিকে আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকু, অন্যদিকে অনন্ত ভগবান, এই দুইটি মাত্র বস্তু থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না। ভক্তিসাধনা এইরূপে হয় অর্থাৎ আমার ভিতরে যে প্রেম অঙ্কুর ভাবে আছে, জলসিঞ্চন দ্বারা তাহার বৃদ্ধি সাধন করিয়া অনন্ত প্রেমরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়া।

কি প্রকারে এই বৃদ্ধি সাধন হইতে পারে? আমরা যদি ঈশ্বরকে প্রথমেই দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে কোন ভাবনা ছিল না; তাঁহাকে দেখিয়া একেবারেই তাঁহার প্রেমে ভাসিয়া যাইতাম, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং আমাদের ভিতরে যে সম্বল আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের হৃদয়স্থ প্রেম-অঙ্কুর পার্থিব উদ্যানে রোপিত, সুতরাং উহার বৃদ্ধি সাধনের জন্য পার্থিব উপকরণেরই প্রয়োজন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আর সে প্রেম পার্থিব উদ্যানে থাকিবে না, তখন স্বর্গীয় নন্দনকাননে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বর্গীয় উপকরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাদের পার্থিব প্রেমের বিষয় আমাদের পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—সুতরাং এই সকল বস্তু দ্বারাই প্রেমের বৃদ্ধি সাধন করা আবশ্যক। পিতা মাতাকে আমরা ভক্তি করি—এই ভক্তি যদি আমরা অকৃত্রিম ও পবিত্র ভাবে বাড়াইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অন্তঃকরণ ক্রমশঃ ভক্তিময় হইয়া অবশেষে ভগবানকে পিতা মাতা মনে করিয়া তাঁহার স্থানে উপস্থিত হইতে পারে। বন্ধুবান্ধবকে আমরা ভালবাসি, এই ভালবাসা যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আমাদের হৃদয় সখ্য-প্রেমময় হইয়া উঠে তখন আমরা ঈশ্বরকে সখানির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে পারি। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা যদি বিশুদ্ধ ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই বিশুদ্ধ ভাবটি লইয়া যদি আমরা ভগবানের নিকট উপনীত হইতে পারি তাহা হইলে আমরা ভগবান্‌কে প্রেমময় স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারি। এইরূপ প্রভুর প্রতি ভৃত্যের প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের প্রেম যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তবে সেই প্রেমই আমাদিগকে ভগবানের কাছে লইয়া যাইতে পারে। ফলকথা আমাদের ভিতরে যে প্রেমাঙ্কুর আছে, তাহার বৃদ্ধিসাধন করাই ভক্তিসাধন এবং সেই প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবৎপ্রেমে পরিণত হয়।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রেমকে ভক্তিশাস্ত্র শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাব নামে অভিহিত করিয়াছে। বিশ্বসংসার প্রেমে পরিপূর্ণ—ইহা বিপুল সৌন্দর্য্যের আকর। ইহার প্রত্যেক বারিবিন্দু, প্রত্যেক ধূলিকণা, নদ নদী, গ্রহ উপগ্রহ, বৃক্ষলতা, নরনারী ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। প্রেমচক্ষে অবলোকন কর, প্রত্যেক বস্তুতে ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইবে; তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না; ভগবানের অনন্ত মহিমা তোমাকে অনন্তের পথে লইয়া যাইবে—শোক তাপ দুঃখ দূরে পলায়ন করিবে। আমরা দেখিতে জানি না, তাই এই বিশ্বসংসার আমাদের নিকট সুখের সামগ্রী না হইয়া দুঃখের জলনিধি হইয়াছে;

তাই আমরা শোকে তাপে অভিভূত হইয়া এই জগৎকে বিষতুল্য বোধ করিতেছি, নরকতুল্য মনে করিতেছি, ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই ভাবটী স্বাভাবিক ভাব নহে। ইহা কৃত্রিম; ইহা ভ্রান্তি। আমরা ভ্রমবশতঃ অমৃতকে গরল মনে করিতেছি; প্রেমের আলিঙ্গনকে শত্রুর আক্রমণ মনে করিতেছি; সুখের ভবনকে কারাগার ভাবিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার প্রয়াস পাইতেছি।

দেখিতে শিখ, দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছ তাই আনন্দের পরিবর্ত্তে এত দুঃখ এত ক্লেশ। ঐ শিশুটীর প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ; কেমন আনন্দে হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইয়া বেড়াইতেছে; প্রত্যেক বস্তুকে কেমন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখিতেছে। এক কালে তুমিও ঐরূপ ছিলে। ঐ তোমার স্বাভাবিক অবস্থা। তাহা আর এখন নাই; এখন শোকে, তাপে, দুঃখে, অশান্তিতে জড়ীভূত হইয়াছে। প্রাণে আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, মনে আর সে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে আর সে আনন্দ নাই।

এ দশা তোমার কেন হইল? কে তোমার এ দশা করিল? তুমিই তোমার এ দশা করিয়াছ; তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ; তুমি তোমার তুমিত্বটাকে বড় বাড়াইয়াছ; এই তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে যে জিনিষটী না পড়িবে, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে পার না। তুমি নরনারীকে ভালবাস বটে, কিন্তু তোমার ভালবাসার নরনারীগণ তোমার তুমিত্বের গণ্ডীর মধ্যস্থ হওয়া চাই, গণ্ডীর বাহিরে যাঁহারা আছেন তাঁহারা তোমার ভালবাসার পাত্র নহেন। তোমার পুত্র, তোমার কন্যা স্ত্রী ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি তোমার ভালবাসার পাত্র; ইহার বাহিরের আর কেহ তোমার প্রেমভাজন নহে। তুমি বৃক্ষলতাদি, মণিমুক্তাদি নানাবিধ বস্তুকে ভালবাস, কিন্তু এ গুলিকেও তুমি তোমার তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া ভালবাস। তোমার উদ্যানের ফুলটী তোমার বড় প্রিয়, বনফুলটী তেমন নয়, অপরের উদ্যানের ফুলটী একেবারেই নয়। মণি মুক্তাদি আস্‌বাব তোমার গৃহে শোভা পাইলেই তুমি তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পার। সকল বস্তুকে তুমিত্বের গণ্ডীর ভিতরে আনাও যেমন ক্লেশকর, রক্ষণাবেক্ষণও তেমনি ক্লেশকর। অনেকে অনেক সময় গণ্ডীর ভিতরে থাকে না, বাহিরে চলিয়া যায়, নষ্ট হয়, মরিয়া যায়, তখন তুমি শোকে তাপে অধীর হও। এ পাগলামি কেন? বিশ্বসংসারের সমস্ত বস্তুই তোমার, ইহাই কেন মনে না কর? অথবা তোমারও কোন বস্তু নাই, আমারও কোন বস্তু নাই, সমস্তই ভগবানের বস্তু, তিনি আমাদিগকে ভোগের জন্য দিয়াছেন; যিনি দিতেছেন তিনিই নিতেছেন, আবার তিনিই দিতেছেন, ইহাই বা কেন মনে না কর? তুমিত্বের গণ্ডীটা ক্রমে ছোট করিয়া আনিয়া কেবল মাত্র তোমাকেই বেষ্টন কর আর সকলকে তুমিত্ব বৃত্তের বাহিরে স্থাপন কর, তাহা হইলে আর পাগলামি থাকিবে না। তুমি একটী পুত্রকে হারাইয়া কাঁদিতেছ তখন দেখিবে যে এ অনন্ত প্রেম রাজ্যের কিছুমাত্র হ্রাস নাই। বিনাশ কোথায়? মৃত্যু কোথায়? কাহার জন্য কাঁদিতেছ? সমস্ত ভগবানকে অর্পণ কর; তুমি তাঁহার শিশু সন্তান, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতেছ; তিনি তোমাকে সৃজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন, সকল প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। এই ভাবটীকে যদি মনে স্থান দিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে অচিরাৎ তোমার শোক তাপ দুঃখ দূরে চলিয়া যাইবে; তোমার হৃদয়ে ভগবানের অনন্ত প্রেম নামিয়া আসিবে।

(তত্ত্ববোধিনী)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মুসলমানমহিলাসমিতি—

এতদিন মুসলমানসমাজে পর্দ্দানশীন জনানা মহলে মহিলাগণ একরূপ অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকিতেন। বাহিরের সঙ্গে তাঁহাদের একরূপ কোন সম্পর্কই থাকিত না। পারিবারিক ঘাতপ্রতিঘাত শোক দুঃখ ব্যতীত বাহিরের কোন কিছুই তাঁহাদের জীবনকে স্পর্শ করিত না। অব্যক্ত লোক হইতে আসিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের কোণে অব্যক্ত ভাবে থাকিয়া পরিশেষে ঐ অব্যক্ত লোকেই চলিয়া যাইতেন। বাহিরের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কই যে মানবজীবনের বিকাশ ও উন্নতির নিদান, তাহা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে একরূপ চির ব্যাহতই ছিল। আজকাল সেই মুসলমাননারী-সমাজেও একটা নব জাগরণ আসিয়াছে। সময়ের স্রোতাঘাতে সেই বন্ধনগণ্ডী চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে চলিয়াছে। যুগের ভাব তাহাতে প্রবেশ করিয়া মানুষের সঙ্গে যোগে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিতে সকলের মন প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। শিক্ষার আলোকে সকলের জীবনকর্ত্তব্য সুস্পষ্ট হইতেছে। সভাসমিতি করিয়া দেশের কাজে সমাজের কাজে আপনাদেরও যে কিছু করিবার আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আগামী ১৫ই জানুয়ারী মীরাটে একটা মুসলমান মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইবে। জিঞ্জিরার মাননীয় বেগম সাহেবা এই সমিতির অধিনেত্রী হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সফলতা ও কার্য্যকারিতা আশা করি।

কুলি আইন রহিত—

ভগবানের রাজ্যে মানুষ মাত্রেই মানুষ—মনুষ্যধর্ম্মাক্রান্ত। তাঁহার চক্ষে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, প্রভু ভৃত্য, মহাজন কুলি সবই সমান। বিচারবুদ্ধি স্বার্থপ্রণোদিত মানুষের। স্বার্থান্ধ মানুষ মনুষ্যপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় না। সে কল্পনাবলে কাহাকে বড় করে বা ভাবে এবং কাহাকে হীন করিয়া তোলে। চা-বাগানের কুলিদের প্রতি এতাদৃশ হীনদৃষ্টি আমরা অনেকদিন ধরিয়া দেখিয়া আসি-তেছি। কুলি বলিয়া সে যেন মানুষ নহে। তার যেন কোন স্বাধীনতা নাই। সে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। এই কঠোর আইনের পাশে বদ্ধ হইয়া কুলিদিগকে কত নির্য্যাতন, কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই কুলিআইন নিবারণ করিবার জন্য মনুষ্যজাতির প্রকৃত বান্ধব কত মহাত্মা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া-ছেন। আসামের ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনার সার্ হেনরী কটন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দেশের মহা অনিষ্টকর জ্ঞানে কুলিআইন রহিত করিয়া দিয়াছেন। যে আরকাটির অত্যাচার-কাহিনীতে সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ থাকিত, আজ সে অত্যাচারের হস্ত হইতে নিরক্ষর সরলপ্রকৃতি মনুষ্যগণ রক্ষা পাইবার আশা হইল। শুনা যাইতেছে, মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত কমিশনার জেনেরল বুথ টাকার আসামের চা-বাগানে কুলি সর-বরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আসাম গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার লেখালেখি হইয়া স্থির হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অসভ্যজাতি সমূহের মধ্য হইতে কুলি সমস্ত প্রেরণ করিবেন। কুলি চালানের ব্যয় চা বাগানের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দিতে হইবে, কিন্তু আসামে অবস্থানকালে কুলিদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি মুক্তিফৌজের কর্ত্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখিতে পারিবেন। আশা করা যায়, অতঃপর কুলিদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২২।　　[৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনা

হে স্নেহময়ী জননি, বিশ্ব তোমার সৃষ্টি, বিশ্বের মধ্যে তোমার সাধের মানবপরিবার তোমার সৃজনক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। সৃষ্টির ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার মধ্যে তোমার কি এক সামঞ্জস্য, কি এক পরিপূর্ণতা, কি এক মঙ্গল বিধি নিয়মের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়! কোন স্থলে কোন ত্রুটি নাই, শৃঙ্খলার অভাব নাই, পরস্পরের সঙ্গে কোন জীবনময় বাধার বাঁধন নাই; সবই মুক্ত সবই বিকাশশীল, সবই পরিপূর্ণতার দিকে পদে পদে গতিশীল। ফুলটী ফুটে, পাতাটী ঝরিয়া পড়ে, বনে বিহঙ্গ মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত করে, আকাশে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রাদি বিকশিত হয়; সবারই ভিতরে সেই একই নিয়ম, একই বিজ্ঞান, একই কৌশল। ঘরে ঘরেও দেখি, মা, তোমার সেই একই লীলা। তন্মধ্যে কোন স্বরটী মধুরতম, কোন স্পর্শটী সুখদ, কোন আহ্বানটী জীবনপ্রদ, কোন আবেষ্টনটী মুক্তির সোপান? মা প্রেমময়ী, প্রতি পরিবারে তোমার স্নেহমূর্ত্তি, প্রেম-প্রতিমা এই যাঁরা রয়েছেন তাঁহারাই তোমার সেই অগ্রদূত। তাঁহারা প্রেমের ভাষায় কথা বলেন, স্বর্গের স্বরে আহ্বান করেন, হৃদয়ের গভীরতম শীতলস্পর্শ দান করেন। মা ভগবতি, তোমার কন্যাগণ এখনও তাঁহাদের এই আত্মমর্য্যাদা বুঝেন নাই, বা তোমার পুত্রগণ তোমার কন্যাগণের এই আত্মমর্য্যাদা লাভের পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। প্রতি সংসারকে তুমি সুগ্রাম করিবে, সব স্বরগুলিকে একত্র মিলাইয়া তাহার ভিতর দিয়া তুমি মধুর ঝঙ্কার তুলিবে, সকল হৃদয়ে তোমার আসন পাতিয়া তুমি গৃহপতি হইয়া থাকিবে, তোমার সেবার ধর্ম্ম সকলে সাধন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে এই তোমার মনঃসাধ। তবে ইহার প্রথম শক্তি নারীপ্রকৃতি; প্রথম জীবনদান

তাঁহাদের আত্মত্যাগ; প্রথম সাধনসোপান তাঁহাদের সপ্রেম সেবা। সেই ছবি সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সকলকে সেই দিকে আকর্ষণ করিবে এবং সেই আদর্শের তলে আত্মবলিদানে সকলকে সমর্থ করিবে। মা স্বর্গের দেবী, তোমার সে ইচ্ছা প্রতি পরিবারে সফল কর, এই প্রার্থনা।

হিন্দুবিধবার রাজ্যশাসন।

আমরা অনেক সময়েই বিদেশীয়দিগের নিকট অভিযোগ শুনিতে পাই যে, ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা গৃহপালিত জীব অপেক্ষা কোনও প্রকারে শ্রেষ্ঠ নহে। তাহাদের স্বীয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রকাশ পায় না। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ভারতীয়া নারী সুবিধা ও সুযোগ পাইলে অতিশয় আয়াসসাধ্য কার্য্যও কিরূপ দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন।

ভারতের অতি দুর্দ্দিনে অহল্যা বাঈ ইন্দোর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন মোগল সাম্রাজ্য দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমের শ্মশানশয্যা রচনা করিতেছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। হোলকার, ভোনস্লা ও সিন্ধিয়া পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির আশায় রাজ্য বিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাঈএর জন্ম হয় ও হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও হোলকারের সহিত বিবাহ হয়। যৌবনেই একটী পুত্র ও এক কন্যা লইয়া তিনি বিধবা হন। তাহার অল্পকাল পরেই তাঁহার একমাত্র পুত্র পরলোক গমন করেন। পুত্রের মৃত্যুতে রাজ্যের গুরুভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি টুকাজী হোলকারকে সামরিক বিভাগের ভার প্রদান করেন। তৎসঙ্গে যে সকল কার্য্য অহল্যাবাঈ স্বয়ং পরিচালনা করিতে পারিতেন না, সে সকল কার্য্যেও টুকাজীকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। টুকাজীর সহিত তাঁহার কর্ত্তব্যের বিভাগ দেখিয়া মনে হয় যে, এরূপ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না; কিন্তু অহল্যাবাই এমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন যে, এই ভাবে ত্রিশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা টুকাজীর পক্ষেও বিশেষ শ্লাঘার বিষয়।

অহল্যাবাঈএর শাসনকাল ঘটনাবহুল নহে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণের অভাবই এই যুগের বিশেষত্ব। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তাঁহার জীবিতকাল মধ্যে ইন্দোর রাজ্য মহারাষ্ট্র রাজ্যসমূহের মধ্যে অতি সম্মানিত স্থান অধিকার করে। অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে তিনি রাজ্যে

শান্তি রক্ষা করিতেন। সে যুগে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইত, কিন্তু তাঁহার শাসনকালে হোলকার রাজ্য কেহ আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। রাজ্যবিস্তারের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না, তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল দেশে শান্তি স্থাপন করা। তাঁহার সাধনা বিফল হয় নাই।

অহল্যাবাঈ রাজ্যচালনার গুরুতর দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দরবারে উপবেশন করিতেন এবং স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজস্ব যাহাতে প্রজার পক্ষে গুরুতর না হয় ও গ্রাম্য কর্ম্মচারী ও ভূমির স্বত্বাধিকারীর অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং প্রজার আবেদন নিবেদন শ্রবণ করিতেন। তিনি এই সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য বিশেষ মনোযোগ ও ধৈর্য্যের সহিত সম্পন্ন করিতেন।

এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি ত্রিশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। রাজ-কার্য্যের অবকাশকাল তিনি দান ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে, ধর্ম্মে গভীর অনুরাগ তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত সাংসারিক কার্য্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, রাজশক্তির যথোচিত পরিচালনার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী এবং মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কখনও কোন কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, মানব মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমরা ভগবানের কৃত কীর্ত্তি ধ্বংস করি।

তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে পূজা বন্দনা আরম্ভ করিতেন। তৎপর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ, দান ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। এই সকল কার্য্য সমাপন করিয়া, আহার করিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতেন। প্রায় ২ ঘটিকার সময় বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি দরবার গৃহে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তৎপর দুই তিন ঘণ্টাকাল ধর্ম্ম আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় শয়ন করিতেন। পূজা পার্ব্বণ ব্যতিরেকে এই দৈনন্দিন কার্য্যলিপির প্রায় অন্যথা হইত না।

তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত। অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ শাসনকাল মধ্যে উদয়পুরের রাণা ব্যতীত তাঁহার রাজ্য আর কেহ আক্রমণ করে নাই। সে যুদ্ধও অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। মহারাষ্ট্র রাজন্যবৃন্দ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা অহল্যাবাঈএর রাজ্য আক্র-মণ করা পাপকার্য্য বিবেচনা করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান সকল নরপতিই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। সকলে সমস্বরে তাঁহার দীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

শাসনকার্য্যে তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে তাঁহার চরিত্রে রমণীসুলভ কমনীয়তার অভাব ছিল না, অন্যদিকে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ও কঠোরতা দুর্ব্বৃত্তগণের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিত। রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। তাঁহার প্রজা সাধারণ ধনে জনে বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তিনি যেমন আনন্দিত হইতেন, এমন আর কিছুতেই হইতেন না। তাঁহার শাসন সময়ে ইন্দোর একটী নগণ্যস্থান হইতে বহুসৌধশোভিত নগরে পরিণত হইয়াছিল।

একদা সিরোঞ্জিনামক স্থানে শুভকেনদাস নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি পরলোকে গমন করেন। তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। পরিবারের ইচ্ছা ছিল যে, মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি রক্ষার সুব্যবস্থা করেন; কিন্তু অহল্যাবাঈএর স্থানীয় কর্ম্মচারী তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করে যে, তিন লক্ষ টাকা তাহাকে প্রদান না করিলে সমস্ত সম্পত্তি সরকারে জব্দ হইবে। বিধবা আত্মীয়গণ সহ অহল্যাবাঈএর শরণ লইলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শ্রবণ মাত্র বিধবার দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন এবং কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ কার্য্য হইতে অপসৃত হইল। বিধবা অনেক অনুরোধেও তাঁহাকে সামান্য উপহার গ্রহণে সম্মত করিতে পারিলেন না। হোলকার রাজ্যের একজন ইংরাজ মন্ত্রী Sir John Malclin অহল্যাবাঈএর নিঃস্বার্থপরতার একটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেরগাঁও নামক স্থানে টুপীদাস ও বারলসী নামে দুই ব্যক্তি প্রায় একই সময়ে অপুত্রক অবস্থায় বহু ধনসম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করে। টুপীদাসের বিধবা স্ত্রী অহল্যা-বাঈএর নিকট প্রস্তাব করেন যে, যে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার স্বামী ও দেবর অর্থসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার হস্তে সমস্ত সম্পত্তি ন্যস্ত করিতে ইচ্ছা করেন। অহল্যাবাঈ অর্থগ্রহণে সম্মত হইলেন না এবং বিধবাকে তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ কোনও জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। তদনু-সারে কেরগাঁওএর নিকট নদীতে একটী ঘাট, ঘাটে নামিবার সিঁড়ি ও গণপতির নামে উৎকৃষ্ট একটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। এই সকল কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

যুদ্ধের গল্প।

আজকাল যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও কথা নাই। যেখানে দুচারজনে মিলিত হইয়া গল্প করিতে বসেন, সেখানেই ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের কথা আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ের এই মহাযুদ্ধ আমাদের কথাবার্ত্তা চিন্তা কার্য্য সমস্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

কাগজপত্রেও যুদ্ধের বিষয়ে নানা কথা প্রতিদিন বাহির হইতেছে। সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধসম্বন্ধে গল্প করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এ যুগে যুদ্ধের ব্যাপারকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা,

১। স্থলের উপরে।

২। স্থলের নীচে।

৩। জলের উপরে।

৪। জলের নীচে।

৫। আকাশে।

এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ ঘটিয়াছে সমস্তই স্থলের উপরে ও জলের উপরে। ইতিহাসে আমরা এই দুইয়ের যুদ্ধের সহিতই পরিচিত। সৈন্য সামন্ত বন্দুক কামান গোলাগুলি ইত্যাদি লইয়া স্থলের উপরে যুদ্ধ, এবং রণতরী ও কামান লইয়া জলের উপরে যুদ্ধ, এই দুই প্রধান উপায়ের কথাই আমরা জানিতাম। কিন্তু এখন মানুষের শক্তি এত বাড়িয়াছে যে এত সহজভাবে যুদ্ধ করিয়া কেহ সন্তুষ্ট নয়, তাই স্থলের উপর ছাড়িয়া মানুষ স্থলের ভিতরে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জলের উপর ছাড়িয়া জলের নীচে হইতে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে; আবার জল ও স্থলে সন্তুষ্ট না হইয়া আকাশ হইতে শত্রু বিনাশের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এখন একে একে দেখা যাইতে পারে কোন অবস্থায় যুদ্ধপ্রণালী ও যুদ্ধকৌশল কি প্রকারের, বিশেষতঃ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কিরূপ।

প্রথম মাটীর উপরে যে প্রকারে যুদ্ধ হয় তাহা দেখা যায়। যুদ্ধের প্রধান মন্ত্র শত্রুর বলক্ষয়। বল অর্থে কেবল লোকবল নয়, অস্ত্রবলও ইহার মধ্যে আছে। এ বলক্ষয়ের প্রধান উপায় শত্রুকে নানাভাবে আক্রমণ করা ও তাহার সৈন্য ও অস্ত্র নষ্ট করিয়া দেওয়া। মানুষের আদিম অবস্থায় তীর ধনুক এবং তরবারি ইত্যাদি এই কাজে ব্যবহৃত হইত; তীর ধনুকই প্রধান ছিল, কারণ তাহাতে শত্রু নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বিনাশ করা সম্ভব ছিল। বহুকাল ধরিয়া ইহাই পৃথিবীর সকল দেশে চলিতে থাকে; কিন্তু যখন বারুদ প্রস্তুত হইল, তখন হইতে তীর ধনুকের দিন চলিয়া গেল। এখন তাহার স্থলে বন্দুক ও কামান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই কারণে আজকাল প্রত্যেক সৈনিককে বন্দুক দেওয়া হয়। বন্দুক নানা প্রকারের আছে; ইংরাজগণ যে প্রকারের বন্দুক ব্যবহার করেন, জার্ম্মাণ তাহা করে না; আবার ফরাসীদিগের বন্দুক অন্যরূপ। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ স্থির করিতে প্রত্যেক বন্দুক কত শীঘ্র গুলিবর্ষণ করিতে পারে, কত বড় গুলি কতদূর পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারে এই সকল নানা বিষয় দেখিয়া তুলনা করা হয়। যে বন্দুকে মোটের উপর এই গুণগুলি বেশী পাওয়া যাইবে তাহাকেই ভাল বলা হয়। বর্ত্তমান

যুদ্ধে কাহাদের এই অস্ত্র ভাল সে বিষয়ে অনেক তর্ক আছে এবং মতভেদও আছে, সুতরাং স্থির করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়।

এ সকল বন্দুকের পাল্লা (range) খুব বেশী, এমন কি কোনও কোনওটীর গুলি তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল যায় এরূপ শুনা গিয়াছে। তবে সাধারণতঃ বন্দুকের সাহায্যে এতদূর হইতে যুদ্ধ চলে না, কারণ এ অস্ত্র ব্যবহার করিতে লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া চাই, এবং সচরাচর এতদূর হইতে লক্ষ্য দেখা যায় না, সুতরাং লক্ষ্য দেখিতে না পাইলে বন্দুক ব্যবহার করিয়া লাভ নাই লক্ষ্যভেদ যতদূরে করিতে হয় বন্দুকের মুখ তত উঁচু করিতে হয়। গুলি নানা প্রকারের, নানা মাপের ও নানা ওজনের আছে। এই সকল তারতম্য অতি সামান্য. কিন্তু তাহা হইলেও যে বন্দুকের যে গুলি, তাহা ছাড়া অন্য বন্দুকে ব্যবহার করা যায় না। এক প্রকারের গুলি আছে, ইহা লক্ষ্যভেদ করিয়া ভিতরে ফাটিয়া যায়; ইহার ফলে এরূপ যন্ত্রণা হয় যে পৃথিবীর সকল জাতি মিলিয়া যুদ্ধে ইহার ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে জার্ম্মাণগণ এই "দম্‌দম্ বুলেট" নামক গুলি ব্যবহার করার দোষে অভিযুক্ত হইয়াছে।

বন্দুকের আর এক ব্যবহার আছে। প্রতি সৈনিকের সঙ্গে আন্দাজ এক হাত লম্বা একটী করিয়া ছোরা থাকে। ইহাকে "বেয়নেট্" বলে। এমন ব্যবস্থা আছে যে, প্রয়োজন হইলেই নিমেষমধ্যে এই বেয়নেট্ বন্দুকের মুখে বসাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এক এক সময় এরূপ হয় যে, দুই দল যুদ্ধ করিতে করিতে একেবারে পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় বন্দুক ব্যবহার না করিয়া দুই দলই তৎক্ষণাৎ বেয়নেট্ বন্দুকের মুখে বসাইয়া পরস্পরে শরীর বিদ্ধ করিবার জন্য আক্রমণ করে। এই সম্মুখযুদ্ধ অতি ভয়ানক, কিন্তু বর্ত্তমান সমরে বহুস্থলে বেয়নেট্ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় যে, জার্ম্মাণগণ কখনও কখনও সাধারণ বেয়নেট্ ব্যবহার না করিয়া দুমুখো করাতের আকারের বেয়নেট্ ব্যবহার করিয়াছে; এই ভয়ানক অস্ত্র শরীরে বিদ্ধ হইলে কি অবস্থা হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

বন্দুকের নানা রূপান্তর ঘটিয়াছে। যাহাতে গুলিবর্ষণ খুব দ্রুত হয় তাহার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অনেকে নানাভাবে এবিষয়ে সফল হইয়াছেন। সম্প্রতি "মেশীন্-গন্" নামে এক প্রকার অস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, কামানের পরে ইহার ন্যায় ধ্বংসকারী অস্ত্র বোধ হয় আর নাই। মেশীন্‌গন সাধারণ বন্দুক অপেক্ষা কিছু ভারী; একজন লোক কষ্টে এবং তিন জন লোক অতি সহজে ইহা বহন করিতে পারে। ব্যবহার করিবার সময় ফটোগ্রাফের বড় ক্যামেরার ন্যায় ত্রিপদবিশিষ্ট আসনে ইহাকে বসান হয়, এবং এমন ব্যবস্থা আছে যে চারিদিকে ইহার মুখ ঘুরান যায়। ইহার গুলি একটি লম্বা ফিতাতে সারি সারি বসান থাকে; এই ফিতা যথাস্থানে বসাইয়া কল ঘুরাইতে হয়, এবং গুলি নিক্ষেপ, গুলি যোগান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য

সমস্ত কাজ কলেই হইতে থাকে; ইহাতে আর হাত দিতে হয় না, বা হাত দিয়া পরে কিছুই করিতে হয় না। এই অস্ত্র অতি সাঙ্ঘাতিক, এবং ইহা হইতে মিনিটে প্রায় পাঁচশত গুলি বর্ষিত হয়। একটী মেশীন-গন্ বসাইলে তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিকের কাজ হয়, অথচ ইহা ব্যবহার করিতে মাত্র তিনজন লোক প্রয়োজন। ইহার পাল্লাও সাধারণ বন্দুকের ন্যায়, বরং কিছু বেশী হইতে পারে। এই সকল কারণে বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখা যাইতেছে যে, সম্মুখ সমরে ইহার ন্যায় ভীষণ অস্ত্র আর নাই।

বন্দুক ও মেশীন্-গন্ ভয়ানক বটে, কিন্তু কামানের কাছে ইহারা কিছুই নয়। ইহার আকৃতি যেমন ভীতিজনক, শক্তি তেমনই অসুরের ন্যায়। সাধারণতঃ কামান ৮।১০ হাত লম্বা হয়, কিন্তু ইহা এত ভারী যে চাকার উপরে বসাইয়া লইয়া যাইতে হয়। এ গুলি সরাইতে, লইয়া যাইতে ও যথাস্থানে বসাইতে অনেক লোকের প্রয়োজন, কারণ ওজনে এক একটি ১০।১২ মণ। এইগুলি সাধারণ কামান, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এ কামানের দিন প্রায় গিয়াছে। এত বড় বড় কামান সম্প্রতি ব্যবহার করা হইয়াছে যে তাহা ভাগ ভাগ করিয়া লইয়া গিয়া স্বস্থানে বসাইতে হইয়াছে; এক একটী ভাগের ওজন ১০।১২ মণের অধিক হইবে। এই ভাগগুলি দূরের পথ রেল-যোগে এবং রেলপথের অভাবে মোটরযোগে লইয়া যাইতে হয়। যখন সব অংশগুলি একত্রিত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হয়, তখন মানুষ তাহার কাছে ক্ষুদ্র পুতুলের মতন মনে হয়। এরূপ প্রকাণ্ড ভীমাকৃতি কামান ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। স্থলযুদ্ধে এত বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার এই প্রথম হইলেও, জলযুদ্ধে এরূপ কামানের ব্যবহার কিছুপূর্ব্ব হইতে হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে স্থলে এত ভারী জিনিস লইয়া গমনাগমন অতি অসুবিধাজনক, কিন্তু জাহাজে একবার যথাস্থানে ইহাকে বসাইয়া লইলে আর কিছু করিতে হয় না। এইজন্য জাহাজের কামান এত ভারী না হইলেও খুব লম্বা করা হয়, এমন কি ৩৭।৩৮ হাত লম্বা কামানও জাহাজে ব্যবহৃত হয়।

কামান এইরূপ বড় এবং লম্বা করিবার বিশেষ কারণ আছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কামানের নল যত লম্বা হইবে গোলার পাল্লা তত বেশী হইবে; কামানের নল ১০ হাত হইলে যদি গোলা ৪ মাইল যায়, তবে ২০ হাত হইলে তাহা ৬ মাইল যাইবে; এই কারণে সকলেই কামান লম্বা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থল কামানের নল অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াতে এইজন্য জাহাজের কামানের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, কারণ শেষোক্তের নল খুব লম্বা হওয়াতে তাহার গোলা স্থলে আসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু স্থল কামানের গোলা জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে না।

কামানের শক্তি বাড়াইতে হইলেই বারুদের পরিমাণ বাড়াইতে হয়, এবং বারুদ বাড়াইলেই যাহাতে তাহার ধাক্কা সহ্য করিতে পারে এবং কামান ফাটিয়া না যায়, এজন্য

কামানের নল এবং অন্যান্য অংশ খুব পুরু করিতে হয়। এই জন্য কামান যত শক্তিশালী হইবে তত তাহা ভারী হইবে, এবং পাল্লা যত বেশী হইবে তত কামান লম্বা হইবে। এই সকল ভারী কামান সহজে লইয়া যাইবার জন্য সময়ে সময়ে "মোটর কারের" উপর বসান হয়। এগুলিকে আর নামাইতে বা বসাইতে হয় না; "কারের" উপর হইতেই ব্যবহার করা যায়। যেগুলি চাকার উপর বসান থাকে সেগুলি ব্যবহার করার অনেক অসুবিধা। এরূপ কামানকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার সাহায্যে টানাইতে হয়, এবং সময়ে সময়ে গোলন্দাজগণকেও টানিতে হয়। আর এক অসুবিধা এই যে, মাটি যদি যথেষ্ট শক্ত না থাকে তবে কামানের ভারে চাকা মাটিতে বসিয়া যায়, এবং তাহা ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য একটী নূতন কৌশল বাহির করা হইয়াছে। কামানের চাকার চারি ধারে বড় বড় পিঁড়ীর মতন কাঠের মোটা তক্তা ফাঁক ফাঁক করিয়া লাগান হয়; ইহাতে সুবিধা এই যে, চাকা ঘুরিবার সময় কামানের ভার চাকার উপরে না পড়িয়া ঐ কাঠের পিঁড়ীগুলির উপর পড়ে এবং এইরূপ হওয়াতে চাকা মাটিতে আর বসিতে পায় না; আবার আর এক সুবিধা এই যে, এ উপায়ে অপেক্ষাকৃত অসমান ভূমিতেও কামান সহজে টানিয়া লওয়া যায়। এইরূপ চাকাকে Caterpillar wheels বা "গুটিপোকা চাকা" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই কৌশল এই যুদ্ধেই প্রথম জানিতে পারা গিয়াছে।

কামান এত ভারী হইলেও ইহাতে এমন একটী ব্যবস্থা আছে যে, খুব সহজে কামানের মুখ উঁচু নীচু করা যায়; কামানের সঙ্গে খুব ছোট একটী চাকা লাগান থাকে এবং ঐ সঙ্গে অন্য অন্য চাকা এমন ভাবে সাজান থাকে যে প্রথম চাকাটী ঘুরাইলেই কামানের মুখ ইচ্ছামত উপরে উঠিতে কিম্বা নীচে নামিতে থাকে। ইহার কারণ এই, আমরা সকলেই জানি যে, যদি কোনও জিনিষ ছুড়িয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সোজা ফেলিলে তাহা বেশী দূর যায় না; আবার যদি তাহা খাড়া মাথার উপর ফেলা যায়, তাহা হইলে যত জোরেই ফেলা হউক না কেন তাহা মাথার উপরেই পড়িবে; কিন্তু যদি সম্মুখে কিম্বা ঊর্দ্ধে সোজা না ফেলিয়া ঠিক মাঝামাঝি কোণাকুণি ফেলা যায়, তাহা হইলে জিনিষটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গিয়া পড়ে। সামান্য কোনও জিনিষ নিক্ষেপ করা সম্বন্ধে যে নিয়ম, কামানের গোলা নিক্ষেপ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। কামান যদি সোজা রাখিয়া গোলা নিক্ষেপ করা যায়, তবে গোলা এত ভারী বস্তু যে যত বারুদই দেওয়া যাক না কেন, কিছুদূর যাইতে না যাইতেই তাহা মাটিতে আসিয়া পড়িবে। আবার যদি পূর্ব্বোক্ত চাকা ঘুরাইয়া কামানের মুখ একটুখানি উঁচু করা যায়, তবে গোলা কিছু বেশীদূর পর্য্যন্ত যাইবে; যদি আরও উঠান যায় তবে গোলা আরও বেশীদূর গিয়া পড়িবে। এইরূপে দেখা যায় যে মাঝামাঝি একটা স্থান আছে, সেই পর্য্যন্ত কামানের মুখ উঁচু করিয়া যদি নিক্ষেপ করা যায়, তবে গোলা সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক দূরে গিয়া পড়ে। এই কারণে কামানের মুখ ইচ্ছামত উঠাইবার ও নামাইবার ব্যবস্থা আছে, কারণ তাহা দ্বারা গোলা ইচ্ছামত দূরে বা নিকটে ফেলা যায়। শত্রু যদি নিকটে থাকে, তবে কামানের মুখ অল্প উঠাইতে হয়, আর যদি দূরে থাকে, তবে বেশী উঠাইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

লুকোচুরী খেলা।

এমন ক'রে খেল্‌ছ তুমি লুকোচুরী খেলা,
সাজে কি এ আমার সাথে সন্ধ্যা সকাল বেলা ?
দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র আমি,
কত মহৎ ওগো তুমি,
তবুও ওগো ভুল্‌তে নার খেল এমন খেলা,
জগৎ জুড়ে দিবস রাতি একি প্রেমের মেলা !

দিনের এই কাজের মাঝে ডুবিয়ে রাখি মন,
শূন্য কভু রাখনাত তোমার প্রেমাসন ;
বুঝতে যদি নাহি পারি,
তবু ওগো হৃদয়হারী,
কাজের মাঝে পরশ দিয়ে লও যে আমার মন,
খেল্‌ছ তুমি কেমন খেলা বুঝে না রাজন্ !

আঘাত পেয়ে হৃদয় যবে লুটিয়ে নুয়ে পড়ে,
বুকের গভীর মর্ম্মতলে রক্তধারা ঝরে ;
তখন তোমার স্নিগ্ধ আঁখি—
হৃদয়মাঝে আছে দেখি,
তোমার মুখের মধুর বাণী সকল দুঃখ হরে,
তোমারি পায়ে অশ্রুরাশি আপনি পড়ে ঝরে !

বাহিরেতে ভ'রে উঠে যবে হাসির রোল,
বিশ্বে যবে জেগে উঠে আনন্দ কল্লোল ;
তখন ত আর হৃদয়টীরে
রাখতে নাহি পারি দূরে,

তোমার প্রেমের পরশ এসে দেয় যে মোরে দোল,
বিশ্ব এসে জানায় তব আনন্দ হিল্লোল!

এমনি করে নিত্য নব খেল্‌ছ কতই খেলা,
ভাবি শুধু আপন মনে একি প্রেমের মেলা!
সকল সময় এমন ক'রে—
জাগিয়ে তুমি দাও যে মোরে,
আমার সুখের দুখের মাঝে ভাসিয়েছ যে ভেলা,
কোন মতেই পারিনে তাই করতে তোমায় হেলা!

জিজ্ঞাসা।

ভোরের আধেক আলোর মাঝে
কাহার বীণার তারটী বেজে,
ভাঙলো এ ঘুম মেলিনু আঁখি মোর?
মেলিয়া নয়ন পাতা দুটী,
দেখিনু বিশ্বে উঠেছে ফুটি,
আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়ে কাহার হাসির লোর?
পূরব কোণে সোণার থালা
উঠ্‌ছে হেসে করিয়ে আলা,
মন্দ মধুর স্নিগ্ধ বাতাস বহিছে ধীরে ধীরে;
শিশির কণা পাতার পরে
লাজে নত লুটিয়ে পড়ে,
কাহার কোমল স্পর্শখানি রয়েছে ভুবন ঘিরে?
নীল আকাশের তলে তলে
পাখী গুলি দলে দলে,
যাচ্ছে যেন কোথায় তারা গেয়ে কাহার গান?
ভোরের মধুর পরশ পেয়ে,
আপন কাজে যায় যে ধেয়ে,
ছোট বড় যে যেখানে জাগ্‌ল সকল প্রাণ!
দিনের শেষে রাত্রি এলে
সবাই আবার যায় যে চ'লে,

আপন আপন ঘরের পানে, যায় যে নীড়ে ফিরে ;
নিদ্রা-অলস নয়ন তারা
ঘুমিয়ে পড়ে হয় যে হারা,
কে শিয়রে জেগে থেকে বাঁচায় জীবনটীরে ?
আবার নূতন প্রভাত এলে
নয়ন দুটী যায় যে খুলে,
কাহার হাতের পরশ পেয়ে জাগি পুনরায় ?
কোন্ যাদুকর এমন খেলা
খেল্‌ছে সন্ধ্যা সকালবেলা,
কোথায় গেলে কাহার কাছে মিল্‌বে পরিচয় ?

NURSING অর্থাৎ সেবা, শুশ্রূষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যিনি রোগীর সেবা করিবেন তাঁর কি কি গুণ থাকা দরকার ? আর্ত্ত ও আহতের সেবা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেবা যদি জীবনের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সে সাধনে কোনওরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটে না। রোগীর সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ সাহস দরকার, অনেক রোগ মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। মানুষ পৃথিবীতে মৃত্যুকে যে রকম ভয় করে, এ রকম আর কিছুতেই করে না। আপনারা বোধ হয় সেই যম ও কাঠুরিয়ার গল্প সকলেই জানেন। পৃথিবীতে মৃত্যু যেমন নিশ্চয়, তেমনি লোকেরাও তাহা ভুলে যায়। আপনারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের উক্তি বোধ হয় স্মরণ করিবেন।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

অনেকে দুঃখ কষ্টে পড়িয়া মরণ কামনা করেন, কিন্তু যখন যথার্থ সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন তাঁদের প্রাণে কি ভয়ানক ত্রাস উপস্থিত হয়। রোগ সেই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ, সুতরাং সেই রোগযন্ত্রণার সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে কত যে সাহসের দরকার, তাহা আপনারা অনুমান করুন। রোগে মানুষের কত প্রকার আকৃতির বিকৃতি উপস্থিত হয়, জানি না তাহা আপনারা দেখিয়াছেন কি না। বসন্তরোগে রোগীর শরীর যে প্রকার আকার ধারণ করে, তাহা অতিশয় ভীতিজনক। ধনুষ্টঙ্কার রোগে যখন সমস্ত শরীর বাঁকিয়া যায়, ধনুকের আকার ধারণ করে তখন তার কাছে বসিয়া থাকিতে অতি অল্প লোকেরই সাহস হয়। তার পর রোগের সংক্রামকতার

কথা যখন মনে হয়, তখন রোগীর নিকট উপস্থিত থাকা এবং তার সেবা করা সহজেই মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়। আর খুব আপনার লোকের দুরারোগ্য রোগের সেবা করা যে কি কষ্টদায়ক, তা বোধ হয় সকলেই জানেন।

যখন ডাক্তারেরা রোগ অসাধ্য বলে মত প্রকাশ করেন, তখনও তার সেবা করিতে হইলে মনকে যে কত শক্ত ও সাহসে পূর্ণ রাখিতে হয়; আর সে সাহস না থাক্‌লে তার সেবা কার্য্য করা অসম্ভব হয়। নিরাশায় হাত পা অশক্ত হইয়া পড়ে, আর মন যদি ঠিক না থাকে কোন কাজই করা যায় না। এইখানে আপনাদের কাছে একটী রোগীর সেবার কথা বলিতেছি। রোগীর প্লেগ হ'য়েছে, তার জ্বর দিন রাত্রি খুব বেশী ১০৫।১০৬ ডিগ্রী, কিছুতেই কমান যাচ্ছে না; ডাক্তারেরা নানারকম ঔষধ ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করেও বিফল হইতেছেন, রোগীর জ্বর কমাইবার জন্য অনবরত বরফ লাগান হ'চ্ছে। অবশেষে দেখা গেল যে জ্বর ১০৬এরও উপর উঠিতেছে, তখন ডাক্তারেরা মনে করিলেন যে এই টেম্পারেচার কমাইতে না পারিলে রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে, সেজন্য ice packing ব্যবস্থা করিলেন। রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ বিদ্যমান। সে অতিশয় কৃশকায়, সেজন্য যখন তার গায়ে বরফ লাগান হইল, তখন তার ঠাণ্ডার দরুণ কষ্ট হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ডাক্তারদের কথায় ও জ্বর কমিবার আশায় সেই কষ্ট সহ্য করিল, কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমিল না, আর সেই বরফের ঠাণ্ডায় কষ্ট ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সে অতি কাতরে ডাক্তারদের বলিল যে, "বড় কষ্ট হইতেছে, আর বরফ লাগাইবেন না।" কিন্তু নিষ্ঠুর ডাক্তারেরা তার সে কথা শুনলেন না, তখনও তাঁরা জ্বর কমাইবার আশায় বরফ লাগাইতে লাগিলেন, আর যে সকল আত্মীয়েরা সেই রোগের সেবা করিতেছিলেন তাঁহাদের বরফ লাগাইতে বল্লেন। এইরূপ অবস্থায় সেই সেবাকারীদের কতদূর মনের জোর দরকার; আত্মীয় রোগীর কাতর নিবেদন এক দিকে, অন্য দিকে ডাক্তারের আদেশে কর্ত্তব্য কার্য্য, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা রাখা কত যে মনের সাহস ও শক্তির আবশ্যক তাহা আপনারা ভেবে ঠিক করুন। রোগীর সেবা করতে মনের সাহস ও শক্তির যেমন প্রয়োজন, শরীরের শক্তিরও সেইরূপ বিশেষ দরকার। রোগী যেমন মানসিক অসমর্থ, তাকে সেবা করতে সেবাকারীর তদ্রূপ যথেষ্ট শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। রোগীর সেবা করতে যে কত পরিশ্রম করতে হয়, কত রাত্রি জাগতে হয় তাহা আপনারা জানেন। রোগীর সেবা করতে করতে শরীর সহজেই ক্লান্ত হইয়া যায়। মানসিক শক্তি না থাকলে রোগীর কাছে যাওয়াই যায় না, আর শারীরিক শক্তি না থাক্‌লে অশক্ত অক্ষম অথর্ব্ব রোগীর সহায়তা করা কিরূপে সম্ভব হবে? আপনারা কখনও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখেছেন কিনা জানি না। যখন সে ঐ রোগাক্রান্ত হয়ে হাত পা ছুড়তে থাকে, আর ক্রমাগত মাটিতে মুখ ঘসটাইবার চেষ্টা

করতে থাকে, তখন তাকে ঠিক করে রাখা যে কত শক্তিসাধ্য তাহা বলা যায় না। বায়ুরোগে রোগীর শরীরে অসাধারণ ক্ষমতা উপস্থিত হয়, তাকে সামলাইতে খুব জোরের দরকার। আর যে পাগল হ'য়ে গেছে তার সেবা করতে হলে মানসিক ও শারীরিক শক্তির বিশেষ দরকার। এমন দেখা গেছে যে কেবল পাগলের চাহনিতে তাহার সেবায় নিযুক্ত লোকেরা একেবারে শক্তিহীন ও অসমর্থ হয়ে গেছে, যেন Hypnotized হইয়া গেছে এবং পাগল তাদের কাছ থেকে পলাইয়া গেছে। আমার এক বাল্যবন্ধু পাগল হয়ে গিয়েছিল, একদিন তাকে দেখতে গিয়াছিলাম এবং তার কাছে বসে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ সে আমাকে আদর করে জাপটাইয়া ধরিল। আমার বোধ হইল যে, যেরূপ জোরে সে আমাকে জাপটাইয়া ধরেছে আমার সমস্ত শরীরের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম ভঙ্গের কথা মনে হল। যাহা হউক অতি কষ্টে আমি সেই বন্ধুর প্রেমালিঙ্গন হতে কোনও রকমে নিজেকে উদ্ধার করলাম। রোগীর সেবা করতে হলে কত অনিয়ম কত কষ্ট সহ্য করতে হয়। শরীর যদি বিশেষরূপ শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু না হয়, তাহ'লে রোগীর সেবা করা সহজ হয় না। কত সময়ে দেখা গেছে যে রোগীর সেবা করতে করতে অনিয়ম ও কষ্টের জন্যে সেবাকারী নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ক্লান্তির দরুণ হয়ত হাত থেকে ঔষধের গেলাস কিম্বা দুধের বাটি পড়ে যায় অথবা পাখা বাতাস করতে করতে রোগীর মাথায় লাগাইয়া দেন। অনেক সময়ে রোগীকে উঠাতে হয়, এই কাজ করিতে বিশেষ নিপুণতা ও সামর্থ্যের আবশ্যক। শারীরিক ও মানসিক শক্তি মেয়েদের বেশী না পুরুষদের বেশী, এবিষয় লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, আর সেইজন্য সেবা করতে মেয়ে পুরুষদের মধ্যে কে বেশী উপযুক্ত এই লইয়াও অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। মেয়েরাই কিন্তু অনেকদিন হইতে সেবা-কার্য্যে খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন ও আর্ত্ত ও আহতের সেবা করিয়া থাকেন। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রেও মেয়ে সেবাকারীরা অগ্রসর হইতে ভয় পান না, সুতরাং তাঁহাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি যে পুরুষদের অপেক্ষা কিছু কম তাহা নহে। রোগীর সেবাকারী হইতে গেলে মানসিক ও শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং যাঁহারা এই সেবাব্রতে ব্রতী হইতে চান, তাঁহারা নিজেদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি বাড়াইবার জন্য যে যে উপায় ও শিক্ষার আবশ্যক তাহা যেন অবলম্বন করেন।

রোগীর সেবাকারীর দ্বিতীয় গুণ হইল পরিস্কৃতি।

যিনি Nurse হইবেন তাঁহার খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া রোগীর কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া Nurse এর একটী প্রধান গুণ। জানিনা আপনারা হাঁসপাতালে Nurseদের দেখিয়াছেন কিনা, তাহাদের পোষাক ও সমস্ত কাজকর্ম্ম কিরূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। রোগের অবস্থায় সমস্তই

অপরিষ্কার ও অগোছাল হইয়া যায়, রোগী নিজে অতিশয় অসহায় হইয়া পড়ে ; সেজন্য কাপড় চোপড় এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল দ্রব্য অপরিষ্কার ও অগোছাল হয় এবং নিজে সেই সকল সামলাইয়া গুছাইতে পারে না। এই অপরিষ্কার ও অগোছাল অবস্থায় রোগের বৃদ্ধি হয়, যন্ত্রণার উপশম না হইয়া বরং বাড়িতে থাকে।

সেবাকারীকে রোগীর চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকল পরিষ্কার করিয়া ও গুছাইয়া দিতে হয়। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন দেখিলে রোগীর অনেক আরাম হয়। অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতায় রোগবীজের বিস্তার হয়, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগের। রোগীকে ঔষধ ও পথ্যাদি খাওয়াইয়া সেই সব গেলাস বাটি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রাখিতে হয়। না রাখিলে নানা রকম বিপৎপাতের সম্ভাবনা। ঔষধের গেলাস ধোয়া না থাকায় দেখা গিয়াছে যে, সেই গেলাসে জল খাওয়ার দরুণ এমন কি জীবনহানি পর্য্যন্ত হইয়াছে। ঘর অপরিষ্কার থাকিলে মাছি মশার কত উপদ্রব হয়। এমন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে রোগীর ঘর এত অপরিষ্কার, এমন কি এত দুর্গন্ধময় যে, সে ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব। আপনারা কেহ যদি হাঁসপাতালে গিয়া থাকেন, তাহ'লে এবিষয়ে কিরূপ সাবধান থাকা দরকার দেখিতে পাইবেন। সেখানে এক একটী বড় বড় ঘরে এক সঙ্গে কত রোগী রহিয়াছে, কিন্তু কোন জায়গায় একটুকুও অপরিষ্কার কিম্বা দুর্গন্ধ নাই। আর আমাদের বাড়ীতে আমরা একটী রোগীর সম্বন্ধে এইরূপ সতর্ক হইতে পারি না, এবিষয়ে আমাদের কত শিক্ষা দরকার। রোগীর ঘরের জিনিষ পত্রগুলি ঠিক রকম করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে হয়, এবিষয়ে অসাবধান হইলে অনেক রকম বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। খাবার ঔষধের শিশি যদি বিষাক্ত মালিশের শিশির সহিত এক যায়গায় রাখা হয়, তাহা হইলে খাবার ঔষধ দিতে গিয়ে মালিশের ঔষধ অনেক সময়ে ভুলক্রমে দেওয়া হইয়া থাকে ; আর তাহাতে যে কত বিপদ, এমনকি জীবনহানি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। জিনিষপত্রগুলি ঠিকমত গুছাইয়া রাখিলে এই প্রকার ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় মনের একটা বিশেষ তৃপ্তিবোধ হয়। সেবাকারীর এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার এবং নিজের স্বভাবকে এবিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সেবাকারীর তৃতীয় গুণ হচ্ছে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা।

বিষণ্ণভাবে যদি রোগীর কাছে যাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর যন্ত্রণা কষ্টের উপশম না হইয়া বাড়িতেই থাকে। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিসে আরাম পাইবে সে বিষয়ে অনবরত ভাবিতেছে, আর সেই সময়ে তাহার সেবাকারী যিনি তাহার যন্ত্রণার উপশমের জন্য সাহায্য করিবেন, তিনি যদি মুখখানি ভার করিয়া কিম্বা খুব বিরক্তভাবে তাহার কাছে উপস্থিত হন, তাহা হইলে কোন প্রকারই উপকার হয় না। প্রফুল্লভাবে রোগীর কাছে উপস্থিত হইলে তাহার যন্ত্রণা অনেক

দূর করিতে পারা যায়। প্রফুল্লতার সংক্রামকতা গুণ আছে, একজন প্রফুল্ল-ভাবাপন্ন লোক নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রফুল্ল করিতে পারে। হাসি মুখ অন্যের মুখেও হাসি আনিয়া দিতে পারে। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবের সহিত প্রফুল্লতার অতি নিকট সম্বন্ধ। রোগীর কাছে যাইয়া যদি হাসি মুখে মিষ্ট কথায় তাহার সহিত গল্প করা যায়, তাহা হইলে সে রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কত আরাম ও শান্তি লাভ করে, সুতরাং এই গুণটী সেবাকারীর থাকা খুব দরকার। সেবাকারীর স্বভাব নম্র শান্ত ও মিষ্ট হওয়া উচিত। উগ্রস্বভাব হইলে কখনও সেবা করা যায় না। যিনি অল্পেতেই বিরক্তিবোধ করেন, তিনি রোগীর সেবা করিতে পারিবেন না। সেবা করিতে হইলে মানসিক ও শারীরিক অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। রোগীর প্রহার কটুকথা এ সকল নম্রস্বভাব না হইলে সহ্য করা অসম্ভব। তিনি যদি উল্টে রোগীকে প্রহার করেন অথবা তাহার কটুকথার জবাব দেন, তাহা হইলে সেবা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে রোগী বিকারগ্রস্ত হইয়া হস্ত পদ দ্বারা সেবাকারীকে আঘাত করেন অথবা প্রলাপের সহিত অনেক সময়ে গালাগালিও করিয়া থাকেন। সেবাকারীকে সেই সকল অবাধে শান্তভাবে সহ্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতে হয়।

আমাদের একটী বন্ধু হঠাৎ পাগল হইয়া যান. সেই পাগল অবস্থায় তিনি সকলকে মারিতে যান, কামড়াইতে যান, খামচাইতে যান, এমন কি যাঁহাকে সহজ অবস্থায় অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন তাঁহাকে পদাঘাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই, এবং গুরুজনদিগের সামনে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেবা করিবার সময়ে কিরূপ সহ্যগুণ দরকার হইয়াছিল, আপনারা অনুমান করে নিন। নম্রতা, শান্তভাব ও সহিষ্ণুতা সেবাকারীদের অলঙ্কার স্বরূপ হওয়া উচিত। রোগীর সেবাকারীর উপস্থিত বুদ্ধিরও বিশেষ দরকার। হঠাৎ কোনও দরকার পড়িলে প্রত্যুৎ-পন্নতার দ্বারা কার্য্য করিতে হয়। রোগীর সেবা করিতে করিতে হঠাৎ অনেক অভাবনীয় ঘটনায় পড়িয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত হন, এবং কিছুতেই সামলাইতে পারেন না। অনেক সময়ে রোগীকে ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইতে বড় কষ্ট পাইতে হয়। যিনি ঔষধ কিম্বা পথ্য খাওয়াইবেন, তিনি যদি অতি সহজেই বিরক্ত হইয়া যান, তাহা হইলে সেই কাজে কিছুতেই কৃতকার্য্য হন না।

ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইবার সময়েও অনেক সময়ে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা অনেক নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। তারপর রোগীর সেবাকার্য্যে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ঔষধ পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কোন্ ঔষধ কি প্রকারে খাওয়াইতে হয়, কিরূপে মালিশ করিতে হয়, কিরূপে পুল্টিশ দিতে হয়, কিরূপে বরফ দিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকল রোগীর সেবা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। রোগীর চারিদিকের বস্তু সকলের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার।

সেবাকারীর কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটী রোগীর সম্বন্ধে, আর একটী চিকিৎসকের কাছে রোগীর সকল অবস্থার বিবরণ বলা এবং তাঁহার নিকট হইতে রোগীর সেবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; সুতরাং রোগীর সম্বন্ধে যদি তাঁহার সমস্ত দিন রোগীর চারিদিকের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না থাকে, কেবল যদি কলের মত চিকিৎসকের আদেশ পালন করিয়া যান, তাহা হইলে রোগীর সেবা ঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না; কারণ রোগীর কখন কি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক উপস্থিত হইলে তাঁহার কাছে বেশ সহজভাবে বর্ণনা করিতে হইবে, তবে চিকিৎসক রোগীর সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন। যখন রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন সকল দেখিতে থাকিবেন তখন সেবাকারীর যদি নিজের কিছু বিচারশক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। হঠাৎ জ্বর বেশী হইল কেন, কিম্বা রোগী সমস্তক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিল কেন, কিম্বা হঠাৎ ঔষধ অথবা পথ্য খাওয়াইবার সময়ে বমন হইল কেন এইরকম নানা ঘটনার কারণ ঠিক করিবার জন্য নিজের বিচারশক্তি নিয়োগ করা দরকার। পরে চিকিৎসককে সেই সকল বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাহার কারণ সিদ্ধান্ত করা উচিত। রোগীর সেবা করিতে হইলে সুতরাং খুব সতর্ক থাকিতে হয়, আর বুদ্ধির ও বিচারশক্তিরও প্রয়োজন আছে। সেবাকারীর কর্ত্তব্যবোধ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় সকলেই জানেন। কর্ত্তব্যবোধ না থাকিলে কোন কাজই হয় না, বিশেষতঃ সেবাকারীর মনে কর্ত্তব্যবোধ বিশেষরূপে জাগরূক থাকা দরকার। কেবল যদি পয়সার খাতিরে পেশাদারের মত সেবা করা হয়. মনের ভিতরে কর্ত্তব্যবোধ না থাকে, রোগীর সেবাকার্য্য কোনরূপেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অনেক সময়ে সেবাকারীরা যন্ত্রের মতন চিকিৎসকের আদেশ পালন করিয়া থাকেন এবং মনে করেন যে তাহা হইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন হইল; কিন্তু রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিজেদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসকের ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন কখনও কখনও করিতে হয়। তবে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক ভাবে কাজ করিতে হয়। চিকিৎসক হয়ত দুই ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন. সেই কারণে অনেক সময়ে হয়ত সেবাকারীরা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, কিন্তু অনেক সময়ে এই প্রকার কষ্ট দিবার বিশেষ আবশ্যক থাকে না। সেবাকারীর নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বারা ইহা নিরূপণ করা উচিত। আবার অনেক সময়ে রোগীকে রোগের আবল্যে নির্জীব নিদ্রিতপ্রায় মনে হয়, তখন হয়ত সেই অবস্থায় ঔষধ সেবন করান বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল অবস্থায় তারতম্য করিবার ক্ষমতা সেবাকারীর থাকা দরকার। নয়ত অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

আমার স্বর্গ ।

(শ্রীফুল্লময়ী দেবী ।)

১

যেথায় তোমার　　　　নিবাস সখে,
　　নিত্য যেথায় রওগো তুমি,
স্বর্গ সে কোন্　　　　সুদূর পুরে
　　সেইত আমার স্বর্গভূমি ।

২

নিত্য যেথায়　　　　দুর্ব্বাশিরে
　　পড়ে তোমার পায়ের ধূলো,
সেইত আমার　　　　দেহের ভূষণ
　　কাজ কি রতন মাণিক গুলো ।

৩

আনন্দ আর　　　　আশায় ভরা
　　তোমার দুটী চোখের তারা,
যে দিকে চায়　　　　আমায় জড়ায়
　　ঢালে হর্ষ-আলোক ধারা ।

৪

তোমার চোখের　　　　প্রেমাশ্রু জল
　　যেদিন আমার শিরে ধরি,
গৌরবেতে　　　　পরাণ ভরে
　　যেন, রাণীর কিরীট মাথায় পরি ।

৫

রোমাঞ্চিত　　　　করে শরীর—
　　সুরভি ওই নাসার নিশ্বাস ।
পারিজাতের　　　　গন্ধ বহা—
　　সেইত আমার দক্ষিণ বাতাস ।

৬

তোমার প্রেমের　　　　গঙ্গাজলে
　　নিত্য আমি সিনান করি,
তাইতে আমি　　　　শুচি হই হে
　　বিনা গঙ্গা গোদাবরী ।

৭

তোমার কণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া
উঠছে সেথায় সেতার বীণা।
তোমার সুখের একটী কথায়
বেদ শুনিছে উদাসীনা।

৮

বিশ্বভোলা পাগল আমি
ভুলে গেছি আমি তুমি।
চাইনা আমি তোমা ছাড়া
সুদূরের সেই স্বর্গভূমি।

(সম্মিলনী)

সতী-মন্দির।

স্বামীর ভালবাসা বুঝিবার পূর্ব্বেই দৈবদুর্ব্বিপাকে সরোজবাসিনীর স্বামীর মৃত্যু ঘটিল। যখন তাহার গাত্র হইতে এক এক করিয়া অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লওয়া হইল, তখন স্বামীর মৃত্যু অপেক্ষা সেইটাই তাহার বুকে বিঁধিল। স্বামীর মৃত্যুতে সকলের কান্নার সঙ্গে সে যোগ দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু কাতর হয় নাই। অবুঝ বালিকা সেত তখন বুঝে নাই যে, অপর একজনের অদৃষ্টসূত্রের সঙ্গে তাহার জীবনের সুখ দুঃখ কিরূপভাবে জড়িত এবং সহসা তাহারই তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বালিকাজীবন নাবিকহীন তরণীর ন্যায় সংসার সমুদ্রে লক্ষ্যশূন্য হইয়া ভাসিতে থাকিবে। কিন্তু সে যাহা বুঝে নাই, সংসার তাহা বুঝাইতে ছাড়িবে কেন? পারিপাট্যহীন সজ্জার দীনতায় সরোজের প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কিন্তু সমাজের কড়া শাসন বালিকার মর্ম্মবেদনাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার চিরপ্রচলিত ব্যবস্থার নড়চড় হইতে দেয় নাই। দয়া দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দিলে শাসন পদে পদে বাধিয়া যায়, তাই হৃদয়হীনের ন্যায় ব্যবস্থা ও দণ্ড বুকে করিয়া পাষাণের মতন সমাজ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যতক্ষণ ভয় ততক্ষণ তার অস্তিত্ব, তাই এই শাসন-ভয়ের নাগপাশ হইতে সে কোনমতে নিজের ইচ্ছায় কাহাকেও মুক্তি দিতে চাহে না। এই ভয় ভাঙ্গিলেই সে ছায়ার ন্যায় অসার হইয়া পড়ে, তাহার সমগ্র শক্তি একেবারে অচল হইয়া যায়। বালিকা হৃদয়ের স্বাভাবিক দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া সে তার শাসনের বোঝাটাকে বালিকার কোমল স্কন্ধের উপর গুরুতরভাবে চাপাইয়া দিয়া, তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে চিরদিনের জন্য ম্লান করিয়া দিল।

জামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সরোজের মাতা কন্যার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন।

ব্যথিতা কন্যার সমস্ত বেদনা মাতার গভীর স্নেহ-বেষ্টনের মধ্যে শান্তিলাভ করিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেলে, তিনি চলিয়া গেলেন। বিপুল শ্বশুরালয় ক্ষুদ্র বালিকার নিকট মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক বোধ হইল।

দরিদ্রের কন্যা রূপ ও কুলমর্য্যাদার জোরে ধনবানের গৃহে পুত্রবধূ হইয়াছিল। বরাবরই সেত বেশ আদর যত্ন পাইয়াছে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সমস্ত কেন যে উল্টাইয়া গেল, সে তাহার মীমাংসা করিতে পারিল না। কোন অপরাধ করে নাই, তবে সে সকলের সহসা বিষ নজরে পড়িল কেন? পূর্ব্বে যাঁহারা তাহাকে 'মা লক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এখন তাঁহারাই বা কেন তাহাকে 'ডাইনী' 'রাক্ষসী' বলেন? স্বামীর মৃত্যুর জন্য সেই নাকি দায়ী, তার 'এয়োতের' জোর থাকিলে এত বড় একটা দুর্ঘটনা নাকি ঘটিত না, এসব যুক্তিতর্ক সে ভাল রকম বুঝিতে পারিত না; কিন্তু ইহার ফলে যে সব ছোট বড় অত্যাচার তাহাকে সহ্য করিতে হইত, তাহাতেই তাহার প্রাণান্ত হইত। অসহ্য যন্ত্রণায় আকুল হইয়া অত্যাচারপীড়িতা অসহায়া বালিকা অন্তরালে একেলা বসিয়া শুধু নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত।

মানুষ ঘরের কোণে বসিয়া সুখ দুঃখের হিসাবের অঙ্ক কসে, কিন্তু সময় তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না—সে দাঁড়ায় না, ফিরিয়া দেখে না, হু হু শব্দে চলিয়া যায়। ভাঙচুর তাহারই অঙ্কে, হাসি অশ্রু তাহারই সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তার নিজের গতি যে চঞ্চল—এই চঞ্চলতাতেই বোধ হয় তার সুখ।

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল, এই তিন বৎসর ধরিয়া সরোজ অনেক সহ্য করিয়াছে; কিন্তু সমস্ত জিনিষেরই একটা মাত্রা আছে, সুতরাং লাঞ্ছনা ক্রমে মাত্রা ছাড়াইলে, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা বুঝিল যে শ্বশুরালয়ে তাহার স্থান অকুলান হইয়া পড়িতেছে। সে কোথায় যাইবে? মাতার নিকটে? সেখানেত তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। দরিদ্রা জননী তাহার জন্য যে বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইবেন, সে তাহা বুঝিল, কিন্তু সেখানে যাওয়া ভিন্ন আর যে উপায় নাই। স্নেহসমুজ্জ্বল মাতৃঅঙ্কে আবার সে ফিরিয়া যাইবে, এ কথাটা যখনই তাহার মনে হয়, তখনই সহস্র কষ্টের মধ্যেও কেমন একটা বিমল সুখ চকিতের মতন দুঃখের জমাট অন্ধকারকে ঠেলিয়া দেয়।

মনে মনে সরোজ যাহা আঁচ করিয়াছিল, কাজেও তাহাই হইল। শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহাকে জন্মের মতন বিদায় লইতে হইল। মাতার নিকট যাইতেছে, তবুও সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবার সময় তাহার হৃদয়ের তলদেশ হইতে একটা গভীর নিরাশার হাহাকার তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে কাঁদিয়া সকলের নিকট বিদায় লইল।

বহুদিন পরে সরোজ আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সেত আসিল না; কালের নিষ্ঠুর আঘাতে তার জীবনের আনন্দ-স্বপ্ন যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কঠোর বেদনায় তীব্রজ্বালা তাহার সমস্ত দেহ মন প্রাণকে নীলবর্ণ করিয়া

তুলিয়াছে। দুঃখিনী মাতা অভাগিনী কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন, অক্ষয় মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধধারায় তাহার তপ্তবক্ষ শীতল হইল। সরোজ রূপসী ছিল, কিন্তু বিধবা হইয়া এ অপূর্ব্বরূপ সে কোথায় পাইল! বাসনাবিকারশূন্যা, সংসার-নির্লিপ্তা, অসহ্য-কষ্টসহন-শীলা তরুণ বিধবার শান্ত ও সংযত চিত্তের শক্তির বিকাশ দৃঢ়রেখাঙ্কিত স্নিগ্ধ বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহাকে দেখিলে সম্ভ্রমে হৃদয় পূর্ণ হয়. সর্ব্বসুলক্ষণার অঙ্গে বৈধব্য-বেশ দেখিলে মন করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠে। ফুলের মতন সে স্নিগ্ধ, ফুলের মতন উজ্জ্বল, ফুলের মতন কোমল এবং ফুলের মতন পবিত্র; বাতাসে যার ঝরিয়া যাইবার কথা, বজ্রাঘাতে সে চূর্ণ হইল না কেন?

সরোজের মাতা চিন্তিতা হইলেন, কেননা এই অভিভাবকহীন রূপসী কন্যাকে তিনি কাহার হাতে দিয়া যাইবেন? তাঁর দিন শেষ হইয়া আসিতেছে. তাঁর অবর্ত্তমানে অসহায়া সরোজের কি হইবে? দরিদ্রের ঘরে ভগবান এত রূপ কেন দিলেন? যদি রূপই দিলেন তবে তার এরূপ সর্ব্বনাশই বা কেন করিলেন? মায়ের প্রাণ হত-ভাগিনী কন্যার ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় ম্লান হইয়া পড়িত। সংসারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়া সে কি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? মাতৃহৃদয়ের নৈরাশ্য যখন কোন কিছুরই কূলকিনারা দেখিত না, তখন গভীর বেদনাপূর্ণ নীরব প্রার্থনা দেবতার চরণে নিবেদন করিত—"দেখ বাবা বিশ্বনাথ. আমার সরোজকে চিরদিন তোমার পায়ে রেখো। ঠাকুর, তুমি নিরুপায়ের উপায়।" ইহার পরে কেন জানি না, তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে চকিতের মত একটা দৃঢ়বিশ্বাস আসিত, যাহার ফলে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ভয় ও ভাবনা বন্যার মুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইত!

দুর্দ্দিন বন্যার ন্যায় এক নিমেষে আসে, কিন্তু চিরদিনের জন্য চিহ্ন রাখিয়া যায়! দুর্ভাগ্য বন্ধুর ন্যায় যাহাকে ধরিয়া বসে, তাহাকে সহজে ছাড়িতে চাহে না। সরোজ যেখানে যায়, অদৃষ্ট তার সঙ্গে সঙ্গে চলে! দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাহার মাতার মৃত্যু হইল! স্বামীর মৃত্যুতে তাহার জীবন অবলম্বনহীন হইয়াছিল, কিন্তু মাতার মৃত্যুতে তাহার সব দিক অন্ধকার হইয়া গেল, তাহার মনে হইল পায়ের নীচে মাটি যেন অনেকদূর নামিয়া গিয়াছে। এত বড় সংসারে তাহার আপনার বলিবার যে একজনও রহিল না! সে এখন কাহার কাছে দাঁড়ায়?

শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, সরোজ মাতার আশ্রয়লাভ করিয়া কতকটা শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু কালের প্রচণ্ড আঘাতে সে আশ্রয় ত চূর্ণ হইল—সে আজ নির্ম্মম সংসারে কাহার করুণা ভিক্ষা করিবে? সংসারে তাহার ত কাহারও নিকট কিছু দাবি করিবার নাই। দরিদ্র পিতা মাতার আদরের কন্যা বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাও ত তার সহ্য হইল না। পিতৃগৃহে দারিদ্র্যের অভাবের মধ্যে অক্ষয় মাতৃস্নেহের নিকট তার আহত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মাতৃ-

বিয়োগে নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বাস্তবিকই সে কেমন ম্লান হইয়া পড়িল।

সরোজ যখন দিশাহারা হইয়া কোন পথই খুঁজিয়া পাইতেছিল না ঠিক সেই সময়ে একদিন রতন আসিয়া তার সঙ্গে দেখা করিল। নানা প্রসঙ্গের পর রতন কহিল, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম। বিস্মিতা সরোজ উত্তর দিল—আমার কাছে তোমার দরকার? রতন কহিল—হাঁ সরোজ, দরকার না থাক্‌লে আমি কি এম্নি এসেছি? সরোজ চুপ করিয়া রহিল, একটু পরে কহিল, কি দরকারে এসেছিলে? রতন কহিল—"সরোজ, আমি ত তোমার অবস্থা জানি এবং তোমাকেও বোধ হয় বেশ জানি। পরের সাহায্য নেওয়াটা তোমার পক্ষে যে খুবই কষ্টকর হবে, তা' আমি বুঝতে পারি; সেইজন্য কি বল্‌ছিলাম জান, তুমি ত বেশ লেখাপড়া জান, তাই আমি ভেবে দেখ্‌লাম, তুমি যদি গ্রামের মেয়েস্কুলটার ভার নেও, তবে সব দিক দিয়েই ভাল হয়, আর তোমার হাতে ভার দিলে আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারি।" অনাহারের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই দয়াবান্ গ্রামবাসী যুবকের অযাচিত করুণা সরোজের মর্ম্ম স্পর্শ করিল—সংসারে সরোজ অত্যাচার যতখানি পাইয়াছে, সহৃদয়তা ত ততখানি পায় নাই। ফুলের গাছটি নাড়া পাইলে, ফুলের মধ্যস্থিত জল যেমন টপ্‌টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে, আজ তেম্নি এই কুসুম-কোমলা দরিদ্রা যুবতীর ব্যথিত হৃদয় সহসা স্নেহের নাড়া পাইয়া বড় বড় চোখের অশ্রুজলে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল। রতন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সে ভাবিল ভদ্রগৃহস্থ কন্যা পেটের দায়ে চাকরী করিতে যাইতেছে, এই কথা মনে হওয়াতে সে বোধ হয় বেদনা বোধ করিতেছে—এই বেদনা-ধৌত অশ্রুজলের নিকট রতনও কেমন বিচলিত হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে কহিল—"সরোজ, আমার প্রস্তাবে তোমার মনে যদি কষ্ট হয়ে থাকে, আমাকে মাপ করো, আমি যা ভাল বুঝেছিলাম, তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছিলাম; কিন্তু থাক—তোমার যদি কষ্ট হয়, চাকরী করতে হলে লজ্জা হয়, ত'হলে না হয় থাক্।" সরোজ দেখিল রতন ভুল বুঝিয়াছে। সে কহিল—"না না, আমি কেমন নিজেকে সামলাতে পারিনি, তাই আমার চোখে জল এসেছিল। মা ছাড়া আমার জন্যে এ রকম করে কেউ ত ভাবেনি সংসারে যে পরের ভাবনা এমন করে কেউ ভাবতে পারে, তা ত আমি জানতাম না—তোমার দয়ার কথা এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না। তুমি আমার সব দিক রক্ষা করলে। আমাকে আর কারু গলগ্রহ হতে হবে না। তোমার এ ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।" রতন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না না সরোজ, আমি অতশত ভাবিনি—তোমার অসহায় অবস্থা দেখ্‌লাম, দায়ে অদায়ে আমরা পরস্পরকে যদি না দেখি, তবে চল্‌বে কেন?" সরোজ বলিল—"কজনে তা দেখে বল? তোমার কাছ থেকে আমি আজ যা পেলাম, সংসারে আর ত কেউ তা

দেয়নি—যাদের দেবার কথা, তারা পর্য্যন্ত দেয়নি। পরের জন্য পরে কতটুকু ভাবে বল?" রতন কহিল—"হাঁ, তুমি যা বল্লে তা ঠিক বটে, কিন্তু সে যা হকগে; তা'হলে তুমি এখন রাজি?" সরোজ কহিল—"এও আবার জিগ্‌গেস কচ্ছ, কিন্তু এর আগে আমি কখনও ত পড়াই নি। আমি কি পারব?" রতন একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"খুব পারবে সরোজ, খুব পারবে; তুমি যদি না পার ত কেউ পারবে না।" প্রসন্নস্নিগ্ধ হাসিতে সরোজের সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে কহিল—"আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন আমার থাকে।" রতন পুনরায় কহিল—"আর একটা কথা সরোজ, আমি বলছিলাম, তুমি ত একেবারে একলা পড়েছ, তুমি ছেলে মানুষ, তোমার একলা থাকাটা ঠিক নয়; তাই আমি ভাবছিলাম যে, তুমি যদি বল, তাহলে আমি ঠাকুমাকে ঠিক কর্ত্তে পারি, তিনি রাত্রিরে এসে তোমার কাছে থাকৃতে পারেন।" রতনের কথা শুনিয়া সরোজের চোখ দিয়া মুক্তার মত টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল আবার পড়িল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলের ভাবনা এমন করে তোমার মতন কাউকে ত ভাব্‌তে দেখিনি। আমাদের গ্রামে যে সব এত ভাল কাজ হচ্ছে, সে ত তোমারই জন্য।" লজ্জিত রতন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ওসব কথা থাক, ভাল মন্দ বিচার করে আমি কাজ করিনি। কর্ম্মহীন জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব তাই বেহিসাবী কাজের বোঝা ঘাড়ের উপর চাপিয়ে নি, ভাল মন্দের বিচার করবার অবসর বড় থাকে না।" এই বলিয়া সরোজের নিকট বিদায় লইয়া সে চলিয়া গেল।

রতন চলিয়া গেলে সরোজ ভাবিতে লাগিল। এই নিঃসম্পর্কীয় গ্রাম্য যুবকের হৃদয়ের মহত্ব তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল, বিস্ময়ে এবং আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অভিভূত হইয়া পড়িল। যাহাদের নিকট তার সম্পূর্ণ দাবি, তাহারাও তাহাকে এক রকম তাড়াইয়া দিয়াছে; আর রতন তার এই দুর্দ্দিনে, এই অসহায় অবস্থায় তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যবহারের বৈষম্য কেন যে হয়, সে তাহা কোনমতেই বুঝিতে পারে না। নৈরাশ্যের অন্ধকারে রতন যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সরোজের অদৃষ্টাকাশে উদয় হইল।

সরোজ স্কুলে পড়ায়। মেয়েরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে খুব ভাল বাসিল। রতনের ঠাকুরমাতা নিয়মিত রাত্রে সরোজের নিকট শয়ন করেন। কিন্তু এত সুবিধার মধ্যেও সরোজের আবার নূতন বিপদ দেখা দিল—অভাগিনীর অদৃষ্টে বিধাতা বুঝি সুখ লেখেন নাই!

কলিকাতার কোন কালেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া রতন গ্রামে আসিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। চেষ্টা করিলে অন্যত্র সে অবশ্য ভাল কাজ জুটাইতে পারিত—কিন্তু অর্থোপার্জ্জনকেই সে জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে নাই! নিজের গ্রামের

উন্নতি সাধন করাকেই সে জীবনের ব্রত করিয়াছিল—সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা তাহার আদর্শের যে পরিণতি হইবে, সে তাহা জানিত। ইহার মধ্যে সে একটা বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছে—সরোজের হাতে তাহার ভারার্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সরোজের কর্ম্মদক্ষতায় সে খুব খুসী হইয়াছে ছেলেদের স্কুল পূর্ব্ব হইতেই ছিল—সেটার ভার সে নিজে লইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমজীবীদের জন্যও সে একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছে। পুস্তক পড়িয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করে, দীন দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে। রোগীর সেবা করিতে সে অদ্বিতীয়। দুঃখ কষ্টে পড়িলে রতন যে রকম প্রাণ দিয়া উপকার করে এমন আর কেহ করে না, দীন দুঃখী দরিদ্র গ্রামবাসীরা তাই তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। রতনের দেহ খুব মজবুত, সে নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে—অত্যন্ত পরিশ্রম করে, তবু তাহাকে কেহ ক্লান্ত হইতে দেখে নাই, তার সদাপ্রফুল্ল মুখখানিতে আনন্দের হাসি সব সময়ে ফুটিয়া আছে। লাঠি খেলা, কুস্তির আখড়া, এ সমস্তেরও সে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। গ্রামের যুবকদল তাহার কথায় উঠে বসে। চব্বিশ বৎসরের যুবক নিজের সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া গ্রামখানিকে বুকে করিয়া লইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে যখন গ্রামখানির উন্নতি হইতেছিল, পরিশ্রমের সফলতায় তাহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইতেছিল।

রতন এখনও বিবাহ করে নাই—কেন যে সে বিবাহ করিতে চাহে না, এ কথাটার রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারে নাই। হাতের কাজগুলোর একটু গোছ করিয়া লইয়া সে সংসারে প্রবেশ করিতে চাহে। এই কাজগোছানর পরিমাপের মধ্যে একটা গভীর অনিশ্চয়তার অজুহাত আছে, সেটা সকলেই বুঝিত; কিন্তু এই অসাধারণ কর্ম্মী যুবক নিজের বিবাহ সম্বন্ধে বরাবর কেন যে উদাসীন রহিয়াছে, তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কেহ একটা সঠিক কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বিবাহের কথা উঠিলে হাঁ না সে কিছুই বলে না—শুধু ফাঁকা জবাবে নিজের মনের কথাটা এমন ভাবে চাপা দেয়, যাহাতে জটিলতা শুধু বাড়িয়া যায়। তাহার হৃদয়ে যে একটা গভীর বেদনা নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা কোন দিন তাহার বাক্যে অথবা ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই। ছেলেবেলায় সরোজের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিবাহ ত হয় নাই; তার পরে বিবাহ সম্বন্ধে সে সত্যসত্যই উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলার কথাটা যে তার মনের মধ্যে বিঁধিয়া আছে, এ কথাটা কেহ তলাইয়া দেখে নাই!

চরিত্রহীন যুবক জমীদারের কানে সরোজের অতুলনীয় রূপরাশির কথা উঠিল। সে একদিন কোন ফাঁকে সরোজকে দেখিয়াছিল, তারপর হইতে সে বেচারা প্রায় উন্মত্ত হইয়াছে। পারিষদবর্গ তাহার কামনানলে ইন্ধন জোগাইতেছে। জমীদারের

দলের মধ্যে রতনের চর ছিল—তাহারা রতনকে খবর দিল। তরুণ জমীদার রতনকে বিলক্ষণ চিনে রতন তাহার বসে আসিবে না সে খুব ভাল রকমই জানে; কিন্তু সরোজকে হাত করিতে হইলে, রতনের সঙ্গে যে বিবাদ অনিবার্য্য এই কথাটা মনে হইলেও সে কেমন দমিয়া পড়িত। অনর্থক সুপ্ত সিংহকে খোঁচাইয়া তুলিলে নিজের বিপদকেই ডাকিয়া আনা হয়; তবু প্রবল যুক্তিপরামর্শ চলিতে লাগিল—এ হেন দুর্লভ রত্নকে রতনের ভয়ে কোন মতেই ছাড়া যাইতে পারে না। অপিচ প্রবল জমীদার যে মনে মনে রতনকে ভয় করে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, জমীদারিশক্তি নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। যেমন করিয়া হউক কার্য্য উদ্ধার করিতেই হইবে!

রতন দেখিল সম্মুখে মহাবিপদ—জমীদার যে সহজে ক্ষান্ত হইবে না, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। সে মনে মনে কি ভাবিল। সে ভাবিল সমস্ত কথা খোলসা করিয়া সরোজকে বুঝাইয়া বলিলে কি ভাল হইবে না? সরোজ কি তার প্রস্তাবে সংযত হইবে না? কিন্তু সরোজ যদি উল্টা বুঝে—তার মনের মধ্যে যদি চকিতের মতন সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। না, না, এখন তাহাকে কোন কথা বলা হইবে না—সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে প্রথমে রক্ষা করিতেই হইবে। তারপরে ভগবান্ যদি দিন দেন, তখন তাকে সব কথা বলিব না হয়—তখন সে কি আমার পূজা গ্রহণ করিবে না? আমি যে তাকে ভালবাসি, সে কি বাস্তবিকই তা বুঝ্তে পারে না? চিরদিন নীরবে গভীর বেদনা বহন করবার জন্যই কি আমি তাকে ভালবেসেছি? রেখার টানের একটু এদিক ওদিকে সমস্ত চিত্রখানা কত বদ্‌লে গেছে। সরোজ যে বিধবা! কিন্তু বিবাহ না বুঝিতেই যে তার বৈধব্য! আচ্ছা এ সব ভাবনা এখন থাক, জমীদারকে এবারে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে। অন্যায়ের নিকট সেত কোন দিনই মাথা নীচু করে নাই। আপনার ধারণা ও শিক্ষার গুণে যাহা ভাল বুঝিয়াছে, তাহা করিতে আজ পর্য্যন্ত সেত কুণ্ঠিত হয় নাই। অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে যে বরাবরই রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ নিরাশ্রয়া সরলা বিধবার পক্ষে সে যদি না দাঁড়ায়, জমীদারের চক্রান্ত হইতে অনাথা নিজেকে কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। রতন কোন দিনই বিপদকে ভয় করে না, বাধাকে অতিক্রম করিয়া সেত বরাবর চলিয়া আসিতেছে। তাহার জীবনে একবিন্দু শোণিত থাকিতে, কোন দুর্বৃত্ত সরোজের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। বাল্যের স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সরোজ যে আবার তাহার কাছে এমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে, এ কথা কি সে কোন দিনই ভাবিতে পারিয়াছিল? অদৃষ্টের দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ছিন্ন করিবার শক্তি না থাকিলেও, সে বুঝিল যে, সরোজ তার। সমস্ত ব্যবধান ছিন্ন করিয়া তা না হইলে সে তার এত নিকটে আসিয়াছে কেন? সে একবার পূর্ণ হৃদয়ে আকাশের দিকে তাকাইল, তাহার মনে হইল যেন বিচিত্র লীলাময়ী প্রকৃতির অমল তরল হাসির মধ্য দিয়া বিশ্বদেবতার নীরব আশীর্ব্বাদ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে ভক্তিভরে আপনার মস্তক অবনত করিল।

(ক্রমশঃ)

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] পৌষ, ১৩২২। [৯ম সংখ্যা

দেবতার সুবিচার।

তুমি সুখের মাঝারে রেখেছ সতত
দুখের আগুনে ঘিরিয়া,
নিঠুর পীড়নে দিতেছ নিয়ত
কোমল বক্ষ চিরিয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!
সংসার-পথ করেছ রচনা
সংগ্রামময় করিয়া,
প্রতি পদে পদে নানা অপমান
রেখেছ সুমুখে ধরিয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!
প্রেমের সাগর দেছ কলুষিয়া
সন্দেহ-বারি ঢালিয়া,
শান্তির জল দিয়াছ শুকায়ে
বিষাদ আগুন জ্বালিয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!

যেথায় মরণ প্রবেশি আপনি
লয়েছে রিক্ত করিয়া,
সে ঘরে পাঠায়ে মৃত্যুর দূত
বাকীটি লয়েছ কাড়িয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!
গোলাপ ফুলের কোমল কোরকে
কণ্টকে দেছ গাঁথিয়া,
মধুর সুবাসে রেখেছ জড়ায়ে
ত্রিশূলের জাল ফাঁদিয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!
শারদ শশীর মোহন অঙ্গে
দিয়েছ কালিমা আঁকিয়া,
অমা রজনীর আঁধারের মাঝে
পূর্ণিমা দেছ ঢাকিয়া!
এই কি তোমার ওগো সুবিচার,
হে মোর নিঠুর দেবতা!

যা কিছু মধুর সুন্দর যাহা
রেখেছ হেথায় খচিয়া,
তাহারি মাধুরী বাড়ায়েছ শুধু
তারি বিপরীত রচিয়া !

বুঝেছি এবার তব সুবিচার,
ওগো মঙ্গল বিধাতা !

শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী।

NURSING অর্থাৎ সেবা শুশ্রূষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আবার দেখা গিয়াছে যে কোনও কোনও সেবাকারী নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া সেবাকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। এ বিষয়ে আপনাদের নিকট একটী গল্প বলিতেছি। এক চিকিৎসক ও তাঁহার শিষ্য এক রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। রোগী কাশরোগে কষ্ট পাইতেছিল। চিকিৎসক দেখিলেন যে রোগীর কাশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কোন প্রকারেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে ঘরের মেজেয় কয়েক খণ্ড আখের ছিব্‌ড়া পড়িয়া রহিয়াছে. তখন তিনি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আখ খাইয়াছ ?" সে স্বীকার করিল। তখন চিকিৎসক অতিশয় উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কাশরোগে ইক্ষুরস নিষিদ্ধ, বিষম বিষবৎ কার্য্য করে, তুমি আখ খেয়েছ, সেই জন্যই তোমার কাশী বাড়িয়াছে।" চিকিৎসকের সুচতুর শিষ্য এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে একটী পরম শিক্ষা লাভ করিল এবং পরে যখন চিকিৎসা-কার্য্যে সুনিপুণ হইল, তখন এক দিন সে একটী রোগী দেখিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার জ্বর অতিশয় বাড়িয়াছে। জ্বর বৃদ্ধির কোনও কোরণই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এ কারণ ও কারণ নানা কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুরই ঠিক উত্তর পাইল না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিল যে রোগীর খাটের কাছে এক জোড়া জীর্ণ চটি জুতা পড়িয়া আছে, তখন সে সোৎসাহে রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই চটি জুতা চিবাইয়াছেন, সেই জন্যই জ্বর বাড়িয়াছে।" তখন সকলে চিকিৎসকের বুদ্ধি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাতে সেও অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাহার গুরুর চিকিৎসাবিবরণ সকলকে জানাইল এবং গুরুর চিকিৎসায় নিপুণতার সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিল। যাহা হউক শিষ্যের এই অতি বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। সেই জন্য, যদিও অনেক সময়ে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সেবাকারীর কার্য্য করিতে হয়, তবুও তাঁহারা যেন এইরূপ অতি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দেন।

সেবাকারীর আর একটী গুণ "কার্য্যকুশলতা"। এই গুণটী থাকা বিশেষ দরকার, কারণ সেবাকারীকে অনেক গোলমাল ও অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। একেত রোগীর অবস্থা খারাপ, মনও খারাপ, বাড়ীর সকলের মনও সেজন্য খারাপ। রোগীর কিম্বা বাড়ীর অন্যান্য লোকদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া অতিশয় দুরূহ, কিন্তু সেবাকারীকে এই সমস্ত অসুবিধার ভিতরে রোগীর সেবাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁর যদি কার্য্যকুশলতা গুণটী না থাকে, তিনি সে কার্য্যে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সেই জন্য দেখা গিয়াছে যে এই গুণের অভাবে কেহ কেহ রোগীর সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণ অপটু, আর কেহ কেহ অতি সিদ্ধহস্ত। কার্য্যকুশলতাগুণে কেহ কেহ রোগীকে পথ্য ঔষধাদি অতি সহজেই সেবন করাইতে পারেন, আর এই গুণের অভাবে কেহ কেহ অনেক ধস্তাধস্তিতেও পারেন না।

সেবাকারীর আর একটী গুণ "সুশৃঙ্খলতা"। ইহার অভাবে অনেক সময়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রোগীর গৃহে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া বেশ সুশৃঙ্খলভাবে গুছাইয়া রাখিতে হয়। আবার খাবার ঔষধ ও মালিশের ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে না রাখিলে অনেক সময়ে মালিশের ঔষধ রোগীকে খাওয়াইয়া তাহার বিষময় ফল ফলিয়াছে। দ্রব্যাদি সকল ঠিকভাবে সজ্জিত রাখিলে যখন যেটী দরকার তাহা তখনি পাওয়া যায় এবং সেবাকার্য্য অতি সহজভাবে সাধিত হয়। সেবাকারীর সময়নিষ্ঠা গুণ থাকা উচিত। ঠিক সময়ে সকল কাজ করা উচিত। যদি সময়মত রোগী ঔষধ বা পথ্য না পায়, তবে অত্যন্ত ক্ষতি হয়; বিশেষতঃ যেখানে শক্ত রোগ সেখানে এসব বিষয়ে খুব সাবধানতার দরকার। সেবাকারীকে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া দরকার। যে কাজ করিতে হইবে, সে কাজে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে অনেক সময়ে সে কাজ করিতে পারা যায় না। রোগীকে ঔষধ বা পথ্য খাওয়াইতে আসিয়া যদি তার কাছে বাধা পাইয়া ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি সেবা করিতে পারেন না। কিন্তু স্থির দৃঢ়ভাবে অথচ শান্ত শিষ্টতার সহিত সে কাজ সম্পন্ন করা উচিত। কর্ত্তব্যসাধনে যেন কখনও পরাঙ্মুখ না হন। সেবাকারীকে অনেক সময়ে রোগীর অভাব সকল আপনা হইতেই অনুমান করিয়া নিতে হয়, তাহা হইলে রোগীকে বার বার তার অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে হয় না। রোগী যদি চাইবার আগেই যাহা দরকার সেবাকারীর কাছ থেকে তাহা পায়, তাহা হইলে সে অতিশয় সুখী ও তৃপ্ত হয়। অনেক সময়ে রোগীর নিজের যন্ত্রণা কষ্টে প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু যদি সেবাকারী সেই সকল অভাব আপনা হইতে বুঝিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অতি সুন্দরভাবে সেবাকার্য্য সংসাধিত হয়। সেবাকারীর উত্তম স্মরণশক্তি থাকা দরকার। রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের ব্যবস্থা সকল বিশেষরূপে বুঝিয়া নেওয়া উচিত, আর সেইগুলি উত্তমরূপে স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে হয়। আর রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন

সকল বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে চিকিৎসক আসিলে সেইগুলি তাঁর কাছে জানাইতে হয়, সুতরাং স্মরণশক্তি না থাকিলে এই কার্য্য সাধনে সক্ষম হন না। তাঁর স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্য একটী কাগজে চিকিৎসকের ব্যবস্থা সকল সুচারুরূপে লিখিয়া নেওয়া উচিত, এবং রোগীর অবস্থার বিবরণ সকল চিকিৎসককে জানাইবার জন্য আর একটী কাগজে লিখিয়া রাখা উচিত। কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নয়। এই সকল বিবরণ সেবাকারী খুব সঠিকভাবে যেন লেখেন। কোন জায়গায় কোন বিষয়ে যেন ভুল ভ্রান্তি না ঘটে। ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধেও সেবাকারীকে খুব সঠিক থাকিতে হয়। ঔষধের মাত্রা কম বা বেশী হইয়া গেলে রোগীর অপকার হইতে পারে। রোগীর সেবাকারীর গল্পপ্রিয়তার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। অনেক সময়ে রোগীকে নানা প্রকার গল্প ও কথার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিতে হয়, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় এবিষয়ে সেবাকারীরা এমন অসাবধান যে, যেসকল কথায় রোগীর মনে উৎসাহ আনন্দ ও প্রফুল্লতা না আসিয়া নিরাশা ভয় ও বিরক্তির সঞ্চার হয় তাহাই করিয়া থাকেন, ইহাতে রোগীর বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা। রোগীর সেবাকারীরা রোগীর সম্বন্ধে অনেক গূঢ় বিষয় জানিতে পারেন, এবং এই সকল বিষয় লইয়া অন্য লোকের কাছে কোনও রকম আলোচনা করা উচিত নয়। সেবাকারীর গুণগুলি সংখ্যায় বড় কম নয়। অনেক গুণান্বিত হইলে তবে উপযুক্ত সেবাকারী হইতে পারা যায়। সুতরাং আশা করি সেবাকারীর কার্য্যকে কেহ যেন হীন কার্য্য বলিয়া মনে না করেন। সেবাকারীর কার্য্য করিতে করিতে অনেক ধর্ম্ম ও গুণের উৎকর্ষ সাধন হইয়া পড়ে।

রোগীর সেবাকারীর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রোগীর সেবা করিতে হইলে মানসিক ও শারীরিক শক্তির যথেষ্ট প্রয়োজন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অথবা ভাবনা চিন্তায় যদি সেবাকারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহা হইলে রোগীর সেবা সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না; সুতরাং সেবাকারীর নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কয়েকটী নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রত্যহ খোলা যায়গায় উন্মুক্ত বাতাস সেবন করা উচিত। অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় কোনও খোলা যায়গায় জোরে পাদচরণ করিলে শরীরের উপকার হয়। সেবাকারীর খাদ্য পুষ্টিকর হওয়া উচিত, কিন্তু যে সকল খাদ্য অতি সহজে হজম হয় সে সকল খাদ্যই খাওয়া উচিত। গুরুপাক দ্রব্য রোগীর সেবা করিবার সময়ে সেবাকারীর গ্রহণ করা উচিত নয়। নিয়মিত সময়ে সেবাকারী তাঁহার ভোজন পান গ্রহণ করিবেন এবং কোন কারণেও রোগীর গৃহে আহার গ্রহণ করিবেন না। যদি সম্ভব হয় বাড়ীর অন্য লোকেদের সঙ্গে একত্রে আহার করিবেন, কারণ একেলা নির্জ্জনে আহার করিতে বসিলে দেখা যায় যে খাদ্যদ্রব্যগুলির অধিকাংশই শীঘ্র শীঘ্র গলাধঃকরণ হইয়া যায় এবং

ইহাতে হজমের ব্যাঘাত হয়। অনেকে একত্রে বসিয়া ধীরে ধীরে গল্প করিয়া আহার করিলে খাদ্য অতি সহজে হজম হইয়া যায়। রোগীর সেবা করিতে হইলে অনেক সময়ে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে হয় বলিয়া সেবাকারীর পেট সহজে পরিষ্কার থাকে না, প্রায় বদ্ধ থাকে. সেইজন্য তাহাকে মাঝে মাঝে অল্প তেজ জোলাপ লইতে হয়। বদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য রোগীর সেবাকারীদের অধিকাংশ সময়ই Sore-throat হয়। ইহা তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে জানান দরকার, এবং শীঘ্র প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা উচিত। যদি সেবাকারী নিজেকে কথঞ্চিৎ নিস্তেজ মনে করেন এবং সেবাকার্য্য সেরূপ সহজভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না দেখেন. তাহা হইলে তাঁহার অবসর লওয়া উচিত। সেবাকারীর নিত্য স্নান করা উচিত এবং চুলগুলি প্রাতে সন্ধ্যায় বুরুষ দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত। সেবাকারীদের দন্ত ও মুখ প্রত্যেক বার আহারের পর খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করা উচিত এবং মুখে কোন প্রকার গন্ধ যাহাতে না থাকে, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ ইহাতে রোগীর কষ্ট হইতে পারে। সেবাকারীর মাঝে মাঝে বিশ্রাম লওয়া উচিত এবং নিদ্রা যাহাতে সুচারুরূপে হইতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। রোগীর সেবার পর প্রত্যেকবারে নিজের হাত উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত, যতক্ষণ না হাত ধৌত হয় ততক্ষণ নিজের শরীরে কিম্বা কোনও খাদ্যদ্রব্যে হাত দেওয়া উচিত নয়। সেবাকারীর পোষাক সম্বন্ধেও কয়েকটী নিয়ম আছে। সেবাকারীর পোষাক যত অল্প এবং পরিষ্কার হয় ততই ভাল। আমাদের দেশে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, নিজেদের কাপড় চোপড় লইয়াই এত ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িতে হয় যে তাহাতে রোগীর সেবাকার্য্যে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; হয়ত কাপড়ের আঁচল রোগীর মুখের উপর পড়িয়া গেল, কিম্বা দুধের বাটীর ভিতর পড়িয়া দুধ মাখামাখি হইয়া গেল, অথবা ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে নিজের পরিচ্ছদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। এই সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যে সকল পরিচ্ছদ শরীরকে সুন্দররূপে আবৃত করিয়া রাখে এবং সহজে খুলিয়া যায় না, সেই সকল পোষাকই রোগীর সেবাকারীদের উপযুক্ত। হাঁসপাতালে নার্সদের পোষাক একই রকমের, তাহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য এবং দেখিলে বুঝা যায় যে সেবাকার্য্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধক ঘটাইতে পারে না। সেবাকারীদের হাতে আংটী পরা নিষিদ্ধ, যেহেতু তাহার তলায় অনেক ময়লা এবং তৎসঙ্গে রোগবীজ সকল আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে। সেবাকারীর পোষাক, যে কাপড় অতি সহজে ধৌত ও পরিষ্কার করা যায়, সেই কাপড়ের হওয়াই উচিত। সাদা রংয়ের অনেকেই পছন্দ করিয়া থাকেন। যে কাপড় সহজে জল শোষে না সেই কাপড়ের পোষাক তৈরী করা হয়, যেহেতু এই রকম কাপড়ে রোগবীজ সকল এবং দুর্গন্ধ সহজে লাগিয়া থাকে না। অতিশয় মস্‌মসে কিম্বা কুট্‌কুটে কাপড়ে যদি সেবাকারীর পোষাক তৈরী হয়, তাহা

হইলে রোগীর গায়ে লাগিলে তাহার কষ্ট হইতে পারে; কিম্বা সেবাকারীর নড়ন চড়নে অনর্থক শব্দ করিয়া রোগীকে বিরক্ত করিতে পারে। নরম এবং মোলায়েম কাপড়ের পোষাক রোগীর সেবাকারীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

প্রেমের জয়।

ইহা একটী সম্পূর্ণ গল্প নহে। কোন আখ্যায়িকার মধ্যাংশ লইয়া এই ক্ষুদ্র নাটিকাটী রচনা করা হইয়াছে। গল্পের যে অংশে কেবল স্ত্রীচরিত্রগণের সমাবেশ, সেই অংশ লইয়া ইহা রচিত হইয়া, নীতিবিদ্যালয়ের উৎসবে বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। রাজকন্যার সরল সুন্দর প্রেমে রাজ্যের সকল অমঙ্গল ছায়া কাটিয়া গিয়া রাজ্যে কি অমৃতপ্রবাহ বহিয়াছিল, তাহাই দেখান হইয়াছে।

নাটকোল্লিখিত পাত্রীগণের পরিচয়।

মাধুরী—রাজকন্যা। ইঁহার পিতা রাজা সত্যকেতু অন্যায় বিচারে এক নির্দ্দোষী ধর্ম্মাত্মা পুরুষকে কারারুদ্ধ করেন। বিনাদোষে দণ্ডিত হইয়া অপমানে সে ব্যক্তি দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যান। পরে রাজা অনুতপ্ত হইয়া বহুস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য রাজ্যত্যাগ করিয়া উদাসীন বেশে দেশে দেশে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে থাকেন।

রমা—দরিদ্র বালিকা। ইঁহারই পিতা অবিচারে বিনাদোষে দণ্ডিত হইয়া দেশত্যাগী হন। রাজকন্যা মাধুরী রমাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া এবং পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে তাহাদের দুঃখ-মোচনে ব্যগ্র, কিন্তু দরিদ্র পরিবারের প্রবল আত্মসম্মান জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে প্রথমে দূরে দূরে থাকিতে হইত। পরে মাধুরীর সরল অকপট প্রেমের নিকট রমার হৃদয় পরাজিত হইল।

অমলা, তরলা, মালতী, কুন্দ } রাজকন্যার সখীগণ।

সুখ, শান্তি, প্রেম, পুণ্য } দেববালাগণ।

সন্ন্যাসিনী—ইনি রাজ্যের এবং রাজা সত্যকেতুর শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তাই রাজার সহিত রমার পিতার মিলন স্থাপন করিতে এবং রমা ও মাধুরীকে সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমুৎসুক।

প্রথম দৃশ্য।

দেববালাগণ।

গীত।

এ ভবের মেলা নিত্য যাঁর খেলা
মোরা খেলুনি যে সাথে তাঁর,
ধরণীর বুকে আঁধারে আলোকে
মোরা বহাই অমৃত ধার।
ভ্রান্ত যে নর ধায় ভুল পথে
ফিরাইয়ে আনি ধরি তারে হাতে,
ঠাঁই ক'রে দিই সে খেলার ঘরে
আদরে তারে আবার।
নাহি ডাকিলেও যাই দ্বারে দ্বারে,
ভাঙ্গা জোড়া দিয়ে ফিরি ঘরে ঘরে,
অশ্রু মুছাই, হাসিটী ফুটাই—
ঢালি হরষের ভার।
এ বিশ্বের মেলা যাঁর রসলীলা
মোরা কণিকা যে সে সুধার;
জগতের বুকে শত সুখে দুঃখে
মোরা আসি যাই বারে বার।

সুখ—
কি সুন্দর, কি আনন্দ পূর্ণ এই ঠাঁই!
প্রেম—
এ ধরণী মোর বড় ভাল লাগে ভাই
শান্তি—
কেন তবে কর দুঃখ ধরণীর তরে?
প্রেম—
কত যে করুণা তাঁর মানবের পরে,
মানব বোঝে না সব, তাই দুঃখ করি;
তাই সদা সবাকার দ্বারে দ্বারে ফিরি।

সুখ—
কি করিতে পারি মোরা, কি আছে উপায়?
প্রেম—
ধীরে ধীরে পশি হৃদে করি লব জয়
জীবন সবার; মরুভূমি সম প্রাণ
করিব সরস পুনঃ; দুঃখে ম্রিয়মাণ
নিরাশা-কাতর জনে দেখাব সুপথ।
পুণ্য—
আমিও চলিব সাথে, ধর মোর হাত।
শান্তি—
বহুদূর হবে যেতে, চল চল ত্বরা।
প্রেম—
যাও ভাই, কাজ আছে, হেথা রব মোরা।
ক্ষণপরে আসিতে তো হবে তোমাদের;
আসা যাওয়া এমনি তো সতত মোদের।

(সুখ ও শান্তির প্রস্থান)

পুণ্য—
শান্তিপূর্ণ ঠাঁই এই, হেথা আছে কাজ।
প্রেম—
দুই খানি ছবি হেথা দেখিব যে আজ;
সুরভি ফুলের মত একখানি প্রাণ
ভরা তাহে প্রেমমধু; অপর জীবন
পৃথিবীর অত্যাচারে, দুঃখের পীড়নে
হইয়াছে শুষ্ক বড়; মোরা সুধাদানে
সরস করিব তায়। পড়ে নাকি মনে
এসেছিনু পূর্ব্বে হেথা মোরা দুই জনে?
পুণ্য—
মনে আছে বোন; হেথা অনুতাপানলে
গলানু রাজার মন; ভাসি অশ্রুজলে
খুঁজে এবে ফিরে রাজা উদাসীনবেশে,
যাহারে দিয়েছে দুঃখ তারে দেশে দেশে।

প্রেম—

সাঙ্গ এবে ব্রত তাঁর ; এবে নব লীলা
হবে আরম্ভ ; মোরা খেলিব সে খেলা।

২য় দৃশ্য।

রাজবাড়ীর এক অংশ।

সন্ন্যাসিনী ও অমলা।

অমলা—

এখনি যাবে মা ? দূরে যেতে হবে বুঝি ?

সন্ন্যাসিনী—

নিত্যই তো হয় যেতে ; চলিলাম আজি ;
কথা শুধু আছে এক, দেখো মা অমলা,
মাধুরী মায়েরে মোর।

অ— মাগো বল মোরে
কি হ'য়েছে মাধুরীর ; বেশী কথা কভু
কহে না সে জানি তাহা, মনে হয় তবু
বড় যেন ম্রিয়মাণ।

স— কভু কি শোননি
নিরুদ্দিষ্ট পিতা তার ?

অ— সব কথা শুনি
নাই, বল মাগো মোরে।

স— প্রায়শ্চিত্ত তরে
গিয়াছেন তিনি ; পড়ি কুলোকের ফেরে
অন্যায় বিচারে এক ধার্ম্মিক সুজনে
দণ্ড দেন রাজা ; হায় সেই অপমানে
দেশত্যাগী সে সুজন ; মনোবেদনায়
অনুতাপে, রাজা শেষে দেশত্যাগী হায় !
প্রতিজ্ঞা তাঁহার, ফিরাবেন গৃহে তারে,
নতুবা নিজেও নাহি ফিরিবেন ঘরে।

অ-

কাল তবে উৎসব কেন এ জননী ?

স—

লেখা আছে পত্রে তাঁর, এই মত শুনি,
ছবৎসর কাল অন্তে এ রাজ্যের ভার
নিতে হবে তনয়ারে ; কাল দিন তার।

অ—

কোন্ বলে চালাবে সে এই রাজ্যখান,
অতি যে তরুণ তার সুকোমল প্রাণ !

স—

বল বল কারে মাগো ? প্রেমই ত' বল,
যেই যত বল ধরে সে তত কোমল।

অ—

বালিকা সে অতি যে মা, ভয় হয় তাই ;
ভরসা দিও মা রহি নিকটে সদাই।

স—

অসীম নির্ভর যিনি নিখিল বিশ্বের,
মাধুরী পেয়েছে তাঁরে ; ভয় মা কিসের ?
কি ভরসা সেই বলে, দেখিবে অমলা।
চলিনু এখন তবে, বহে যায় বেলা।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর উদ্যান।

মাধুরী অমলা, মালতী, কুন্দ, তরলা

গীত।

(ওগো) কখন যে রাত পোহাল কে দেখেছে !
কখন যে কে নদীর নীরে,
শিশির ধোয়া তরুর শিরে,
অরুণ চরণ চুপে চুপে রেখেছে !
নয়ন মেলে দেখছি এযে
নীল গগন কমল সাজে
আলোর হাসি সোনার রঙ্গে সেজেছে !

অমলা—

চিন্তাযুক্ত কেন ভাই ? কথা নাই মুখে ?

মাধুরী—

সকলি নূতন যেন লাগিতেছে চোখে !
অতীত জীবনখানি পশ্চাতে রাখিয়া
চ'লেছি কোথায় ভাবি। কোন দিক্ দিয়া
কখন টলিবে পদ, ভয় হয় মনে।

মালতী—

হবে রাজরাণী তুমি, চিন্তা কি কারণে ?
মুখ চেয়ে কারে আর নাহি ভয় তব,
পাবে কত ধনরত্ন বেশভূষা নব।

অমলা—

থাক্ বেশ ভূষা ; এ মূরতি লাগে ভালো,
স্নেহময়ী ভগ্নী এই।

মাধুরী— এ স্নেহের আলো
এমনিই চিরস্থির রবে না কি ভাই ?
নহিলে এ ধনমান কিছু নাহি চাই।
হৃদয়ের মাঝে আমি পেতে চাই সবে।

তরলা—

তুমি যারে চাও সেতো ধন্য এই ভবে ;
হেথা হ'তে বৈকুণ্ঠও নাহি চাই আমি।

[দরিদ্র বালিকার প্রবেশ ও সঙ্কুচিত
ভাবে একপার্শ্বে অবস্থান।]

অমলা—

ভয়ে ভয়ে কে আসিছে ? কেগো বাছা তুমি?

কুন্দ—

ওমা এ কে এল, অন্দরের এ বাগানে ?

মালতী—

স্পর্দ্ধা বড় ! অভিসন্ধি কিবা তা' কে জানে?

তরলা—

ভিখারিণী হবে বুঝি ; হেথা কেন তবে ?
যারে যা সদরে ; সেথা দাস আছে সবে,
যা' চাস মিলিবে সেথা। রাণী নিজ হাতে
অন্ন কি দিবেন বাঁটি সবাকার পাতে ?

মালতী—

ভিখারী, কি চোর ! হ্যাঁরে, অনুমতি ল'য়ে
কোন্ দ্বারে এলি হেথা ? শুধু খেয়ে খেয়ে
দাসগুল দেখি অলস হ'তেছে বড় ;
করিও শাসন রাণী !

অমলা— কথাতেই দড়
তুমি, জানি তা' মালতী ; চুপ কর দেখি,
আসে অশ্রু চোখে ওর দেখিতেছ না কি ?

মাধুরী—

ভয় নাই কিছু ভাই ; এস এই দিকে.—
আহা ওসে চ'লে যায়, ডাক, ডাক ওকে।

(বালিকার প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে
তরলার প্রস্থান ও প্রবেশ)

তরলা—

এল না বালিকা, বড় তেজ ওর, রাণী !
গেছে সে হয়েছে ভাল ; এ দিনে কি জানি
কি বলিতে কি বলিত ! অমঙ্গল ছায়া
নাহি পড়ে আজি, এই কর মহামায়া !

মাধুরী—

কি আশায় এসেছিল দুয়ারে আমার
নাহি জানি, চ'লে গেল ; কামনা তাহার
পূরিলনা আমা হতে ; হবে কি মঙ্গল
এতে ভাবিস তরলা ?

অমলা— থাক, ঘরে চল,
লইব সন্ধান আমি ভিখারী বালার।

মাধুরী—(স্বগত)

মনে হয় দেখিয়াছি কোথা মুখ তার।
এই কি বালিকা সেই, সে পিতার মেয়ে?
আসিবে কি মোর দ্বারে ভিখারী হইয়ে ?

হবে কি সম্ভব তাহা ? হইতেও পারে।
এসেছিল বুঝি, হায় চাহিতেছি যারে !
ফিরে গেল, আর কি সে আসিবে এ ঠাঁই ?

অমলা—
বেলা হ'য়ে যায় ভাই, চল ঘরে যাই।

।

নদীতীর।

দরিদ্রবালিকা রমা।

গীত

এস এস দেখা দাও দীননাথ হে,
চির বন্ধু চির আশ্রয়
রহ এ দীনের সাথ হে।
[মাধুরীর প্রবেশ।]
তুমি যে ধরিয়া আছ মোরে বুকে,
যদিও আঁধার ঘেরে চৌদিকে,
অনুভব যেন করি তব হাতে
রয়েছে আমার হাত হে।
ভার দেছ মোরে তাহে দুঃখ নাই,
বহিবারে বল দিও এই চাই,
শুনিবারে মোরে দিও শুধু তব
আশীষ দিবস রাত হে।

মাধুরী—
নামটী তোমার ভাই বলনা আমায়।

রমা—
হাসি বলে ডাকিতেন পিতা মোরে হায় !
রমা মোর নাম রাণী ! ওগো, এ নামের
অর্থ কি থাকিবে হায় গৃহে গরিবের ?

মাধুরী—
কি মধুর কণ্ঠ তব। কিন্তু কেন ভাই
দুঃখ এত মনে তব ? স্বজন কি নাই
কেহ তব ?

রমা— আছে রাণী, স্বজন আমার।
তবু কেন প্রাণ মোর করে হাহাকার !
ক্ষুদ্র আমি, মোর পরে পড়িয়াছে তবু
তাদের সবার ভার ; বুঝিবে কি কভু
কত দুঃখ আছে তাহে ? দরিদ্রের কথা
কি কাজ শুনিয়া রাণী ? শুধু পাবে ব্যথা।

মাধুরী—
যে দুঃখ বহিছ ভাই তুমি অনিবার,
শুনিতে তা' এত ব্যথা লাগিবে আমার ?
লাগে, ক্ষতি নাই। তোমার ঘরের কথা
বল ভাই মোরে ; কি কাজ করেন পিতা,
ক'টী ভাই বোন ?

রমা— কি ফল হইবে শুনি ?
জানতো তোমরা সবে মোরে ভিখারিণী !
ভাই বোন শিশু সব, পীড়িতা জননী,
আছে সেবা সবাকার দিবস রজনী।
ঘরের কাহিনী এই ; যে বিপুল ভার
বহিতেন পিতা মোর—কত বল তাঁর—
আমি কি তা' পারি ?

মাধুরী— কেন ভাই না পারিবে ?
বহুদিন হ'ল গত, পিতা মোর সবে
ছাড়ি গিয়াছেন চ'লে। তবু আমি দেখি
তাঁহারে নিকটে সদা ; বল ভাই, একি
মনেতে হয় না তব ? ধরিয়া শিরেতে
তাঁহার আশীষ বাণী, সকলের হিতে
রত থাকি সদা ; তাঁরি সেবা তাহে যেন
করিতেছি আমি, মনে মোর লয় হেন।
কর ভাই তাঁরি কাজ ; হেথা তিনি নাই
ভাবিতে পার কি কভু ? চেয়ে দেখ ভাই,

উপরে গগন নীল ভাসিছে আলোকে,
কার যেন হাসি খানি ভাসে দিকে দিকে!

রমা—
সুদিন তোমারে সদা ঘিরে আছে রাণী,
তুমি কি বুঝিবে মোর শূন্য প্রাণ খানি?
সময়ে আহার পাও, আরামে শয্যায়
নিদ্রা যাও মার কোলে; দারুণ লজ্জায়
বলিতে পারিনে কারে; তবু কি মোদের
ক্ষুধা নাই, শীত নাই? এই জগতের
আলো আর হাসি তাই পাইনে দেখিতে,
অভাব, আঁধার শুধু হেরি চারিভিতে।
শয্যাশায়ী মা আমার, শিশু ভাই বোন
পায় না ক্ষুধার অন্ন!

মধুরী— শোন ভাই শোন,
আমি যদি পাই খেতে, তুমি কেন তবে
আমারি ঘরের পাশে অন্নহীন রবে?

রমা—
চাহিনা ভিক্ষার অন্ন; ভিখারিণী ব'লে
ক'রেছিল উপহাস সখীগণ মিলে,
তোমার পড়ে না মনে? মোর শিশু ভাই
ক্ষুধায় কাঁদিল বড়, এসেছিনু তাই
সত্যই করিতে ভিক্ষা দুয়ারে তোমার;
তাই বিধি ফুটাইল নয়ন আমার।

মাধুরী—
এ কথা বলিছ কেন বুঝিতে না পারি।

রমা—
বুঝিবে কি তুমি হায়, রাজার ঝিয়ারী!
প্রাণ যায় তবু মান না পারি খোয়াতে,
গরিবের গর্ব্ব হেন চাও কি নোয়াতে?

মাধুরী—
না ভাই, শুধুই চাই দুঃখ নিবারিতে।

রমা—
ভিক্ষা অন্নে এ জীবন না চাহি রাখিতে।

মাধুরী—(সঙ্কুচিতভাবে)
ভিক্ষা তো নহেক হীন; শুননি কি কভু
রাজ্যেশ্বর কত জন,—ভিক্ষাজীবী তবু?

রমা—
প্রভেদ অনেক সে ভিক্ষায় এ ভিক্ষায়
জান না কি রাণী? স্বেচ্ছায় ঠেলিয়া পায়
সম্পদ তাঁদের, তাঁহারা যে বনবাসী;
আমার ভিক্ষা এ—অক্ষমের লজ্জারাশি।

না ভাই নিও না ভিক্ষা, কর কিছু কাজ।

রমা—
কোন কাজ শিখিনিত' এ ভুবন মাঝ।

মাধুরী—
কেন ভাই, জান গীত। শিখাবে কি মোরে
গাহিতে তোমার মত সুধামাখা স্বরে?
প্রতিদানে শুধু তার কিছু দিতে চাই;
মোর আছে ধন, কিছু নেবে নাকি ভাই?

রমা—(বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া)
চেয়েছিলে পরিচয়, বলি নাই রাণী,
গরিবের গর্ব্বভরে; নহি ভিখারিণী,
নহি পিতৃহীন; তবু পিতা নাই মম।
রাজ-অবিচার যেগো নিঠুরের সম
নির্দ্দোষ জনকে মোর দিল কারাগারে;
পিতা মোর সে লজ্জায় দারুণ ধিক্কারে
দেশত্যাগী সেই হ'তে।—অতি যত্নভরে
শিখায়েছিলেন গীত তিনি যে আমারে;
নিত্য তাঁরে শুনাতাম হরিনাম হায়
গৃহকর্ম্ম অবসানে; কতদিন যায়
হাসিমাখা সে মুরতি দেখি নাই আর,

সে স্নেহপরশখানি পাইনি তাঁহার।
মা জানি কোথায় তিনি।

মাধুরী— বুঝিয়াছি ভাই,
একই দুঃখ দুজনার; সেই দিনে তাই,
দেখিয়া তোমারে, মোর হ'য়েছিল মনে
তুমিই তনয়া তাঁর, তাই তোমা পানে
ছুটেছিল প্রাণ মোর; ডাকিতে তোমায়
ইচ্ছা হয় সদা, তবু সাহস না হয়।

রমা—
চিনেছ আমারে এবে? বহুদিন যায়
পিতার সংবাদ নাই; সেদিন হেথায়
এসেছিনু ভাই রাণী; আশা ছিল মনে
পাইব সংবাদ, দেখা হ'লে তব সনে।
শুনেছিনু অবিচারে দণ্ড দিয়ে, বুঝি
অনুতাপে ফিরিছেন এবে তাঁরে খুঁজি,
পিতা তব; পেয়েছেন বহু মনোব্যথা
এ পাপের তরে; রাণী, সত্য কি এ কথা?

মাধুরী—
সত্যই একথা ভাই। সেই হ'তে তাঁর
ধন মানে বেশ বাসে সাধ নাই আর।
পবিত্র জীবনে তাঁর শুধু এই পাপ
পশিল কুক্ষণে, তাই পান এত তাপ।
সে পাপ ক্ষালন তরে জগতের হিতে
ঢালিয়া দেছেন প্রাণ। এস সেই ব্রতে
আমরাও মিলে যাই; আজি দুই বোনে
লই এস এক ব্রত জীবনে মরণে।

রমা— (নতজানু হইয়া)
রাজ্যেশ্বরী তুমি, তবু তব পদতলে
শিখিনু বিনয় আজ; কি মহিমা জ্বলে
করুণা-মমতাময় ললাটে তোমার।
যে অগ্নি জ্বলিত এই হৃদয়ে আমার
নিভালে তা' তুমি আজ; নূতন দুয়ার
খুলিলে জীবনে আজি।

মাধুরী— না ভাই আবার
কেন লজ্জা দাও; চল, বসিগে বাগানে।

রমা—
ক্ষম এবে দেবী, যেতে হবে গৃহপানে,
এসেছি যে ছাড়ি মোর রুগ্না জননীরে।

মাধুরী—
যাও ভাই; ক্ষণকাল রব নদীতীরে।

(রমার প্রস্থান)

[দাসী ও সখীগণের প্রবেশ]

অমলা—
মাগো মা, হেথায় তুমি? আমরা তোমায়
খুঁজে খুঁজে হনু সারা; কেনগো হেথায়
ব'সে একা ভূমিপরে?

মালতী— ওমা একি দেখি,
তাইতো মাটীতে কেন? দাসী কালামুখী
গেল কোথা? ওরে, রেশমী আসনখানা
চট্ ক'রে আন্ দেখি।

মাধুরী— কর ভাই মানা
আসন আনিতে ওরে। বেশ আছি আমি,
কেন সবে ব্যস্ত হও?

কুন্দ— বলিলেই তুমি
অমনি কি হয় রাণী? রাণীমা তখন
দুষিবেন আমাদের।

মাধুরী— (হাসিয়া) কেন, মা কখন
বকেন তোদের? আয়, এ তুচ্ছ কারণে?

তরলা—
ভাল, ভাল, থাক তবে কাজ কি আসনে?
আঁচল দিয়েছি পেতে ব'স উঠে হেথা;
পা দুখানি রাখ।

মাধুরী— থাক্ ভাই, থাক কথা।
দেখ ঊর্দ্ধে চেয়ে।

মালতী— শূন্যেতে কি আছে রাণী ?

শূন্য নয়, পূর্ণ সব ! কি মধুর বাণী—
শোন বাজে নদী-নীরে গগনে পবনে,
কি হাসি পড়িছে ঝরি তপনকিরণে।

তরলা— (স্বগত)
বুঝিতে পারিনে, তবু সায় দিতে হবে,
অন্যের জোগাতে মন জন্মেছি যে ভবে।

(প্রকাশ্যে)
সত্যই তো রাণী, কল কল ছল ছল
নদী বহে যায় ; যেন হেসে অবিরল
লুটে তব পায়।

মাধুরী— একি কথা তোর ভাই,
লুটে মোর পায় ? কারেও বলিতে নাই
একথা, জান না ? যাক্, বুঝিবিনা ভাই,
নেমে আসে সন্ধ্যা ওই, চল ঘরে যাই।

৫ম দৃশ্য।

রাজকন্যার কক্ষ।

রমা, মাধুরী, অমলা, তরলা,
মালতী ও কুন্দ।

রমা—
ডেকেছ হেথায় ভাই, কেন রাজগৃহে ?

মাধুরী—
সঙ্কোচ কেন এ তব ? পরিপূর্ণ স্নেহে
প্রাণ তব মোর তরে ; আমার এ ঘর
নহে কি তোমার তবে, কেন ভাব পর ?

রমা—
মাধুরী, তোমারে পর ভাবিলে আমার
জীবন কি হ'ত পূর্ণ এমন আবার ?
যেদিন গেলেন পিতা গৃহত্যাগ করি,
কহিলেন অন্তরালে মোরে হাতে ধরি,
"এ মিথ্যা কলঙ্ক মোর, জীবনে তোদের
পরশ না করে যেন ; তাই এ গৃহের
স্নেহনীড় ত্যজি আজ চলিলাম আমি,
শোকে মগ্ন মাতা তব, সবে দেখো তুমি।
দূরে থেকে যথাসাধ্য করিব, আমার
এ কলঙ্ক না ঘুচিলে ফিরিবনা আর।"
কি আগুন জ্বলেছিল সে দিন হৃদয়ে,
বুঝিবে কি মধুভরা ওই হৃদি ল'য়ে !
নির্ম্মল ললাটে তাঁর লজ্জা এ দারুণ
যে লেপিল ; আমাদের জীবন তরুণ
যে করিল অসহায় ; নিশি দিন ভরি
দেববারে মাগিতাম প্রতিশোধ তারি !
—তার পরে, তুমি নিলে করি পরাজয়,
হিংসাজ্বালাময় মম এ মরু হৃদয়।

মাধুরী—
এ হৃদয়খানি ভাই, মোর ধন তবে ?

অমলা—
চুরি গেছে ধন তব ! ওর যশোরবে
পূর্ণ দিক্ ; হৃদি ওর লইয়াছে যত
দীন দুঃখী ভাগ করি নিজ মনোমত !

মাধুরী—
যত দীন দুঃখী জন,—রমা সবাকার,
তাহে ক্ষোভ নাই ভাই ; সাধ সে আমার।

অমলা—
তোমার তো সাধ তাহা ; ওর প্রাণখানি
ল'য়ে যে এখন প'ড়ে গেছে টানাটানি।

মাধুরী—

কেন ভাই, এ কাজ তো মনের মতন
হ'য়েছে রমার ; আছে যত দীনজন,
সবার জননী রমা ; শুনি আমি যবে
তাদের আশীষ বাণী ওঠে উচ্চ রবে
রমারে উদ্দেশ করি ; কি আনন্দ পাই
প্রাণে, কি বলিব ভাই !

রমা— সরলা যে, তাই
এ আনন্দ পাও তুমি। তোমারি তো ধনে
পূর্ণ হয় সাধ মোর ; অপরে না জানে,
নিজমনে জানি তবু ; অন্নপূর্ণা তুমি,
আশীষ এ তোমাপরে, জানি তাই আমি।

তরলা—

হাঁ৷ ভাই, শুনে যে ছিনু অতিথিশালায়
আমাদেরো ডেকে নেবে দরিদ্র সেবায় ?

অমলা—

কাজ তা', নহেতো খেলা, পারিবে তরলা ?

মালতী—

কেন ভাই, কাজ পারা ইজারামহল
তোমারি কি একা ? আমরা পারিগো
কিছু।

অমলা—

করিতে যে হবে ভাই দর্পখানি নীচু !

মালতী—

মিষ্টি ক'রে খুব ভাই ব'কে নিলে তবু !

অমলা—

একটু কলহ বিনা সুখ হয় কভু ?

কুন্দ—

একটুকু ঝাল বিনা অন্ন কি ভাই রোচে ?

তরলা—

ঝাল মিষ্টি সবি হ'ল। এ কলহ ঘুচে
থাকনা এবার তবে।—স্বার্থে আপনার
মগ্ন ছিনু এত দিন ; জীবনে আমার
সুখ তবু পাই নাই ; আজি হয় মনে
সুখ শুধু পাওয়া যায় স্বার্থ বলিদানে।

কুন্দ—

ক্ষুদ্র আমি, সব কথা বুঝিতে পারিনে,
তবু কাজ করিবারে সাধ হয় মনে।
কি কাজ করিব ভাই ?

মাধুরী— (হাসিয়া) ভৈরবীর কাছে
যাও দেখি, ডাক তাঁরে ; কথা কিছু আছে।

(কুন্দের প্রস্থান)

রমা—

তাঁদের কথা কি ? সত্য কি সংবাদ এই ?

মাধুরী—

কেন নয় ? মোর মনে সংশয় তো নেই।
যাঁরে খুঁজি এতদিন পর্ব্বতে গহনে
ভ্রমিলেন পিতা মোর, যদি তাঁর সনে
মিলায়ে দিলেন বিধি, কেন তবে তাঁরা
রহিবেন গৃহ ত্যজি ? সেই স্নেহধারা
কেননা করিবে পূর্ণ ভবন আবার ?

রমা—

মনে হয় মোর, আরো দেরী আছে তার।

[কুন্দের সহিত সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ]

সন্ন্যাসিনী—

ডেকেছ জননী ? কাজ ছিল কিছু দূরে,
হেথা এ পাগলী মেয়ে, নিয়ে এল মোরে।

মাধুরী—

সংবাদ পাব মা কবে ? বারতা তাঁদের
ব'লেছিলে জননী যে জানাবে মোদের।

সন্ন্যাসিনী—

পাবে মা সংবাদ ; আমি তীর্থ পর্য্যটনে
যেতেছি যে ; সেথা দেখা হবে তাঁর সনে।

মাধুরী—

বলিও তাঁহারে মাগো, এই রাজ্যভার
পালিয়াছি সযতনে; সঁপিব আবার
তাঁহারি চরণে পুনঃ, শুধু সেই আশে।

সন্ন্যাসিনী—

তোমারে চেনেন তিনি, তাই সে প্রবাসে
আছেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে; মাধুরী তাঁহার
জানেন যে বুক পেতে লবে সব ভার।
—যাই তবে।

রাজকন্যা ও সকলে সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিল।

(সন্ন্যাসিনীর প্রস্থান)

অমলা—　　　চল ভাই বাগানে এখন
নিরালায় হবে খেলা মনের মতন।

(সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

উদ্যান।

সন্ন্যাসিনীর গীত।

ঐ শোন ঐ শোন রে
হাসি কি বাঁশী সে কি জানি কি ধ্বনি
পূরিছে ভুবন রে!
[রমা ও মাধুরীর প্রবেশ।]
আনন্দে আমার বেদনে আমার,
উঠায় পড়ায় মোর বার বার
এ কি এ সুরের মায়া-জালখানি
করিছে বয়ন রে!
মনে হয় যেন সে ধ্বনি সদাই
ডাকে শুধু "আয় আয়,
হেথায় পাইবি তিমিরের পারে
পুণ্য প্রভাতোদয়;
হেথা তৃষিতের মিটিবে পিপাসা,
জীবনে জাগিবে নব প্রেম আশা,
পাইবি শ্রান্ত চিরবিশ্রাম,
মুছিবি নয়ন রে।"

মাধুরী—

প্রণাম জননী! সংবাদ কি পেলে কার?

সন্ন্যাসিনী—

জয় হোক মা জননী! সফল এবার
শুভ কাজে যাত্রা মোর; পরিপূর্ণ সাধ
মা তব এবার।

মাধুরী—　　　বল, বল কি সংবাদ,
কোথায় আছেন তাঁরা?

সন্ন্যাসিনী—　　　পিতার তোমার
দেখা পেনু দূর তীর্থে; জনক রমার
র'য়েছেন সাথে তাঁর। দুইটী জীবন
মিলে মহা বেগবতী নদীর মতন,
ধরণী প্লাবিত করি পুণ্য দয়া স্নেহে,
দুঃখ তাপ নাশি তার চলিয়াছে বহে।

মাধুরী—

আসিবেন কবে পিতা? এই রাজ্য তাঁর
সঁপিব চরণে কবে?

সন্ন্যাসিনী—　　　মিনতি তোমার
জানানু তাঁহারে; কল্যাণ করমে তব
রমারে পেয়েছ সাথী, বলিলাম সব।
কহিলেন "বোল তারে, প্রেম পুণ্য ধন
দেছেন দেবতা তারে, করিয়া যতন
বুকে যেন রাখে তাহা। সে অক্ষয় ধন
বিসর্জ্জন করি আমি মূঢ়ের মতন
পাইয়াছি বহু দুঃখ। এ রাজ্যের ভার
প'ড়েছে তাহার শিরে; প্রতিজ্ঞা রাজার

রাখি নাই আমি যাহা, তনয়া আমার
রাখে যেন, পালে যেন পিতৃসত্য তার"।

মাধুরী—

পালিব আদেশ তাঁর; কবে পাব দেখা?

সন্ন্যাসিনী—

নবীন জীবন তাঁর, নহেন তো একা
আর তিনি; স্নিগ্ধ করি শত তপ্ত প্রাণ
জীবন বহিছে তাঁর; সার্থক নয়ন
দেখি মোর; ত্যজি এই ক্ষুদ্র রাজ্যভার,
ধরা জুড়ি কি বিপুল রাজ্য আজি তাঁর!

মাধুরী—

চাহিনা ফিরাতে তবে। আমি রব হেথা
ক্ষুদ্র প্রতিনিধি তাঁর; সকলের ব্যথা
লব বুক পাতি সদা; সকলের সুখে
অপার আনন্দ পুনঃ পাব এই বুকে।

সন্ন্যাসিনী—

সাধো মাগো এই ব্রত; ইহা হ'তে আর
নাহি স্বর্গ এ ধরায়; পাইবে আবার
দেখা তব জনকের? পূরিবে মা সাধ.
এবে কর কাজ, তাঁর ল'য়ে আশীর্ব্বাদ।

রমা—

জননী, পিতার মোর কিছু নেই কথা?

সন্ন্যাসিনী—

আছে রমা মা আমার; শুনিয়া বারতা
সব স্বজনগণের বহিল নয়নে
তাঁর সুখ অশ্রুধার; কহিলেন "মনে,
ছিল এই আশা চিরদিন; জানিতাম
রমা পূরাবে সে সাধ; তারে চিনিতাম।"
তীর্থে সেথা অন্নকষ্ট হ'য়েছে এবার,
তাইত' তাঁদের নাই অবসর আর।
কাজ শেষ করি ত্বরা আসিবেন তিনি
বলিলেন পিতা তব, ভেবোনা জননী।

রমা—

ভাবিব কেন মা? আমি পেয়েছি এমন
পিতা, সে যে ভাগ্য মোর। এ ক্ষুদ্র জীবন
তাঁরই পদচিহ্ন ধরি, সেই পথে যেন
বহে যায় আশীর্ব্বাদ কর মাগো হেন।

সন্ন্যাসিনী—

লক্ষ্মীর প্রতিমা, মুখে ল'য়ে পুণ্য হাসি,
হাতে ল'য়ে স্নেহ সেবা দাঁড়াইও আসি
সবার মাঝারে মাগো। ধরণীর জ্বালা
হিংসা, স্বার্থ, সন্দেহের নিভাইয়ে, মালা
পরায়ো প্রেমের তুমি; এই মম সাধ;
দেবতার পায়ে মাগি এই আশীর্ব্বাদ।

৭ম দৃশ্য।

উদ্যান।

তরলা, মালতী, কুন্দ।

কুন্দ—

সুখের সংবাদ ভাই শুনেছিস তোরা?

মালতী—

কাণে তুলো দিয়ে ব'সে নেই ত' আমরা!
এত আলো এত বাঁশী আজ চারিদিকে,
আমরা কি আছি ভাই চোখ কাণ ঢেকে?

তরলা—

ঢেকেই ত' এতদিন ছিলাম আমরা,
মিছে তাত' নয় ভাই; এ জগৎ ভরা
এত হাসি এত বাঁশী বেজেছে বৃথাই,
নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন, শুনিনিত' ভাই।

মালতী—

কাণ তো খুলেছে তোর? তা' হ'লেই হ'ল,
আমরা বধির তাতে কিবা এসে গেল?

কুন্দ—
না ভাই তামাসা নয়; আজ চারিদিকে
শুধু গান, শুধু বাঁশী শুনে, থেকে থেকে
মনে হয় মোরা যেন আছি স্বর্গপুরে।
মালতী—
স্বর্গ কি ভাবিস তবে আছে বহুদূরে?
স্বর্গ নরক দুইই আছে হেথা ভাই,
যে যাহা কামনা করে সে পায় যে তাই।
কুন্দ—
কি তুই বকিস ভাই, নরক আবার
কে কবে কামনা করে!
মালতী— শুধু আপনার
সুখ খুঁজে, সুখস্বর্গ মেলে কি কখন?
আমার সে পুরাতন, মলিন জীবন
জানত সবাই। শুধু হিংসা ল'য়ে বুকে,
সন্দেহ সবার পরে, ছিলাম কি সুখে?
সেই ত' নরক আমি রেখেছিনু প্রাণে,
দেখনি তোমরা তার জ্বালা এ জীবনে?
তরলা—
সত্যি ভাই, মনে হয়, এ বিশ্বের মাঝে
কি দীন জীবন ল'য়ে, কিবা হীন কাজে
ছিনু এতদিন। মাধুরীর মধুরতা,
মহত্ত্ব রমার জাগায়েছে নবীনতা
জীবনে আবার; আজ কি সুন্দর বেশে
এ জগৎখানি মোর নয়নে প্রকাশে।
[অমলার প্রবেশ।]
অমলা—
এখনো এখানে তোরা, এসেছেন রাজা,
শুনিসনি জয়ধ্বনি?
কুন্দ— ওরে, শাঁখ বাজা;
চল চল দেখিগে রে। পিতা কি রমার
এসেছেন সাথে তাঁর?
অমলা— কি বলিব আর
সব আজ পূর্ণ ভাই;—মাধুরীর ব্রত
হ'ল আজি উদ্যাপন; সয়েছে সে যত
নীরবে দুঃখের ভার, সব শেষ আজ;
চল সবে দেখি তারে এ আনন্দ মাঝ।
কুন্দ—
রমা কি করিছে ভাই? মুখখানি তার
কেমন দেখিলে ভাই?
অমলা— পারিনেক আর
কুন্দ তোর সাথে; চলনা দেখিবি তারে;
হয়তো মাধুরী সেথা খুঁজিছে আমারে।
মালতী—
চল চল যাই সবে; শাঁখটা আমার
দেনা ভাই; ডালাখানা ফুলের হেথায়
যাসনে ফেলিয়া যেন। চল এই বার।
তরলা—
কি আনন্দ উথলিল আজিকে আবার!
(সকলের প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য।

উদ্যান।

সুখ, শান্তি, প্রেম, পুণ্য।

সুখ—
আমাদের কাজ হেথা শেষ হ'ল ভাই?
প্রেম—
কাজের কি আছে শেষ? জান ত' সদাই
আমাদের এই রঙ্গ ধরণীর বুকে
তরঙ্গ খেলিয়া চলে শত সুখে দুঃখে।
মোরা না রহিলে কাছে এরা ভুলে যায়
কোথা হ'তে এসেছে সে কি কাজে ধরায়।

শান্তি—

হ্যাঁ ভাই, মানুষ ভাবে দেবতা তাদের
রহে দূর স্বরগেতে ; হেথা মরতের
ঘরে ঘরে খেলা তিনি করেন যে সদা
দেখেনা তা' চেয়ে হায় ; শোনেনা যে কথা,
এত বলি নিশিদিন তবু প্রাণে তার।

সুখ—

তবু কাজ ক'রে যাব আমরা পিতার।

পুণ্য—

একদিন শুভফল ফলিবে নিশ্চয়।
দেখ আজি কি আনন্দ, কিবা শান্তিময়
এই ছোট রাজ্যখানি ; আমরা হেথায়
আছি, তাই এ আনন্দলীলা বহে যায়!

[মাধুরী, রমা, সন্ন্যাসিনী ও
সখীগণের প্রবেশ।]

শেষগীত।

গাও জগবন্দন হরিগুণ গাথা,
জয় দেবদেব জয় পরিত্রাতা
সনাতন পরমাত্মন করুণাময়।
বেদন-মোহ-ছেদনকারী,
ভবমরু মাঝে শীতলবারি,
সনাতন পরমাত্মন করুণাময়।
নমো দীননাথ, নমো চিরশরণ,
দুঃখ-বিনাশন, সন্তাপ্তি-কারণ,
সনাতন পরমাত্মন করুণাময়।
দুর্ম্মতি-বারণ, দুর্গতি-ভঞ্জন,
নমো নমো মঙ্গল, নমো ভূতপাবন।
সনাতন পরমাত্মন করুণাময়।

যাত্রা

এবার তবে থাক্,
যাত্রাপথে শুনিস্‌নেক
গৃহকোণের ডাক্!

ফিরিস্‌নেক আর
কান্না হাসির কণ্ঠমালা
জড়িয়ে বারে বার!

দুঃখ সুখের গীতি,
অনেক দেখা, অনেক শেখা
অনেক মহা ভীতি!

জুড়িয়ে দিতে জ্বালা,
নূতন সুরে গাইতে হবে
নূতন গানের পালা!

করিস্‌নেক ভুল!
পথের-চলা, ঘরের খেলা,
নয়ক সমতুল!

চাহিস্‌নেক পিছু,
হায়রে ভীরু থম্‌কে দাঁড়াস্
নয়ন করে নীচু!

কত গোপন ব্যথা,
কাজল আঁকা সজল দিঠির
ভাষ্যবিহীন কথা!

দাঁড়িয়ে পথের বাঁকে,
ঘরের যারা আজ-ও তারা
তেম্নি করে ডাকে!

পান্থবিহীন পথে,
ঘর-ছাড়ানো বাজ্‌ল বাঁশী
কোন্ অজানা হতে !

চল্‌রে ছুটে একা,
কেমন বাঁকা কোন সে একা
ফাঁকায় পাবি দেখা !

চিহ্ন দেখি আঁকা,
এই পথে তার রথ গিয়েছে
দাগ ফেলেছে চাকা !

অনেক হ'ল দেরী,
চল্‌তে পথে ধূলায় চাকার
চিহ্ন নাহি হেরি !

তাতেও নাহি ডরি,
যাওয়া আসার পথে সেইত
খেল্‌ছে লুকোচুরী !

কত যুগের খেলা,
অন্ত নাহি তবু কোথাও
নাইক কোনো হেলা !

মনোহরণ সাজে,
এই পথেতে দেখ্‌নু তারে
নিমেষ রথের মাঝে !

এক নিমেষের তরে,
পেয়েছি যা খুঁজ্‌তে হবে
চিরনিমেষ ধরে !

এবার তবে থাক্‌,
রথের চিহ্ন পথেই আছে
ওই কি বাজে শাঁক !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ ।

নিরুত্তর ।

আমি তোমায় খুঁজবো কোথায় ?
এই যে তুমি এই যে ;
তোমায় ছেড়ে বিশ্বে আমার
ভিন্ন ঠাঁই আর নেই যে !

এরা বলে, দেখাও তারে
কোথায় সেজন রয়েছে ;
শোনাও মোদের, তোমার প্রাণে
কোন্ কথা সে কয়েছে !

কি দেখাব, কি বলিব,
কি শুনাব হায় রে ;
অবুঝ সাথে তর্ক ক'রে
সময় বহে যায় রে !

কথায় একি ব্যক্ত হবে,
স্পষ্ট হবে চক্ষে ?
এ কেবলি ভোগ করা যে
গোপন গভীর বক্ষে ।

মন দিয়ে যে দেখা তোমায়,
মন দিয়ে যে পাওয়া,
পাগ্‌লা ভোলা স্পর্শবিহীন
হর্ষ আকুল হাওয়া ।

এদের কাছে হার মানি যে
দেখা শোনার দ্বন্দ্বে ;
তোমার কাছে হার মানি যে
অতল প্রেমানন্দে !

শ্রীনিরুপমা দেবী

সতী-মন্দির।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এই সময়ে হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সরোজের গৃহে শুভ পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে সরোজ বিস্মিত হইলেন! সাধারণ ভাবে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বেশ নিষ্ঠাবান্ বলিয়াই জানেন—কেন না ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর গুলি বিশদ ভাবে তাঁহার বিপুল অঙ্গে নিজেদের নিশানা লইয়া চলে ফেরে। কিন্তু তাঁহাকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তাহারা সকলেই বুঝিত যে, ত্রিসন্ধ্যা হরিনামের মালা জপা, গায়ে নামাবলীর ছাপ এবং তিলক ফোঁটা প্রভৃতির অতি বাহুল্য শুধু ধর্ম্মের ভজমী গুলি মাত্র। শুচি এবং অশুচির ভয়ে সন্তর্পণে চলা ফেরার মধ্যে পুরা দমে যে ভণ্ডামী আছে, সে বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ ছিল—কিন্তু এই কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে সবাই একটু ভয় করিয়া চলিত, কেন না তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিলে কোন্ সূত্রে কাহার যে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা তো আর বলা যায় না। বৃদ্ধকে সকলে ভয় করিত, বৃদ্ধ ভয় করিতেন শুধু রতনকে—তবে গ্রামের জমীদারের ভরসা পাইয়াছেন কি না, তাই এই দাম্ভিক যুবক ভবিষ্যতে আর কোনমতে মাথা তুলিতে না পারে, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি পড়িল! সরোজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন পাতিয়া দিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য দুই তিনবার 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিয়া চাপিয়া বসিলেন। পরে ট্যাঁক হইতে শামুকের ডিবা বাহির করিয়া বেশ বড় রকমের একটিপ ভরপুর নস্য নাসিকায় গুঁজিলেন।

কুশল প্রশ্নাদি এবং ঘরোয়া দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—"দ্যাখ, এই আমি সেদিন জমীদারবাড়ী গিয়েছিলাম, এই তোমার কাজের তিনি খুব সুখ্যাতি করছিলেন, তোমাদের স্কুলকে তিনি সাহায্য করতে চান।" সরোজ কহিল, "দেখুন, এসব কথাবার্ত্তা আমার সঙ্গে করেত ফল হবে না, রতনকে বল্‌বেন, সে যা করবে তাই হবে—জানেন তো স্কুল আমার নয়—রতনের।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন—অবিশ্যি—অবিশ্যি। তবে কি জান কথাটা বলে রাখলাম। জমীদার ছোকরা বটে, কিন্তু সব ভাল কাজেই তার খুব উৎসাহ দেখ্‌ছি। সরোজ কথাটা শুনিয়া একটু হাসিল মাত্র। বৃদ্ধ পুনরায় কহিলেন—"দেখ, সে তোমাদের স্কুল একদিন দেখ্‌তে চায়।" সরোজ উত্তর দিল—"বেশত, আমার কাছে কেন বল্‌ছেন, রতনকে বল্‌বেন।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"না, না, এই বল্‌ছি তোমার ত কোনো আপত্তি নেই।" সরোজ কহিল—"আমার মতামত আপনার জেনে ত কোনো লাভ নেই, রতনকেই বলবেন।" ভট্টাচার্য্য একটু চুপ করিয়া রহিলেন—কথাবার্ত্তায় সুবিধা হইতেছে না। জমীদারের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, আসল কথাটা যে এখনও বলা হয় নাই, কেমন

ঠেকিয়া যাইতেছে—কিন্তু বলিতেই হইবে যে! ভট্টাচার্য্য আবার কহিলেন—"আহা সে বেচারা তোমার দুঃখের কথা শুনে কত দুঃখ করছিল।" সরোজ এবার স্পষ্ট উত্তর দিল—"আমার ত কোনো দুঃখ নেই।" ক্রমাগত এই জমীদারের প্রসঙ্গ তার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িতেছিল, তাই সে বলিল—"জমীদারের কথা ছাড়া যদি অন্য কোনো কথা বলবার থাকে তাহলে বলুন, বেশীক্ষণ বস্‌বার সময় নেই, আমার হাতে অনেক কাজ আছে।" ভট্টাচার্য্য একটু কাশিলেন এবং একটু হাসিলেন। তারপরে একটু চাপা সুরে কহিতে লাগিলেন—"না, না, বল্‌ছিলাম, এই তার দয়ার শরীর কিনা, তাই তোমার অবস্থাটা শুনে তার মনে দয়া হয়েছে।" সরোজ কহিল—"আমি ছাড়া দয়ার পাত্র ত সংসারে ঢের আছে, যারা তাঁর দয়া চায় তাদের যেন তিনি দয়া করেন, আমিত তাঁর কখনও দয়া ভিক্ষা চাই নি। নিরাশ্রয় যখন ভেসে যাচ্ছিলাম, রতন তখন রক্ষা করেছে—রতনের দয়ায় আজও আর আমার কোনো অভাব নেই।" এতক্ষণ ভট্টাচার্য্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, সরোজের কথায় তাঁর উত্তর দিবার সুবিধা হইল, তিনি একটু বাঁকা হাস্য করিলেন এবং কহিলেন—"জমীদারের দয়া আর রতনের দয়া, কিসে আর কিসে—জমীদারের দয়ায় কত লোকের অবস্থা ফিরে গেছে, আর রতনের মতন লোকের দয়ায় না হয় পেটটা কোনো রকমে চলে যায়।" সরোজ কহিল—"আপনি কি বল্‌ছেন আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। জমীদার আমার কি উপকার কর্‌তে চান, কেন উপকার করতে চান? রতনের আশ্রয়ই আমার যথেষ্ট, আমার আবার কষ্ট কি?" বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য সরোজের সরলতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, আরও স্পষ্ট করিয়া না বলিলে সেত বুঝিবে না। এই নির্ব্বোধ সরল যুবতী যে নিশ্চয় জালে ধরা পড়িবে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ রহিল না। কথাবার্ত্তায় এবং জমীদারের পুরস্কারের প্রলোভনে সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া গেল। কাশিয়া গলাটা একটু সাফ্‌ করিয়া লইয়া, তিনি কহিলেন—"সেই আশ্রয়েই যখন থাক্‌তে হবে, তখন নিজের ভালটা কে না দেখে। এখন না হয় কোনো গতিকে মোটা ভাত আর মোটা কাপড় জুটছে, কিন্তু ভাল লোকের হাতে পড়লে কত সুখ সুবিধে। জমীদারের নজরে পড়া কি কম ভাগ্যের কথা! সেত রাজরাণীর মতন রাখ্‌বে বলেছে।" বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য যে কি উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন সরলা সরোজ এতক্ষণে তাহা বুঝিল! ঘৃণায়, লজ্জায়, রোষে সমস্ত দেহের রক্ত তার মুখে ঠেলিয়া উঠিল। কুপিতা ফণিনীর ন্যায় ফুঁসিয়া উঠিয়া সুন্দর গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকাইয়া সদর্পে সরোজ বলিল—"আপনাকে জমীদার চর করে পাঠিয়েছে! বাড়ী থেকে লোকে কুকুর শেয়ালটাকেও তাড়ায় না, কিন্তু আপনাকে তাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। আর এক মুহূর্ত্তও নয়, আপনি এখনি চলে যান। আমার বাড়ী চড়াও হয়ে, কোন্ সাহসে আমাকে অপমান করতে এসেছেন! ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে ভুলাতে চান, কিন্তু জানেন না কি ধর্ম্মের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য

আর কিছুই নেই। ছি—ছি—এমন জঘন্য কথা মুখে আন্‌তে আপনার জিব কেঁপে উঠ্‌ল না! যে আপনাকে এ কথা বলেছে তাকে মনে করিয়ে দেবেন যে, অবলা, অসহায়া রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা ভগবান্ নিজে করেন।" অসহায়া রমণী এতদূর ঝাঁঝিয়া উঠিবে ভট্টাচার্য্য তাহা ভাবেন নাই, তাই প্রথমে একটু থতমত খাইলেন—তবে তিনি পাকা খেলোয়াড় কিনা সহজে দমিলেন না, আর জমীদার যে বিস্তর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াছে। আসন হইতে উঠিবার সময়ে তাই তিনি আর একবার ক্রুর হাসিয়া কহিলেন—"যাক্, রাগ চণ্ডাল, রাগ পড়ে গেলে একটু বুঝে সুঝে দেখো—ভগবান্ যখন এমন জুটিয়ে দিচ্ছেন, তখন রাগের মাথায় সব খুইয়ো না। কত সুখে রাখ্‌বে, সেত আর তুমি জান না। রতন ছোঁড়াটার আর কি আছে—জমীদারের কাছে সে!" বার বার এই সমস্ত হীন প্রস্তাব শুনিয়া, সরোজের নারীমর্য্যাদার উপর আঘাত পড়াতে সে আর কোনো মতেই নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিল না—রাগে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, মহিমাময়ী দেবীর ন্যায় সে মস্তক উত্তোলন করিয়া সতেজে কহিতে লাগিল—"ও পাপ মুখে আর ভগবানের নাম নেবেন না। বৃদ্ধ বয়সে এ জঘন্য কাজে হাত দিতে আপনার একটু ভয় হল না—সমস্ত কাজের হিসাব বুঝিয়ে দেবার সময় যে এসেছে। অর্থের প্রলোভনটা কি এতই বড়? রতনের সম্বন্ধে সাবধান হয়ে কথা কইবেন—জানেন রতন কে?" বৃদ্ধ কহিলেন—"তা আর জানিনি—বুড়া হয়ে হাড় পাকিয়ে ফেল্লাম, সবই জানি। গ্রামের কেউ বা না জানে।" বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত হইয়া কাতরস্বরে একবার শুধু "মাগো" এই বলিয়া লজ্জায়, অপমানে এবং ক্রোধে সরোজের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। ঠিক এই সময়ে বজ্রকঠিনস্বরে কে বলিয়া উঠিল—"এই যে ভট্টাচার্য্য মশায় যে!" ভট্টাচার্য্য সে স্বর চিনিতেন—হঠাৎ এই অবস্থায় রতনকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি এতটুকু হইয়া গেলেন। রতন তেজস্বিস্বরে কহিল—"আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি। প্রাণের মায়া যদি থাকে, দূর হয়ে যান—বৃদ্ধ বলে ছেড়ে দিলাম। জমীদারকে সাবধান করে দেবেন। তাকে বেশ করে বুঝিয়ে বল্‌বেন, সে যদি অত্যাচার করতে না ছাড়ে, তবে বিপন্নকে রক্ষা করবার লোক এখনও আছে। আমি জীবিত থাক্‌তে সরোজের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পার্ব্বে না। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে—এত সোজা কথাটা বুঝবার শক্তি পর্য্যন্ত কি হারিয়েছেন? আপনি এখন যেতে পারেন।" এই বলিয়া রতন তাঁহাকে দ্বার-দেশ দেখাইয়া দিল। নিরাশ মনে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—এই গোঁয়ার ছোঁড়াটার জন্য পুরস্কার হাত ছাড়া হইবার খুবই সম্ভাবনা, অথচ রতনকে জব্দ করিবার কোনো উপায় ঠাহর করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটু দমিয়া পড়িলেন। কিন্তু এত সহজে ছাড়া হইবে না—দেখা যাক্ ভগবান্ কি করেন। এতদূর জঘন্য কাজ, তবু এমিতর দেবতার দোহাই দেওয়া—মনুষ্যত্ব হারাইলে মানুষ কতদূর অন্ধ হয়!

ভূম্যবলুণ্ঠিতা সরোজকে ধরে তুলিয়া লইয়া রতন বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং মাথায় পাথার হাওয়া করিতে লাগিল। একটু পরে সরোজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। রতন তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল—নাড়ী তখনও দুর্ব্বল। বাটীতে দুধ ঢাকা ছিল, গরম করিয়া সরোজকে খানিকটা খাওয়াইল। দুগ্ধ পান করিবার পরে সে শরীরে একটু বল পাইল। উভয়েই নীরব—সরোজ শয্যায় শায়িত, তাহারই এক পার্শ্বে রতন উপবিষ্ট। রতন কহিল—"সরোজ, আমি সব শুনেছি, এতদূর গড়াবে জান্‌লে, আগেই আস্‌তাম। তা' যাক্‌গে, এখন তুমি কেমন বোধ করছ?" সরোজ কহিল—"ভাল আছি, তবে একটু দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! তুমি কি এখনি চলে যাচ্ছ না কি?" রতন কহিল—"না, আর একটু দেখে যাব; ঠিক এ অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে কেমন করে যাব?" সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। একি সরোজের ডাগর চক্ষু দুটী হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইল কেন? ব্যগ্রকণ্ঠে রতন কহিল—"সরোজ, তুমি কাঁদছ?"

"কৈ নাত।"

"ছি, আমার কাছে মিথ্যা কথা।"

"আমি ভাবি, এমন করে তোমার মতন আমার ভাবনা আর কেউত ভাবে না। তুমি আমার কে যে, তুমি আমার এত কর?"

"সত্যি, সরোজ, আমি কি তোমার কেউ নই?"

সরোজ কথাটা শুনিয়া লাল হইয়া গেল, কি উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—কথা বাধিয়া গেল, শুধু পলকহীন করুণ দৃষ্টিতে এক দৃষ্টে রতনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু দুটী পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইল; রতন তাহার ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া সরোজের বসনাঞ্চল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া দিল এবং বলিল—"ছি, সরোজ, আবার কান্না।" সরোজ কহিল—"তোমার ব্যবহার, তোমার ভালবাসার কথা মনে হলেই আর যে আমি চোখের জল রাখ্‌তে পারি নি।" এই বলিয়া সরোজ চুপ করিল। একটু পরে সে পাশ ফিরিল, কম্পিত হস্তখানি বাড়াইয়া দিয়া রতনের হাত ধরিল এবং মিনতিপূর্ণ-স্বরে কহিল—"তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, আমার কাছে বসে থাক। একলা আমি থাক্‌তে পার্ব্ব না। আমার বড় ভয় করছে।" রতন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ভয় কিসের সরোজ?" "কি জানি কেমন ভয়—ভয়—করছে; কেবল যেন মনে হচ্ছে কি একটা বিপদ ঘটবে। আমার গা কেমন ছম্‌ছম্‌ করছে।"

"ও, কিছু না, শরীরটা এখনও একটু দুর্ব্বল আছে কি না, তাই ওরকম মনে হচ্ছে।"

রতন ভাবিল, একি দেবতার ইঙ্গিত?

রতনকে তদবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সরোজ জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাব্‌ছ, রতন! রতন!"—সরোজের এই নূতন সম্বোধন।

রতন উত্তর দিল—"কি জানি সরোজ, অনেকগুলো ভাবনা এক সঙ্গে মনের মধ্যে ঢুকে গোল বাধিয়ে দিয়েছে। সরোজ, আমরা ত দূরে পড়েছিলাম, ইচ্ছে করে ত কাছাকাছি হই নি; কিন্তু এত কাছে, তবু কত দূরে ?" সরোজ দেখিল রতনের দৃষ্টি উদাস এবং কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় ছায়ায় তাহার উজ্জ্বল মুখখানি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার ক্ষীণ হাস্যরেখা অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়িতেছিল। মূর্চ্ছাতুর ম্লান দিবসের আলো আলস্যভরে যেন অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—পশ্চিম গগনে তার ক্ষীণ রক্ত আভাটুকু যেন বেদনারঞ্জিত বলিয়া মনে হইতেছে। দিবস ও রজনীর সন্ধিক্ষণে—অস্ত ও উদয়ের বিচিত্র লীলাময় দৃশ্যে, বিদায় ও আগমনের রহস্যজাল ভেদ করিয়া কি এক বিচিত্র অপূর্ব্ব রাগিণীতে সুখ বেদনাময় করুণ সঙ্গীতের মধুর সুর নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সরোজ ও রতন মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির লীলাময় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উভয়ের প্রাণ আর্দ্র হইল।

গবাক্ষ দিয়া মুক্ত-বায়ু বহিতেছিল—সরোজের চূর্ণ কুন্তলরাজি লইয়া সে খেলা করিতে লাগিল, সরোজ ত্রস্তভাবে যতবারই সরাইয়া দেয়, চূর্ণকুন্তল উড়িয়া উড়িয়া ততবারই মুখের উপর আসিয়া পড়ে—ম্লান সন্ধ্যা-কমলের উপর লুব্ধ ভ্রমর যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে!

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরোজ প্রথমে কথা কহিল—"রতন, আজ তোমাকে অনেক কথা বল্‌বার ইচ্ছে হচ্ছে।"

"কি কথা, সরোজ ?"

"সে অনেক কথা—অনেক।" এই বলিয়া সরোজ আবার চুপ করিল।

রতন শুধু ডাকিল—সরোজ!

সরোজের যেন চমক ভাঙ্গিল—"আচ্ছা, রতন তুমি আমার মনের কথা জান ?"

সরোজের এই সরল প্রশ্ন শুনিয়া রতন একবার হাসিল মাত্র, এবং পরে উত্তর দিল—"তোমার কি মনে হয়, সরোজ ?"

"আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি, এক একবার মনে হয়, বোধ হয়, জান; কিন্তু তার পরই মনে হয়, বোধ হয়, জান না।"

"কিন্তু জানি আর না জানি, তুমি নিজে ত কিছুই জান্‌তে দাও নি।"

"রতন, বলবার খুবই ইচ্ছা হয়—কতদিন বল্‌ব, বল্‌ব ভেবে বল্‌তে পারিনি; না—না, আমি ঠিক তা বল্‌তে পার্ব্ব না। আচ্ছা একটা কথা বলি, তুমি আমার জন্য এতদূর করলে, কিন্তু অপবাদের হাত হতে রক্ষা করতে পারলে না!"

"কিন্তু তাতে ভাগ নিয়েছি ত; লোকের মুখ বন্ধ করবার একটা পথও দেখ্‌তে পেয়েছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সরোজ কহিল—কি পথ, রতন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] মাঘ, ১৩২২। [১০ম সংখ্যা।

আকাঙ্ক্ষা।

সারা বুকের আশা নিয়ে তোমায় ওগো চাই,
হেথায় আমার আপন ব'লে আর কিছু যে নাই ;
তাইত তোমায় পাবার তরে
হৃদয় কেঁদে লুটিয়ে মরে,
দুই বাহু তাই বাড়িয়ে দিয়ে তোমার পানে ধাই,
জীবনভরা আশা নিয়ে ওগো তোমায় চাই !

হেথা, কত রকম ঝঞ্ঝাবাতে পূর্ণ চারিধার,
শুধু আনা গোনা দিবস গণা এই দেখি যে সার ;
মন ত আমার নাহি মানে
ছোটে শুধু তোমার পানে,
কোথায় গেলে তোমায় পাব ভাবি বারম্বার,
হেথা অহর্নিশি দুঃখরাশি পূর্ণ চারিধার।

কত দূরে কোন্ সেখানে কোথায় আমার ঘর ?
অনেক বুঝি দীর্ঘ সে পথ বড্ড লাগে ডর !
তোমার রাঙা চরণতলে
ভেসে এ মোর নয়ন জলে

তোমার 'পরে করতে যে চাই সকলি নির্ভর!
কোথায় তুমি রাজার রাজা, কোথায় আমার ঘর?

সারাদিনের কাজের পরে কুড়িয়ে কি যে আনি,
দেখি আমার ভিক্ষা থলি শূন্য থলিখানি!
যারা আমার ছিল কিছু—
ফেলে রেখে এলাম পিছু,
নিতান্তই দীন ভিখারী আমার জীবনখানি,
সারাদিনের শ্রমের শেষে কিছুই নাহি আনি!

তাইত আমার শূন্য হৃদয় তোমায় এত চায়,
সুখ সম্পদ সকল ছেড়ে তোমার পানে ধায়!
যেথায় সকল পূর্ণ হবে
কোন অভাব নাহি রবে,
সকল আশা ভালবাসা পড়বে তোমার পায়,
আমার ছোট এ দীন হৃদয় তোমায় পেতে চায়!

শ্রীমতী কিরণময়ী সেন।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমরা লংফিল্ডে গেলাম। লংফিল্ড আমাদের শান্তি ও আনন্দকুটীর স্বরূপ হইয়াছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে সেখানকার আনন্দের কথা মনে হইলে যেন যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া পাই।

প্রথম বৎসর যখন আমরা সেখানে পৌঁছিলাম, ঘরের অকুলান হওয়াতে গোয়াল-বাড়ীর ক'টী ঘর পরিষ্কার করিয়া তাহা খাবার ও ছেলেদের খেলিবার ঘরে পরিণত করা হইল। তাহা পাইয়াই ছেলেদের কত আনন্দ।

একদিন সেপ্টেম্বর মাসের সন্ধ্যাবেলায় আমি ও উরসুল্লা নদীর উপরে সেতু বাঁধিবার এবং পাশেই একটী আস্তাবল করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম, ছেলেরা কাছেই খেলায় মত্ত ছিল। হঠাৎ গুই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া খবর দিল, "চার ঘোড়ার একটী গাড়ী আসিতেছে।"

উরসুল্লা—"কে আসিতেছে? ফিনিয়স ভাই, দৌড়ে গিয়ে গাড়ীটা থামাও না, না হলে ওঁর অত সাধের তৈরী রাস্তা সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমি বাহিরে গিয়া যাহা মনে কল্পনাও করি নাই তাহাই দেখিলাম। দেখিলাম, লেডী কেরোলাইন খুব সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া উপস্থিত। হাত মিলাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। পরে ধীরে ধীরে হঠাৎ সকলের সামনে উপস্থিত হইয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবেন বলিয়া গাড়ী বাহিরেই বিদায় দিয়া পদব্রজে চলিলেন।

উরস্থল্লা গাড়ী ফিরিবার শব্দ শুনিয়া ভাবিল যে, যিনি আসিয়াছিলেন তিনি ফিরিয়া গেলেন; সুতরাং সে নিশ্চিন্তভাবে এক হাতে ওয়ালটারকে কোলে লইয়া ও অন্য হাতে দুরন্ত গুইকে—যে জলের ভিতর পা দিয়া ছপ্ ছপ্ করিতেছিল—শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; আর লক্ষ্মী এডবিন, যে কখনও কাহাকেও কষ্ট দিত না, মিউরিয়েলের পাশে বসিয়া খেলা করিতেছিল।

লেডী কেরোলাইন হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি মনোরম ছবি।"

উরস্থল্লা ছেলেদের ছাড়িয়া দৌড়াইয়া আসিল। "লেডী কেরোলাইন, কতদিন আপনাকে দেখি নাই, এর মধ্যে আমাদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

কেরোলাইন—"তুমি তিন ছেলের মা হইয়াছ, আর ঐ বুঝি তোমার হতভাগ্য মেয়ে, ওর কথা উইলমের কাছে শুনিয়াছি" এই বলিয়া কেরোলাইন আমাদের শান্তি-প্রতিমা মিউরিয়েলের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

উরস্থল্লা—"চলুন ঘরে চলুন, আমার স্বামী একটু পরেই বাড়ী ফিরিবেন।"

কেরোলাইন—"হাঁ আমার থাকিতে খুব ইচ্ছা, কিন্তু তোমার স্বামীকে একটু ভয় করি।"

গুই নির্ভয়ে লেডী কেরোলাইনের আঙ্গুল ধরিয়া ফুলের বাগানের দিকে দেখাইয়া বলিল, "দেখুন তো ওটা কি সুন্দর!" ছেলেবেলা হইতে ভালবাসায় পরিবেষ্টিত থাকার দরুণ উরস্থল্লার ছেলে মেয়েরা ভয় ও লজ্জা কাহাকে বলে, তাহা একেবারেই জানিত না।

কেরোলাইন—"হাঁ ভারী সুন্দর।"

গুই—"ঐ যে পাহাড় দেখছেন, ঐ পাহাড়ে বাবা একদিন আমাদের নিয়ে যাবেন বলেছেন।"

কেরোলাইন—"তোমরা বাবার সঙ্গে বেড়াতে খুব ভালবাস?"

গুই—"ভালবাসি বই কি!" যেন কেরোলাইনের এ প্রশ্ন ছেলেদের কাছে অদ্ভুত মনে হইল, সকলের মুখে বিদ্যুতের মত হাসি বহিয়া গেল। গৃহখানি যে কত সুখের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

কেরোলাইন—"উরস্থল্লা! তুমি তাহা হইলে জনকে বিবাহ করিয়া অসুখী হও নাই।"

উরস্থল্লা—"অসুখী! আপনি বলেন কি?"

কেরোলাইন—"রাগ করিও না ভাই, আমি তো সর্ব্বদাই বলিতাম ছেলেটী বড় ভাল। আর আমার ছোট ভাই উইলম্ তোমার স্বামীকে যে কি ভক্তি করে তা মুখে বলা অসাধ্য।"

এইরূপে কথাবার্ত্তা চলিল। লেডী কেরোলাইন আমাদের গৃহে একদিন থাকিলেন; একদিনেই ছেলেরা তাঁহাকে নিজেদের খুব আপনার করিয়া তুলিল, গুই ছোট্ট নাইটের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, এডবিন নিজের পায়রা আনিয়া দেখাইল, লাজুক ভয়ালটার তাঁহাকে একটী ফুল উপহার দিল।

লেডী কেরোলাইন যেন একটী নূতন ছবি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "উরসুল্লা, বাহিরের আড়ম্বরের ভিতর থাকিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া গিয়াছি, যদি একটা নির্জ্জন স্থান পাইতাম সেখানে সামান্য গ্রাম্য মেয়েদের মত জীবনযাপন করিতাম।"

উরসুল্লা—"বাড়ীর মত নির্জ্জন ও আরামের স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি?" কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে খাবার সময় হইল, সকলে ভিতরে গেলাম। খাবার ঘরটী এবং সেখানকার সমস্ত জিনিষগুলি খুব সাদাসিদে, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমাদের জিনিষগুলি বড়মানুষদের গৃহের উপযোগী নহে বলিয়া কখনও আমাদের লজ্জা হয় নাই। খাবার ঘরে বাসলে এক জানলার ভিতর দিয়া বাগানের গন্ধে গৃহ আমোদিত হইত, অন্য জানলা দিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত, খাইতে বসিলে মনে হইত যেন বাগানে বসিয়া খাবার খাইতেছি।

ছেলেরা লেডী কেরোলাইনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিউরিয়েল নিজের অভ্যাস মত নিজের পোষা পায়রাটীকে কোলের উপর লইয়া চৌকাঠে বসিয়া আদর করিতেছিল. হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ বাবা আস্‌ছেন।"

"কৈ?"

"ঐ বাগানে এইবার ফুল তোলবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। যা পায়রা উড়ে পালিয়ে যা, আমার বাবা এসেছেন।"

পর মুহূর্ত্তেই বালকদের কোলাহল শুনা গেল, "বাবা এসেছেন।"

জন সকলকেই আদর করিয়া কিছু না কিছু বলিল। শিশুরা জন্মাবধি পিতাকে এক ন্যায়পরায়ণ ভালবাসায় পরিপূর্ণ খেলার সাথীর মত পাইয়াছিল। উরসুল্লার মহা সৌভাগ্য যে সে এমন স্বামী পাইয়াছিল।

জনের চোখ উরসুল্লাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। উরসুল্লা নিয়ম মত দেখা দিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "আজ আমাদের বাড়ী লেডী কেরোলাইন অতিথি হইয়াছেন।"

ঠিক এই সময় লেডী কেরোলাইন হাসিতে হাসিতে কোণ হইতে বাহির হইয়া

আসিলেন। "আমাকে আপনারা প্রত্যাশা করেন নাই, না? আমি আপনাদের অসুবিধায় ফেলি নাই তো?"

জন—"মিসেস হ্যালিফ্যাক্সের অভ্যর্থনাই আমাদের অভ্যর্থনা।"

জনের কথাবার্ত্তায় মনে হইল, যেন লেডী কেরোলাইনের এই অযাচিতভাবে আসায় সে একটু চিন্তিত হইয়াছে। লেডী কেরোলাইন খাবার সময় যখন মিউরিয়েলকে নিজের কাছে ডাকিলেন, জন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে নিজের পাশে টানিয়া লইয়া বলিল, 'ও রোজ এখানেই বসে।'

খাবার সময় বিশেষ করিয়া কিম্বেলের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। দেখিলাম সেই সময় জন গভীর মনোযোগের সহিত কেরোলাইনকে দেখিতেছিল। খাওয়া হইয়া গেলে গুই কেরোলাইনের আঙ্গুল ধরিয়া বাগানে লইয়া চলিল. সে মার অতি আদরের পদ্মটী ছিঁড়িয়া তাঁহাকে দিতে যাইতেছিল, আমি মার অনুমতি বিনা ছিঁড়িতে বারণ করায় সে আমাকেই অনুমতি আনিবার ভার দিল।

আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, জন ও উরসুল্লা খুব গম্ভীরভাবে কি আলোচনা করিতেছেন। জন বলিতেছিল, "আমি অনেকদিন হইতেই ইহা জানিতাম, কিন্তু উনি এখানে না আসিলে হয়তো কখনও এসব কথা বলিয়া তোমার মনে বেদনা দিতাম না"

উরসুল্লা কাতরস্বরে বলিল, "কিন্তু জন, ইহা হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, লোকেরা মেয়েদের সম্বন্ধে একটু কথা পেলে হয়, আমাদের নামে কলঙ্ক রটাইতে পারিলে যেন বাঁচে।"

জন—"উরসুল্লা, আমি আমার স্ত্রীর নাম এরকম স্ত্রীলোকের নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয় ইহা চাই না। তুমি জান না ঐ মহিলাটীকে তোমার হাত স্পর্শ করিতে দেখিয়া আমার কি কষ্টই না হইয়াছিল।"

"ছি জন!"

জন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু আমার স্ত্রী যে একজন অসচ্চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করিবেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

উরসুল্লা—"কেরোলাইন চিরকালই বোকা, কিন্তু তাহার অন্য কোন চরিত্রের দোষ কখনও ছিল না। একজন দোষী কি কখনও সরলতার সহিত শিশুদের সহিত ঐরূপ হাসিতে পারে? আহা, ওর ছেলেপিলে নাই।"

জন। "উরসুল্লা, তুমিই সত্যি সত্যি খ্রীষ্টান; হাঁ, আমাদের কখনও তাড়াতাড়ি বিচার করা উচিত নহে।"

সমস্ত বিকাল উভয়েই লেডী কেরোলাইনের সহিত খুব নম্র ব্যবহার করিলেন। কেরোলাইনকে নির্দ্দোষ বালিকার মত শিশুদের সহিত খেলিতে দেখিয়া উভয়ের মনে

হইল, জগৎ কেরোলাইনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেছে এবং তাঁহারা যে "সন্দেহ করিও না" মন্ত্র শুনিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া উভয়ের খুব আনন্দ হইল।

খাওয়া শেষ হইল; আমরা সব বাগানে বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। ছেলেরা ছুটোছুটী করিয়া খেলিতে লাগিল। জন ও উরসুল্লা বেড়াইতে বেড়াইতে কত গল্প আরম্ভ করিলেন।

লেডী কেরোলাইন উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঠিক যেন সেই পুরাকালের আদম ও ইবা বেড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে ইহারা যেন নূতন বিবাহিত।"

ফিনিয়স। "ভালবাসা কি আবার কখন পুরাতন হয়?"

কেরোলাইন। "ভালবাসার কথা বলিবেন না, আমি ভালবাসা টালবাসা বিশ্বাস করি না।"

ফিনিয়স। "কিন্তু যে পবিত্র ভালবাসায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়, মা বাবা ছেলে মেয়ের বন্ধনে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সে ভালবাসায় আপনি কি বিশ্বাস করেন না?" আমার কথাগুলি যেন তাঁহার মনে গিয়া বিঁধিল, তিনি চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস অসম্ভব।"

সন্ধ্যা বেলায় ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িল। কেরোলাইন গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে একজন চাপরাসী আসিয়াছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া রাগিয়া বলিলেন, "গাড়ী আন নাই কেন?"

চাপরাসী। "প্রভুর বিনা আজ্ঞায় কি করিয়া আনি?"

লেডী কেরোলাইনের মুখ রাগে লাল হইয়া গেল।

জন। "চাপরাসী, তোমার কর্ত্রীর সহিত এমন অভদ্র ভাবে কথা বলিও না।"

জনের গলা শুনিয়া চাকরটী নরম হইয়া বলিল, "মহাশয় আমার প্রভু বলিলেন, আমার কর্ত্রী তাঁহার বিনা আজ্ঞায় চলিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্ব-ইচ্ছায় যেমন করিয়া হউক ফিরিয়া যাইবেন।"

কেরোলাইন অস্বাভাবিক ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, তোমার প্রভুকে বলিও, তোমার প্রভুপত্নী নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবেন।"

জন চাকরকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল এবং উরসুল্লা কেরোলাইনের চাকরের নিকট নিজ স্বামী সম্বন্ধে এরূপ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যে ভয়ানক অন্যায় হইয়াছে বুঝাইল।

কেরোলাইন। "হা হা চাকরের সম্মুখে! আমি ও বার্থউড সমস্ত প্রতিবাসীর তামাসা যোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আবার তাঁর আজ্ঞায় আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইব?"

কেরোলাইনের চোখ রাগে জ্বলিতেছিল, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "মিসেস হ্যালিফ্যাক্স, আমি আপনাকে আরও দুঘণ্টা জ্বালাতন করিব। আমার একটা চিঠি কি পাঠাইতে পারিবেন ?"

উরসুল্লা। "কাহাকে, আপনার স্বামীকে ?"

কেরোলাইন। "আমার স্বামীকে ? কখনও না ! হাঁ, আমার স্বামীকে।" কথার প্রথমটা তাচ্ছিল্যে পূর্ণ, শেষটা একেবারে অন্য রকম। "উরসুল্লা, স্বামী কে ? যে নির্যাতন করে সে, না যে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ভালবাসে, যে জীবনকে আনন্দে, সহানুভূতিতে—" উরসুল্লা যেন বাকীটুকু শেষ করিয়া বলিল—"পাপে পূর্ণ করিয়া দেয়।" সে এত ধীরে বলিল যে আর কাহারও কাণে তাহা পৌঁছিল না।

এই সময় জন অগ্রসর হইয়া বলিল, "লেডী কেরোলাইন, আমার বাড়ীতে এই সব ঘটনা হওয়ায়, এবং আপনি আপনার স্বামীর বিনা অনুমতিতে এখানে আসায় আমি সাতিশয় দুঃখিত। আমার মতে প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামীর সমস্ত কথায় বাধ্য থাকা উচিত,—অবশ্য তিনি যদি কুপথে লইয়া যাইতে চাহেন সেখানে প্রতিরোধ করা উচিত—এখন আপনি যে আপনার স্বামীকে চিঠি লিখিতেছেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।"

কেরোলাইন এবার স্পষ্টই বলিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীকে চিঠি লিখিবেন না।

জন। "যখন আমার বাড়ী হইতে চিঠি লেখা হইবে, তখন কাহার নিকট পত্র পাঠাইতে হইবে জানিবার অধিকার কি আমার নাই ?"

কেরোলাইন। "আমার একজন বন্ধুকে।"

জন। "যে মহিলা নিজের স্বামীকে ঘৃণা করে তাহার পক্ষে বন্ধু—"

কেরোলাইন। "পুরুষ বন্ধু ভয়ানক জিনিস।"

ঠিক এই সময় শিশু গুই, যে না ঘুমাইয়া বসিয়াছিল, শয়নের পূর্ব্বে কেরোলাইনের নিকট চুমু লইবার জন্য গাল বাড়াইয়া দিল।

"আমি, আমি নির্দ্দোষ শিশুকে চুম্বন করিব" বলিয়া কেরোলাইন ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উরসুল্লা গুইকে সরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিয়া, নিজে, জন ও কেরোলাইন তিন জনেই বৈঠকে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। সেখানে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমি পরে শুনিলাম।

কেরোলাইন খানিকক্ষণ বসিয়া খুব কাঁদিলেন। তার পর দোয়াত কলম চাহিলেন, খানিক পরেই বলিলেন, "আচ্ছা আজ আমি অপেক্ষা করিব, কিন্তু তোমরা রাত্রে থাকবার যায়গা দেবে তো ?"

জন। "আপনি থাকায় আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপনি যাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমার বাড়ী হইতে আমি কখনও তাহা হইতে দিব না।"

কেরোলাইন। "মিষ্টার হালিফ্যাক্স, আপনার এ সব কথা বলিবার কি অধিকার?"

জন। "অধিকার? অধিকার এই যে, আমি একজন ভদ্রলোক হইয়া, একজন অজ্ঞান ভদ্রমহিলাকে লোভ কুপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি?"

কেরোলাইন। "কার হাত হইতে, কি হইতে রক্ষা করিবেন?"

জন। "মিষ্টার শেরার্ড বারমিলের কবল হইতে। সে নীচে ঘুরিতেছে, আপনি একবার তাহাকে দেখিলে সৎ অসৎ বিচারের শক্তি হারাইবেন, এবং ইংরাজ মহিলাদের নামে কলঙ্ক আনিবেন।"

জনের গলায় রাগের চিহ্নমাত্র ছিল না, সে খুব ধীর ভাবে সত্যের খাতিরে যেন কথাগুলি উচ্চারণ করিল। দোষী কেরোলাইন দুই হস্ত দিয়া নিজের মুখ আচ্ছাদিত করিল। উরসুল্লা খানিকক্ষণ যেন কথা বলিতে পারিল না, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কেরোলাইন আমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছেন, সব কি সত্য?" কেরোলাইন লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "হাঁ সব সত্য হবে, সব সত্য হবে, উরসুল্লা লোকটী আমায় পূজা করে, সে যদি আমার জীবনের আনন্দ ফিরাইয়া দেয় তবে আমি কিসের জন্য এখানে পড়িয়া থাকিব" এই বলিয়া উন্মাদের মত গান ধরিলেন।

উরসুল্লা একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেল, যেন তারও সব দয়ামায়া শেষ হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ ছেলেদের কোলাহল শুনিয়া ভাবিল—আহা, ওর ছেলে নাই, ছেলে থাকিলে সে কখনও ওরূপ হইত না।

তিনি কেরোলাইনের কাপড় ধরিয়া বলিলেন, "কেরোলাইন, আমি যখন তোমার কাছে ছিলাম, তখন তোমার একটী শিশু মারা গিয়াছিল; যখন তুমি স্বর্গে যাবে, তখন কি তুমি তার সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে?"

গান বন্ধ হইয়া এবার কান্নার শব্দ শুনা গেল। "আমি খোকার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" উরসুল্লা সময় বুঝিয়া বলিলেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তিনি সাহায্য করিবেন।"

কেরোলাইন—"ভগবান্ টগবান আছেন, কিম্বা পরলোক বলিয়া কিছু আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

উরসুল্লা বজ্রাহতের মত হইয়া বলিলেন, "জন, ইহাকে কে রক্ষা করিবে? এর যে টানিবার কিছু নাই, বাড়ী নাই, স্বামী নাই, ভগবান্ নাই; কি ভয়ানক অবস্থা!"

জন—"উরসুল্লা, হতাশ হইও না, একবার চাহিয়া দেখ।"

কেরোলাইন হাপুসে কাঁদিতেছিল, ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, "তোমরা কি

ভয়ানক নির্দ্দয়, আমার খোকার কথা কেন বলিলে ? হায় সে যদি থাকিত, হয়তো পাপ হইতে আমায় বাঁচাইতে পারিত।"

উরস্থলা—"কেরোলাইন, আমি তোমার মুখের কথা শুনিতে চাই, সত্য বল, তুমি কি এখনও নির্দোষ ?"

কেরোলাইন—"আমায় স্পর্শ করিও না, আমি কি জানিলে তুমি ঘৃণা করিবে।"

জন—"উরস্থলা কখনও ঘৃণা করিবে না, কারণ তুমি কৃপার পাত্র, নিতান্ত অভাগিনী, উরস্থলা ভাগ্যবতী।"

কেরোলাইন—"হাঁ আমি অত্যন্ত ভাগ্যহীনা।"

উরস্থলার চোখ জলে ভরিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "ভাই কেরোলাইন, আমি সত্যই তোমায় ঘৃণা করিব না ; আমি জানি লোকে তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে, পাপ পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তুমি একবার বল যে তুমি পাপ কর নাই।"

"হাঁ আমি পাপ করিয়াছি।"

উরস্থলা চমকাইয়া স্বামীর নিকট সরিয়া আসিলেন, তাহার অনেকক্ষণ পরে জন ডাকিলেন, "বোন কেরোলাইন!" সে ডাক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মাথা উঠাইল। জন বলিলেন, "আমরা আপনার আত্মীয় এবং আপনার মঙ্গলপ্রার্থী, আপনি কি আমাদের কথা শুনিবেন ?"

কেবল কান্নার শব্দ শোনা গেল।

"আপনাকে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আপনি চিরদিনের জন্য এই পাপ চিন্তা পরিহার করিবেন।"

কেরোলাইন—"আমি ইহাকে পাপ মনে করি না। সে ভদ্রলোক, আমায় ভালবাসে এবং আমি তাহাকে ভালবাসি, ইহাকেই প্রকৃত বিবাহ বলে। আমি কোন প্রতিজ্ঞা করিব না, আমায় যাইতে দিন।"

জন—"আমার গৃহ হইতে আমার স্ত্রীর একজন আত্মীয়া নিরুদ্দেশ হইবেন, আর আমি বাধা না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিব, এ কখন হইতে পারে না।"

কেরোলাইন—"আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, আমি লর্ড লাক্সমোরের মেয়ে।"

জন—"আপনি লর্ডের মেয়ে হউন, কিম্বা রাজকন্যাই হউন, তাহাতে কি আসে যায়। আপনি না চাহিলেও আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আমি বারমিলকে বিদায় করিয়া দিয়াছি।"

কেরোলাইন—"পৃথিবীতে একটা লোক যে আমায় ভালবাসে, সে চলিয়া গিয়াছে ? আমি এখনি যাইতেছি।"

জন—"কোথায় যাইবেন, সে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে গোলমাল হইলে তাহার

কয়েদ হইবে, সুতরাং আপনাকে পাওয়া অপেক্ষা পালানটাই তাহার পক্ষে মঙ্গল, তাই সে পালানই শ্রেয় মনে করিল।"

কেরোলাইন—"কেহ আমায় ধরিয়া রাখিতে পারে না, কারণ আমি স্বাধীন।"

জন—"কিন্তু পাপ হইতে রক্ষা করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

"পাপ!"

জন—"হাঁ নিশ্চয়ই পাপ। আপনার দর্শন, কিম্বা 'স্বামী অত্যাচারী' ওজর, কিম্বা ভগবান্ মানেন না কোন কথাই টিকিবে না। ভগবানের নিয়মে যদি বিশ্বাস না করেন, মানুষের নিয়ম তো মানেন? সমাজের শান্তি, পবিত্রতা রক্ষার জন্য যা নিয়ম তাহা ভাঙ্গিলে নিশ্চয়ই পাপ করা হয়।"

"কি নিয়ম?"

জন পরিষ্কার বাইবেলের ভাষায় বলিলেন, "কদাপি ব্যভিচার করিও না।"

কেরোলাইন এতক্ষণ পরে যেন তাহার পাপ দেখিতে পাইলেন। "আমি কি তাই? ইহা বিলিয়মের কাণে যাইবে।" পরে উরসুল্লার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "তোমা ছাড়া ইহা আর কেহ জানে না, বিলিয়মকে জানতে দিও না যে তার বোন—।"

কেরোলাইন শেষ কথা উচ্চারণ করিলেন না। জন উরসুল্লাকে তাঁহার নিকট হইতে বাহিরে আনিয়া অল্প কথায় সব ঘটনা বলিলেন। তাহার পর উভয়ে পরামর্শ করিয়া কেরোলাইনের সেই রাত্রেই বাড়ী ফেরা মঙ্গল মনে করিলেন। লোক শুধু শুনিবে, কেরোলাইন তাঁর বোনের নিকট একদিন বেড়াইতে গিয়াছিল।

ঘোড়া প্রস্তুত হইলে তিনজনে যাত্রা করিলেন। আমি অভাগিনী কেরোলাইনের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বাতাসের গান শুনিতে শুনিতে বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

নিঃসংশয়।

পারিবে না এ সংসার, বাঁধিয়া রাখিতে আর
অমৃতের আস্বাদন পেয়েছি যে আমি,
কিসের কিসের ভয়, কেন আর এ সংশয়?
আমার জীবন ভ'রে আছ দিনযামী!
নিকটে থাকিলে মোর, সংসার কঠিন ডোর
পারিবে না কখনও পরাতে শৃঙ্খল,

কি ভয় কি ভয় আছে, তুমি যে আমার কাছে
তোমারি প্রেমের বলে কাটিবে সকল !
যা কিছু আমার আশা অন্তরের ভালবাসা
দেখিতেছ অহর্নিশি তুমি প্রভু স্বামী,
যা কিছু অভাব শূন্য, আমার এ পাপ পুণ্য
তোমারি সমুখে মেলি রেখে দিছি আমি !
গোপন কিছুই আর রহিল না প্রেমাধার
করিয়াছ অধিকার ছোট হিয়াখানি,
তোমার ও সুধাহাসি দিতেছে করুণারাশি
আমার জীবন প্রাণ ধন্য ব'লে মানি !

শ্রীমতী কিরণময়ী সেন।

সতী-মন্দির।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বুঝ্‌তে পার না সরোজ ? শুধু তোমার উপকার করবার জন্য যে আমি তোমার এতদূর করছি, লোকের পক্ষে সেটা বোঝা তত সহজ নয়, তাই অতি সহজে যেটা বোঝা যায় তাই তারা বুঝেছে ; কিন্তু তোমার উপর যে আমার একটা দাবি থাক্‌তে পারে, সেটা যদি কোনো দিন সাব্যস্ত করতে পারি, তখনও লোকে বল্‌বে, তবে সে বলা অন্য রকমের। চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, সমাজের চিরপ্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গলে, যারা গেল গেল করে চেঁচিয়ে মরে, শুধু পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে চায়, তারা কোন দিনই বল্‌তে ছাড়বে না—তবে আজকের বলা এবং তখনকার বলায় একটা প্রভেদ থাক্‌বে, আজকে বল্লে তার মধ্যে একটা অপমান আছে, আর সেদিন যখন বলবে তা সে অপমানের মতন আমাদের গায়ে এসে আর বিঁধ্‌তে পার্ব্বে না।"

"রতন, আমি তোমার কথা ভাল করে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"সরোজ, ছেলেবেলার কথা মনে আছে ?"

"আছে।"

"সেটা কি চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে গেছে ?"

"সে কথায় এখন আর কি দরকার ?"

"সত্য আজ নতুন করে দেখা দিয়াছে, তাই আজ তার সবখানি জানা দরকার।"

"কিন্তু লোকে ত তাকে মান্‌বে না ?"

"তাই আজ সত্য সে সব বাধা ভেঙ্গে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা চাইছে। সরোজ, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।" সরোজ নীরব—কোনো উত্তর দিল না দেখিয়া রতন কহিতে লাগিল—তোমাকে আমার কাছে কে এমন করে ফিরিয়ে আন্‌লে? ফিরে আস্‌বার ত কোনো কথাই ছিল না—শ্বশুরবাড়ীতে থাকবার মতন জায়গা পেলে না কেন?"

"ভগবানের ইচ্ছা।"

"সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি তবে তুমি দাঁড়াবে? ঘটনা ও অবস্থার মধ্য দিয়া যে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করা কি ঠিক হবে?"

"কিন্তু লোকে কি এত সহজে সেটাকে"—রতন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ঠিক ভগবানের ব্যবস্থা বলে নেবে না, কিন্তু জীবন দিয়ে যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায়, তবে শেষে নিশ্চয়ই নেবে। আর একটা কথা লোকের মতামতের চেয়ে সত্য ঢের বড়।"

"কিন্তু আমার পক্ষে যে সবই গুরুতর অপরাধ।"

"কে বল্লে?"

"সবাই বল্‌বে, আর তুমি কি এতে সুখী হবে? শেষে যদি তোমার মনে"—সরোজের কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে রতন বলিয়া উঠিল—"আমি কি এতই হীন সরোজ?" "আমাকে ক্ষমা কর। আমার সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আজ আর কিছু বল না।"

জমীদার সব কথা শুনিয়াছে—বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য বলিয়া আসিয়াছেন। ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সে গর্জ্জন করিতে লাগিল, কিন্তু রতনের বিরুদ্ধে খপ্‌ করিয়া কিছু করিতে তারও সাহসে কুলাইল না। শুধু অত্যন্ত সন্তর্পণে পরামর্শ চলিতে লাগিল। রতনের কাছে তার দুরভিসন্ধি এবারেও অবিদিত রহিল না।

জমীদার মতলব আঁটিয়াছে যে অমাবস্যার রাত্রে লোকজনের সাহায্যে সরোজকে সে তুলিয়া আনিবে। তারপরে গৃহে আগুন ধরাইয়া দিয়া গুজব তুলিয়া দিবে সে আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে! জমীদারের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সরোজ অজ্ঞ রহিল—রতন এবিষয়ে কোনো কথা বলা অনাবশ্যক ভাবিল, কেননা সরোজের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া কোনো ফললাভ হইবে না!

দেখিতে দেখিতে অমাবস্যা আসিল। গভীর রাত্রে সরোজ নির্ভয়ে ঘুমাইতেছে; তাহার পার্শ্বে রতনের ঠাকুরমাতাও আছেন। রতন ও তাহার দলের লোকেরা ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। রতনের আদেশ আছে যখন সে সাঙ্কেতিক বাঁশী বাজাইবে, তখন তাহারা আক্রমণ করিবে, তাহার পূর্ব্বে নয়। দ্বিপ্রহর রজনীতে জমীদারের লোকেরা দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে একখানা পাল্কীও ঠিক সরোজের গৃহের

সামনে লাগিল। সরোজের গৃহে প্রবেশ করিবার মুখেই জমীদারের লোকেরা বাঁশীর শব্দে চমকিত হইল। নিমেষের মধ্যে তাহারা বুঝিল যে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া শত্রুপক্ষ তাহাদের ঘেরাও করিয়াছে—তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা মশাল জ্বালাইল। মশালের আলোক অন্ধকারকে চিরিয়া ফেলিল। তখন উভয় পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ বাধিল। জমীদারের পক্ষে খুব বেশী লোক ছিল না, কিছুক্ষণ পরে তাহারা হঠিতে লাগিল। হঠিবার মুখে তাহারা রতনকে জখম করিল, তাহার মাথায় চোট লাগাতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জমীদারের কতক লোক পলাইল, আর কতক লোক ধরা পড়িল।

সরোজ সমস্ত ব্যাপারখানা বুঝিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। রতন জয়ী হইয়াছে শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল—কিন্তু মূর্চ্ছিত রতনকে যখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাহার দাওয়ায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল, সে তখন কোনো মতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তি রতনের পাশে গিয়া বসিয়া সে চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। আঘাত সাজ্ঘাতিক নহে—মাথায় চোট লাগিয়াছে, সেইজন্য রতন অজ্ঞান হইয়াছে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে রতন প্রথম চক্ষুরুন্মিলন করিল। পার্শ্বে বসিয়া সরোজ তাহার সেবা করিতেছে এইমাত্র দেখিয়া সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। গ্রামের ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—নাড়ী টিপিলেন এবং বলিলেন মনে হচ্ছে ত কোনো ভয় নেই, তবে মাথায় চোট কিনা, দু চার দিন না গেলে বলা যায় না।

রতন খুব বলিষ্ঠ, অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিল।

তুমুল মোকদ্দমা বাধিল—হাইকোর্ট অবধি গড়াইল। জমীদারপক্ষের কাহারও দুই বৎসর, কাহারও বা ছয় বৎসর মিয়াদ হইল! জমীদার এযাত্রা অনেক কষ্টে ছাড়া পাইলেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল, তাই তিনি অব্যাহতি পাইলেন।

সরোজ রতনকে একদিন বলিল—"আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আর একটু হলে তুমি ত"—রতন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমাকে রক্ষা করতে পেরেছি এটা জান্‌তে পারলে, মরতে ত আমার কোন কষ্ট হ'ত না—জমীদার ছোঁড়াকে ভাল করে শিক্ষা দিতে পাল্লাম না, এই দুঃখ রয়ে গেল।" "যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছ রতন! মানষের চামড়া তার গায়ে যদি থাকে, তাহলে এমন কাজে আর কখনও এগোবে না। কিন্তু রতন একই গ্রামে তুমি ও জমীদার—কত তফাৎ!"

রতন কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে—সেখানে সব বন্দোবস্ত করিয়া

ফিরিয়া আসিয়া সরোজকে লইয়া যাইবে। কিছুদিনের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিতেই হইবে। সরোজের মত লইয়াই সে অবশ্য গিয়াছে। ভবিষ্যৎ সুখের চিত্রখানি আজ তার তরুণ হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং সরোজের সঙ্গে এই অভাবনীয় মিলন করুণ সঙ্গীতের ন্যায় সুখবেদনায় তাহার মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সত্য সত্যই একেবারে অভিভূত করিয়াছে।

সরোজ কয়দিন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় আছে। রতনের ঠাকুরমাতা আর রাত্রে তাহার কাছে আসেন না, তাঁহার শরীর ভাল নাই। সেদিনকার রাত্রের ঘটনার পর হইতে সরোজ তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে। অসুখটা যে একটা অছিলামাত্র, সেটা তার বুঝিতে বাকি রহিল না। রতনের ভয়ে আসল মনের কথাটা তিনি অবশ্য চাপা দিয়াছেন—সরোজের সংস্পর্শে আসিবার তাঁর ইচ্ছা নাই।

ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে সরোজকে লইয়া জোর আন্দোলন চলিতেছে। সেদিনকার ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রতনের এই বিধবার প্রতি পক্ষপাতিতা সম্বন্ধেও নানা কথা উঠিয়াছে। রতন থাকিতে সরোজ এ সমস্ত আন্দোলনের বিষয় অবগত হয় নাই, কিন্তু আজ তার অনুপস্থিতির ফাঁক পাইয়া, যাঁহারা কোন দিন সরোজের গৃহের ত্রিসীমানায় আসেন নাই, একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই শুভ পদার্পণ করিলেন—কেহ আভাষে ইঙ্গিতে মনের কথাটা বলিয়া গেলেন, কেহ বা স্পষ্ট কথায় ঝাল ঝাড়িয়া গেলেন। সমস্ত গ্রামের সহানুভূতি হইতে এরূপ নির্ম্মম ভাবে বঞ্চিত হইয়া বিপন্ন সরোজ দিশাহারা হইয়া পড়িল—সমস্ত সংসার তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য যেন শাসনদণ্ডখানি উদ্যত করিয়াছে—শুধু একমাত্র রতনের হৃদয়ের গভীর ভালবাসা অক্ষয় কবচের ন্যায় বুক পাতিয়া দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে! তাহার বাড়ী চড়াও হইয়া এই জঘন্য কলঙ্ককাহিনী মাতব্বর গৃহিণীদল বিনাইয়া বিনাইয়া বেশ করিয়া শুনাইয়া গেলেন, অথচ সে কোন কথার উত্তর দিল না, কিছুরই প্রতিবাদ করিল না, তাহার নিরপরাধিতা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না—শুধু তার আহত হৃদয়ে ক্রমাগত আঘাতের বেদনা সহ্য করিয়া সে কেমন ম্লান হইয়া পড়িল। একটা নিদারুণ নিরাশার হাহাকার তাহার চারি দিকে প্রেতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে ও রতন দুজনে মিলিয়া যে সুখের অট্টালিকা গড়িয়া তুলিবে ভাবিয়াছিল, একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সে যেন আজ ধূলিসাৎ হইতেছে! লজ্জায় অপমানে বেচারা মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া রহিল।

সরোজের নিন্দা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—লোকনিন্দার বাঁধ ভাঙ্গিয়া চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল! কাঠের পুতুলের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া সরোজ সব কথা শুনিল। এই অলীক অপবাদে সে মর্ম্মাহত হইল—সে আপনার নির্জ্জন গৃহে ছিন্ন মলিন শয্যার

উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে মাত্র। রতনও এ সময়ে কাছে নাই, সামান্য একটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার যে একজনও নাই!—সমস্ত সংসারের নিকট কাঙালিনীর ন্যায় দাঁড়াইলে আজ তাহাকে সকলে বিমুখ করিবে, অতি সামান্য অতি তুচ্ছ দান সে যে কাহারও নিকট ভিক্ষা করিলেও পাইবে না। এককাট্টা হইয়া সকলে এমন নিষ্ঠুর হইল কেন? অতীতের কথা মনে পড়িয়া আজ তার বেদনা-কাতর ক্ষুদ্র প্রাণখানি আকুল হইল—দরিদ্র পিতামাতার স্নেহের ধন আজ সংসারের বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, তাহার শেষ কোথায়? হাঁ, তাহার শেষ আছে—সংসারের বাহিরে যে অজ্ঞাত মহাদেশ আছে, সেখানে বোধ হয় হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা, জীবনের সমস্ত নৈরাশ্য নির্ব্বাণ লাভ করে। গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে মৃত্যু সরোজকে আহ্বান করিতেছে এবং তাহারই প্রলোভনের মন্ত্রশক্তিতে সরোজ আত্মহারা হইল। সহসা তাহার মনে হইল জগতের সমস্ত পথ রুদ্ধ, শুধু মৃত্যুর দ্বার খোলা। সরোজের মনে হইল মহাকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার মাতা যেন তাহাকে ডাকিতেছেন -"আয়, সরোজ আয়, আমার কাছে আয়, তোর দুঃখ আর আমি দেখ্‌তে পারিনি, আয় মা, মায়ের বুকে আয়, তোর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা আমার কাছে জুড়িয়ে যাবে।" চিন্তার স্রোতে পড়িয়া সরোজ হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

সরোজ কেমনতর হইয়া পড়িল। সহসা তাহার সমস্ত শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহার ভাবনার অন্ত নাই—জগৎ সংসার সত্যই তাহার নিকট ঘোর অন্ধকারময় ঠেকিতেছে, এ জমাট অন্ধকারে রতন যে দীপখানি জ্বালিয়া দিয়াছে, সেই আলোক কি জীবনের নূতন যাত্রাপথে যথেষ্ট হইবে—ঝড়ের মুখে তাহার কি নিভিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই? তাহার নারী মর্য্যাদার উপর যে আঘাত পড়িয়াছে রতনের ভালবাসায় কি তাহা শান্ত হইবে?—রমণীহৃদয়ের ব্যর্থ অভিমান অবহেলা অপমানের অসহ্য যন্ত্রণা এম্নি করে ভোগ করিবার জন্য সেত কাহারও নিকট দাসখত লিখিয়া দেয় নাই, তাই সরোজ আজ অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি চায়, অবিচারের হাত হইতে মুক্তি চায়, শাসনদণ্ডের শক্তিশেল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য উপেক্ষিত নারী-মহিমার সুদৃঢ় বর্ম্মে আপনাকে দুর্ভেদ্য রাখিতে চায়—জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এ সংগ্রাম চলে না, তাই মৃত্যুর রহস্যময় ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অজ্ঞাত উপায়ের অন্বেষণে সে ব্যগ্র ভাবে ছুটিল! চন্দ্রের কলঙ্ক সৌন্দর্য্যে ঢাকা পড়ে, কিন্তু রমণীর কলঙ্ক যে জীবন থাকিতে ঢাকা পড়ে না!

অনেকক্ষণ ধরিয়া সরোজ কি ভাবিল! তার পরে আপনার মনে একটু হাসিল—সে হাসি বড় নিদারুণ! বিরাট অন্ধকারে চপলার হাসির ন্যায় সে হাসি তীব্র, কিন্তু তাহারই ভিতরে লুক্কায়িত বজ্রের কঠিনতা!

অদূরে কৈবর্ত্তদের বাড়ীতে গিয়া তাদের মেয়েকে সরোজ কি বলিয়া আসিল। চলিয়া আসিবার সময়ে তাহার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া আসিল এবং বলিল, "দেখিস্ ভুলিসনি যেন, ঠিক যাস্।" একগাল হাসিয়া সে উত্তর দিল—"না দিদি, ভুলব কেনে, এই সন্দির পর তোমার ওখান ত যাব 'খনি।" সরোজ মৃদু হাসিয়া চলিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

পূর্ণতা।

কাহার অতুল রূপ হৃদয় মাঝারে জাগে,
কাহার চরণ মূলে পরাণ লুটাতে মাগে!
এ কোন্ এ কোন্ সুর, করে দেছে ভরপুর,
শূন্য মোর হৃদিতল ভরেছে রে অনুরাগে,
কাহার রূপের ভাতি আমার হৃদয়ে জাগে!

এ কার পরশ আজি পেয়েছি এমন ক'রে,
কার স্নেহ ভালবাসা দিয়েছে সকলি ভ'রে!
আজ আর নহে খালি, পূর্ণ মোর ভিক্ষা থালি,
কল্পনার সে স্বরগ নহে রে নহে রে দূরে,
কাহার পরশ মধু পেয়েছি হৃদয় পূরে!

বাহিরের চাইবার কিছুই নাই যে আজ,
অন্তরেতে এসেছেন নিজে যে বিশ্বরাজ!
আজ আর মনের কোণে, রহিব না সঙ্গোপনে,
মধুর মধুর তানে হৃদয়-বীণাটী বাজ!
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে এসেছেন মহারাজ!

শ্রীমতী কিরণময়ী সেন।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

ব্রহ্মবাদিনী মদালসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শক্রজিৎ।

পুরাকালে শক্রজিৎ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি যাগযজ্ঞে নিয়ত তৎপর থাকিতেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাবৎসল, দয়ালু এবং ন্যায়বান্ ছিলেন।

তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাবৃন্দের সুখ সমৃদ্ধির ইয়ত্তা ছিল না। রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি ও কুশল বিরাজ করিত। দৈত্যদানবগণ তপস্যানিরত মুনিগণের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী অরাতিগণের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিত। তিনি নৃপকুলশিরোমণি, প্রজাগণের প্রিয় এবং দেবতাগণেরও প্রিয় ছিলেন। তিনি একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজ পিতার ন্যায় বীর্য্যবান ও শত্রুদমনকারী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য, বিক্রমে বাসব-সদৃশ এবং রূপলাবণ্যে অশ্বিনীকুমারবৎ প্রতীয়মান হইতেন। তিনি কুলপাবন, অশেষ-গুণসম্পন্ন, বংশের উজ্জ্বল দীপ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বয়স্যগণ—যাঁহারা তাঁহাকে অনুক্ষণ বেষ্টন করিয়া থাকিতেন—বিদ্যাবুদ্ধি, বলবিক্রম, রূপগুণ, এবং কুলে শীলে কোনও ক্রমে তাঁহা অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে যে, কমলার সন্তানগণ কতকগুলি অর্থলোলুপ চাটুকার দ্বারা অনুক্ষণ বেষ্টিত হইয়া থাকেন; এবং বৃথা আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করেন। ঋতধ্বজ তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি চাটুকারিতা ভালবাসিতেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট চাটুকারগণের স্থান ছিল না। বয়স্যগণ তাঁহার হিতৈষী ও প্রেমাস্পদ ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই নৃপকুমার। ঋতধ্বজের গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহার বয়স্য হইয়াছিলেন। ঋতধ্বজ তাঁহাদের সহিত তাঁহার পদোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিতেন। কখন শস্ত্রবিদ্যা অনুশীলন, কখন ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া লক্ষ্যভেদ, কখন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত মল্লযুদ্ধ, কখন হস্তী অশ্ব রথাদি চালনা, কখন বা শাস্ত্রালাপ, কখন ক্রীড়াকৌতুক গীত বাদ্যাদি শ্রবণে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি এমনই অমায়িক, উদারপ্রকৃতি এবং স্নেহপ্রবণ ছিলেন যে, তাঁহার বয়স্যগণ ব্যতীত আরও অনেক সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যতনয় তাঁহার সহিত ক্রীড়াদি করিতে সমাগত হইতেন।

কিয়দ্দিন পরে নাগলোক হইতে নাগরাজ অশ্বতরের দুই পুত্র মর্ত্ত্যলোকে আগমন

করিলেন। কুমারদ্বয় তরুণবয়স্ক এবং প্রিয়দর্শন। তাঁহারা বিপ্রের বেশ ধারণ করিয়া, ঋতধ্বজ ও তাঁহার বয়স্যগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদিত হইয়া, সমস্ত দিন তাঁহাদের সহিত যাপন করিতেন; এবং নিশা সমাগমে পাতালে চলিয়া যাইতেন। তাঁহারা ঋতধ্বজের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ এইরূপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মহীপালনন্দনও উভয়ের বিবিধ আমোদ প্রমোদ এবং হাস্যরসোদ্দীপক আলাপাদিতে অত্যন্ত সুখী হইতেন। এমন কি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কিছু করিতেন না। নাগরাজ-তনয়যুগলও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার বিচ্ছেদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে পাতালে নিশাযাপন করিতে হইত।

এইরূপে কিছুকাল গত হইল। একদিন নাগরাজ অশ্বতর পুত্রদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়দর্শন পুত্রগণ, মর্ত্ত্যলোকের প্রতি তোমাদের এতদূর আকর্ষণের কারণ কি? অনেকদিন হইতে তোমাদিগকে দিবাভাগে এখানে আর দেখিতে পাই না। নিশার সমাগম হইলেই দেখিতে পাই। ইহার তাৎপর্য্য কি?

মহাভাগ উরগাধিপতির সুতদ্বয় পিতৃচরণ বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে তাত, মর্ত্ত্যধামে শত্রুজিৎ নামক রাজার এক পুত্র আছেন। তাঁহার নাম ঋতধ্বজ। তিনি রূপবান্, সরলস্বভাব, শূর, মানী, প্রিয়ভাষী, সংযতবাক্, বাগ্মী, বিদ্বান্, মৈত্রীগুণ-সম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণের আকরস্বরূপ। তিনি গুণগ্রাহী, মাননীয় ব্যক্তিগণকে মান্য করেন। তিনি ধীমান, লজ্জাশীল এবং বিনয়ভূষণে ভূষিত। তাঁহার স্নেহোপচার এবং প্রীতি সম্ভোগ করিয়া আমাদের মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট হয়। সে প্রীতি নাগলোকে কি ভূলোকে কোথাও পাই না। পিতঃ, তাঁহার বিচ্ছেদে পাতালের শীতলনিশা সন্তাপজনক বোধ হয় এবং তাঁহার সহবাসে রবিকরতাপযুক্ত দিবাও সুখের কারণ হয়।

নাগরাজ বলিলেন, বৎস, সেই পুণ্যবান্ রাজনন্দন ধন্য! কারণ, তোমাদের মত গুণশালী ব্যক্তিগণও পরোক্ষে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। অনেক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত শীলভ্রষ্ট হয়, আবার অনেক মূর্খও সুশীল হয়; কিন্তু বৎস, আমার মনে হয়, সেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং শীলযুক্ত নৃপতনয় ধন্য! মিত্র যাঁহার মিত্রতার যশোগান করে, শত্রুকর্ত্তৃক যাঁহার পরাক্রমের কীর্ত্তি প্রকাশিত হয়, অনেক সন্তান সত্বেও সেই কুলপাবন পুত্রের দ্বারাই পিতা পুত্রবান্ বলিয়া পরিচিত হন। এমন হিতৈষী সুহৃদের সন্তোষ-বিধানার্থ, হে বৎস, তোমাদিগের দ্বারা তাঁহার কোন অভিলষিত বিষয় সাধিত হইয়াছে কি? দেখ, সেই ব্যক্তিই ধন্য, তাহার জীবনই জীবন, তাহার জন্মই সুজন্ম, যাহার নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হয় না, এবং মিত্রের প্রয়োজনাদিও অসাধিত থাকে না। আমার প্রাসাদে রত্ন, কাঞ্চন, যান, আসন প্রভৃতি যত ঐশ্বর্য্য আছে, তোমরা তাঁহার প্রীতির জন্য নির্ভয়ে সমুদয় তাঁহাকে প্রদান করিতে পার। বৎস, যে ব্যক্তি হিতৈষী

বন্ধুর প্রীতির প্রতিদান না করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার জীবনে ধিক্! যে পুরুষ-রূপ বারিদ মিত্রগণের উপর উপকাররূপ বারিবর্ষণ করে, দেবগণ সতত তাহার কল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছুক।

পুত্রদ্বয় বলিলেন, পিতঃ, যাচকগণ যাঁহার নিকট অনুক্ষণ ঈপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া সম্মানিত হইতেছে, সেই কৃতকৃত্য নৃপনন্দনের উপকার করিতে কে সমর্থ? তাঁহার প্রাসাদে যে সকল রত্ন, বাহন, যান, আসন, বসন ও ভূষণ আছে, আমাদিগের পাতালে সে সমুদায় কোথায়? তাঁহার নিকট যে প্রকার বিজ্ঞান আছে, তাহাও অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। হে তাত, তিনি প্রাজ্ঞগণের সর্ব্বসংশয়ভঞ্জনকারী। যাহা হউক, তাঁহার একটী মাত্র কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু মনে হয়, তাহা সাধন করা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভিন্ন অন্যের অসাধ্য।

নাগরাজ বলিলেন, বৎস, অসাধ্য হইলেও আমি তাহা একবার শুনিতে ইচ্ছা করি। যাহাদিগের জ্ঞান আছে, অধ্যবসায় আছে, তাহাদের নিকট অসাধ্য কি? যাহারা উদ্যোগী, তাহারা দেবত্ব ইন্দ্রত্ব, এমন কি তদপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয়। যাহারা মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে সংযত করিয়া উদ্যোগী হয়, ত্রিভুবনে তাহাদের অজ্ঞাত অপ্রাপ্য এবং অগম্য কিছুই থাকে না। দেখ পিপীলিকা উদ্যোগী বলিয়া চলিতে চলিতে সহস্র যোজন পথ যাইতে পারে, কিন্তু বিনতানন্দন গরুড় উদ্যোগবিহীন হইলে, একপদও যাইতে সমর্থ হন না। কারণ, অনুদ্যোগী মনুষ্যের পক্ষে প্রাপ্য অপ্রাপ্য সবই সমান। উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব পৃথিবীতে থাকিয়া যে দুর্লভ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুবলোক কোথায়, আর এই পৃথিবী কোথায়! অতএব বৎসগণ, সেই সাধু মহাভাগ ভূপালসুত যাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন এবং তোমরাও বন্ধুতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহা বল।

পুত্রদ্বয় বলিলেন, পিতঃ, সেই সদাচারসম্পন্ন রাজকুমার—তাঁহার কৌমারাবস্থায় যে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ করুন :—

"একদিন মহারাজ শত্রুজিৎ অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধীমান দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব একটী সুন্দর অশ্বের রশ্মি ধারণ করিয়া রাজসমীপে সমাগত হইলেন। নৃপমণি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহাকে একটী উচ্চ আসনে বসাইয়া তাঁহার তপস্যার কুশল ও তাঁহার তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

"গালবমুনি আসনপরিগ্রহ করিয়া বিষাদিতচিত্তে বলিলেন, রাজন্, তপস্যার কুশল আর কি বলিব? তপোবনের কুশলই বা কি বর্ণন করিব? এখন তপোবিঘ্ন পদে পদে। তপোবনের অবস্থাও তদ্রূপ। কোনও এক পাপাচারী দৈত্য আমার আশ্রমে

আসিয়া সমস্ত ধ্বংস করিতেছে। সে দিবা রজনী সিংহ, হস্তী ও অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় বনচারী জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া, এমনই উপদ্রব করে যে, আমি সন্ধ্যাধিধ্যানযুক্ত অথবা মৌনব্রতধারী হইয়া থাকিলেও আমার মন বিচলিত হয়। মহারাজ, আপনি রাজদণ্ডধর! সেই দানবকে কোপানলে বিদগ্ধ করিতে আপনিই সমর্থ। আমরা এবিষয়ে অক্ষম। কারণ, ঈদৃশ কার্য্যে আমার বহুদিনের দুঃখে অর্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, নরনাথ, আমি একদিন সেই দুর্দ্ধর্ষ দানবকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নিরতিশয় কাতরভাবে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে এই অশ্বটী পতিত হইল এবং দৈববাণী হইল, 'হে দ্বিজবর, তোমাকে যে বেগবান্ তুরঙ্গ প্রদত্ত হইল, ইহা তপনের ন্যায় অশ্রান্তভাবে সমস্ত পৃথিবীবলয় গমন করিতে সমর্থ। পাতাল, অম্বর, সলিল বা পর্ব্বতে ইহার গতি প্রতিহত হইবে না। সমস্ত দিকে ইহা গমন করিতে পারিবে এবং সমস্ত ভূ-বলয়ে অবিশ্রান্ত গমন করিতে সমর্থ বলিয়া ইহা 'কুবলয়' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। হে দ্বিজসত্তম, শত্রুজিৎনামক রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বরত্নে আরোহণ করিয়া, যে পাপিষ্ঠ দানব তোমাকে অহোরাত্র ক্লেশপ্রদান করিতেছে, তাহাকে সংহার করিবে এবং এই অশ্বদ্বারা সে খ্যাতিলাভ করিবে।' হে রাজন্, আমি সেই জন্যই এই তুরঙ্গকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদের তপস্যার ফলভাগী। অতএব আপনি সেই তপোবিঘ্নকারীকে দমন করুন এবং এই অশ্বরত্নকে গ্রহণ করিয়া, আপনার কৃতী পুত্রকে আদেশ করুন যেন ধর্ম্মবিলোপ না হয়।

"মহারাজ শত্রুজিৎ গালবমুনির এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া ভাবান্তরিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে একজন দৈত্য আসিয়া মুনিবরের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। ইহার আশু প্রতীকারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং মঙ্গলাচারাদি সমাপন পূর্ব্বক ঋতধ্বজকে সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া মুনিবর গালবের সহিত প্রেরণ করিলেন। মুনি যুবরাজের সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।"

(ক্রমশঃ)

কমলকুটীর। শ্রীগণেশপ্রসাদ।

যুদ্ধের গল্প।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কামানের মুখ উঠাইয়া বা নামাইয়া গোলা দূরে বা নিকটে ফেলা যায়। এই কৌশলে শত্রু কামানের পাল্লার (range) মধ্যে যেখানেই

থাকুক না কেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ফেলা যায়। সাধারণতঃ স্থলকামানের পাল্লা ৬।৭ মাইল হয়, অর্থাৎ ৬।৭ মাইল দূর হইতে গোলা শত্রুর উপর ফেলা যায়। কিন্তু এখন ক্রমেই পাল্লা বাড়ান হইতেছে, কারণ যে পক্ষ যতদূর হইতে গোলা মারিতে পারিবে, সেই পক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা তত বেশী। আজ কাল কামানের পাল্লা বাড়াইয়া প্রায় ১০।১২ মাইল করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই পাল্লার কামান ব্যবহৃত হইলেও কোন কোন জায়গায় আরও অধিক শক্তিশালী কামান ব্যবহার করা হইয়াছে। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে জার্ম্মাণগণ প্রায় ২০।২২ মাইল দূর হইতে অতি বৃহৎ গোলা ফেলিয়াছে। এতদূর হইতে গোলা ফেলা বড় সহজ কথা নয় এবং ইহাতে যুদ্ধবিশারদ সকলে স্তম্ভিত হইয়াছেন। কিন্তু এ প্রকার কামান সংখ্যায় অতি কম এবং অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, কারণ এত অধিক বারুদ ব্যবহার করিতে হয় যে শীঘ্রই কামান অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এই কারণে এ ভীমকায় কামানকে ভয় করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। যদিও এপর্য্যন্ত ২০।২২ মাইল অবধি গোলা গিয়াছে, ইহাতেও সকলে সন্তুষ্ট নয়, এবং পাল্লা আরও বাড়াইবার চেষ্টা সকলে করিতেছেন। শুনা যায় যে, ৩০।৩২ মাইল দূরে গোলা ফেলিবার মতন কামান শীঘ্রই এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। যে পক্ষ এই সাঙ্ঘাতিক যন্ত্র দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিবে, সেই পক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা যে অধিক হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এপর্য্যন্ত আমরা দূরের পাল্লা দেখিলাম। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, যত দূরে গোলা ফেলিতে ইচ্ছা করা যায়, গোলাকে তত উপরের দিকে ছাড়িতে হয়। কামানের মুখ হইতে গোলা যখন ভীমবেগে যাত্রা আরম্ভ করে, তখন কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহা ক্রমাগত উপরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমে এমন এক স্থানে আসে, যেখানে আর উপরে না উঠিয়া নীচে লক্ষ্যের দিকে নামিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্য যত দূরে হইবে, গোলার গতির সর্ব্বোচ্চস্থান তত উচ্চে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১০ মাইল পাল্লার গোলা আকাশে এত উচ্চে উঠে যে, তাহা স্বচ্ছন্দে হিমালয় শৃঙ্গ পার হইয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ সে গোলা মাটি হইতে প্রায় ৫॥০।৬ মাইল উচ্চে উঠে। কি ভয়ানক বেগে গোলা চলে, তাহা ইহাতেই কিছু বুঝা যাইতে পারে।

গোলা বলিতে আমরা গোল একটী জিনিষ বুঝি, কিন্তু পূর্ব্বে কামানের গোলা যদিও গোল ছিল, আজকাল তাহা নাই। গোলা যখন ক্রমে বড় করা দরকার হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহার আকার বড় করিলে কামানের আকারও অত্যন্ত বড় করিতে হয় এবং তাহা হইলে কামান লইয়া চলাচল বড় হাঙ্গামের ব্যাপার হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন গোল আকার যত বড় করা যাইবে, তত অধিক বায়ু ঠেলিয়া যাইতে হইবে। এই দুই কারণে গোলার গোল আকার পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে লম্বা করা হইল, এবং যাহাতে বায়ুর প্রতিরোধ কম লাগে তাহার জন্য সম্মুখের দিক ছুঁচলো করিয়া

দেওয়া হইল। এই উপায়ে দেখা গেল যে কামানের আকার বড় না করিয়াও অধিক শক্তিশালী গোলা ব্যবহার করা সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে এই আকৃতির গোলা বড় হইতে হইতে এখন প্রায় এক হাত চওড়া ও দুই কিম্বা আড়াই হাত লম্বা একটী ভয়ানক জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে যে, গোলা আরও বড় করিয়া শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করিবার কাজ যাহাতে সহজ হয়। এই গোলা এত ভারী যে কামানে বসাইবার সময় কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে যথাস্থানে বসাইতে হয়। প্রতি কামানের সঙ্গে তাহার উপযোগী গোলার ভাণ্ডার গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে হয়, এবং যখনই প্রয়োজন হয় কামান যথাস্থানে রাখিয়া ও লক্ষ্য স্থির করিয়া গোলা বসাইয়া কল টিপিতে হয়।

আজকাল যুদ্ধে দুই প্রকার গোলা ব্যবহার করা হয়, শ্র্যাপনেল (shrapnel) ও শেল (shell)। ইহারা আকৃতিতে একই প্রকার, কিন্তু কার্য্যে ভিন্ন। ইহাদের গঠন-প্রণালী জানিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই দুই প্রকার গোলাই আসলে মস্ত লম্বা ছুঁচলো লোহার কৌটার মত ; লোহায় প্রস্তুত এবং ভিতরে খালি। শ্র্যাপনেলের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ ও ছোট ছোট অনেক গুলি খুব ঠাসিয়া ভরিয়া দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে ছোট ছোট অন্যান্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র কিম্বা কাচের টুকরাও দেওয়া যাইতে পারে। শ্র্যাপনেল যখন কামান হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্যে যাইয়া পড়ে, তখন ইহা ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং ইহার ভিতরের গুলি ও অন্যান্য অস্ত্র সকল সবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে এবং নিকটস্থ সকলকে ক্ষতবিক্ষত করে, কিম্বা সকলের প্রাণনাশ করে। ভিতরের গুলি বা অস্ত্র কিছু যাঁহার গায়ে না লাগিল, তাহার বড় বেশী আশঙ্কা নাই ; এবং যদি কোনও জিনিসের আড়ালে লুকান যায়, তাহা হইলেও শ্র্যাপনেলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শেল শ্র্যাপনেল অপেক্ষা অনেক গুণ সাঙ্ঘাতিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাও লোহার একটী প্রকাণ্ড কৌটা, কিন্তু ইহার ভিতরে গুলি না ভরিয়া ভয়ানক শক্তিশালী বারুদ খুব ঠাসিয়া দেওয়া হয়। কামান হইতে বাহির হইয়া শেল যেই লক্ষ্যে উপস্থিত হয়, অমনিই ভিতরের বারুদের রাশিতে আগুন লাগিয়া ইহা ভীষণ শক্তিতে ফাটিয়া যায়। এই ফাটিয়া যাওয়ার প্রকোপ এত বেশী যে নিকটে যাহা কিছু থাকে, মানুষ, জন্তু, বাড়ী ঘর সব ধ্বংস হইয়া যায়। কোনও বস্তু আড়াল করিয়া লুকাইলেও ইহাতে রক্ষা নাই, ইহার প্রকোপে পড়িলে ধ্বংস হইতেই হইবে। এই কারণে এখন শ্র্যাপনেলের পরিবর্ত্তে শেল খুব ব্যবহার করা হইতেছে এবং যাহাতে আরও ভয়ানক শক্তিশালী বারুদ প্রস্তুত করা যায় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। এই শেল গুলিকে High explosive শেল বলা হয়। দেখা গিয়াছে যে, যেখানে ইহা ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানে অন্য কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই ; ইহা বিনা সাহায্যেই শত্রুনাশ করিয়াছে। শুনা

যায় যে, একবার এক স্থানে চল্লিশটী ঘোড়া রাখা হইয়াছিল ; এমন সময়ে জার্ম্মাণদের একটী শেল ঐ স্থানে আসিয়া ফাটিয়া যায়। তাহার ফলে ঐ চল্লিশটী ঘোড়ার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই! জার্ম্মাণগণ নানা উপায়ে শেলকে আরও অধিক ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা কথনও কথনও ইহার ভিতরে বারুদের সঙ্গে নিঃশ্বাস-রোধকারী (Asphyxiating) গ্যাস ভরিয়া দেয়। এই শেল যখন শত্রুর মধ্যে আসিয়া ফাটিয়া যায়, তখন ধ্বংস যাহা হইবার তাহা তো হয়ই, এ ভিন্ন ঐ বিষাক্ত গ্যাসে অবশিষ্ট সৈন্যদিগের প্রাণ যায়। তখন হয় অন্যান্য সৈন্যদের ঐ স্থান ছাড়িয়া পালাইতে হয়, কিম্বা অন্য কোনও স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতে হয়। আবার শুনা যায় যে, শেলের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস ভরিয়া জার্ম্মাণগণ একদল রুষসৈন্যকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এ ঘটনা সত্য কি না তাহা সঠিক বলা যায় না। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে যে, শ্র্যাপনেল অপেক্ষা শেল অনেক বেশী ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালী।

লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গোলা যাহাতে যথাসময়ে ফাটে, তাহার দুই প্রকার কৌশল আছে। গোলা যেখানে সেখানে ফাটিলে চলে না; যদি আকাশে থাকিতে থাকিতেই ফাটিয়া যায়, তবে সে গোলায় কোনও কাজ হইবে না; কিম্বা যদি মাটীতে পড়িয়াও ফাটিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলেও কোনও ফল হইবে না, কারণ ততক্ষণ সকলে সরিয়া যাইতে পারে; যদি মাটীর ভিতরে অনেকখানি চলিয়া গিয়া ফাটে তাহাতেও লাভ নাই, কারণ বেশী মাটী ভেদ করিয়া গোলার প্রকোপ উপরে আসিতে পারে না। এইজন্য এমন কৌশল করিতে হয় যে গোলা লক্ষ্যে পৌঁছিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া যাইবে, এবং ইহাতেই গোলন্দাজের সুক্ষ্মবিচারের বাহাদুরী। গোলা ফাটাইবার দুই প্রকার কৌশল আছে, একটী পলিতা ও দ্বিতীয় ধাক্কা। প্রথম প্রকার কৌশলে প্রত্যেক গোলার সঙ্গে একটী করিয়া পলিতা থাকে, ইহা ভিতরের বারুদের সহিত যুক্ত থাকে। এই পলিতায় আগুন ধরাইয়া দিলে তাহা আস্তে আস্তে জ্বলে এবং কতক্ষণে কতটা জ্বলে তাহারও একটা হিসাব আছে। গোলন্দাজকে যখন গোলা ছাড়িবার হুকুম দেওয়া হয়, তখন তাহাকে কতদূরে গোলা ফেলিতে হইবে তাহাও বলা হয়। সেই অনুসারে কামানের মুখ উঁচু করিয়া গোলন্দাজ হিসাব করিয়া লয় যে কতক্ষণে গোলা তাহার লক্ষ্যে গিয়া পঁহুছিবে, এবং ততক্ষণে কতখানি পলিতা জ্বলিবে। এই আন্দাজ করিয়া ঐসময়ে যতটা পলিতা জ্বলিবে, ততটা গোলার সহিত রাখিয়া বাকি পলিতাটুকু কাটিয়া লয় এবং তখনই পলিতায় আগুন দিয়া গোলা ছাড়ে। গোলা যেমন তাহার লক্ষ্যের দিকে যাইতে থাকে, পলিতাও ক্রমে ক্রমে পুড়িতে থাকে; এবং যদি হিসাব ঠিক হইয়া থাকে, তবে গোলা যেই লক্ষ্যে পৌঁছিবে, পলিতাও পুড়িয়া পুড়িয়া ঠিক ঐসময়ে বারুদে আগুন লাগাইয়া দিবে ও তৎক্ষণাৎ গোলা ফাটিয়া যাইবে। যদি হিসাবে ভুল হইয়া থাকে, তবে গোলা হয় আকাশেই ফাটিয়া যাইবে, কিম্বা মাটীতে পড়িবার খানিকক্ষণ পরে ফাটিবে। ইহাতে যে সন্তোষজনক ফল হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং এই বিষয়েই গোলন্দাজের হিসাবের বাহাদুরী।

দ্বিতীয় কৌশলে এ হিসাবের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে পলিতা থাকে না, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে গোলার সম্মুখে ছুঁচলো জায়গার ভিতর দিকে একটী কল থাকে। এই কলে এমন ব্যবস্থা আছে যে বাহির হইতে সামান্য ধাক্কা লাগিলেই একটী লোহার উপরে আর একটী লোহা যাইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া

বারুদের উপর পড়ে এবং গোলা ফাটিয়া যায়। যাহাতে বাহির হইতে ধাক্কা লাগিতে পারে তাহার জন্য গোলার সম্মুখভাগে একটী প্লেক বাহির করা থাকে, এবং এই প্লেকে ধাক্কা লাগিলেই ভিতরের ঐ কলে যাইয়া ধাক্কা লাগে এবং উল্লিখিত ভাবে গোলা ফাটিয়া যায়। ইহাতে সময়ের কোনও হিসাব করিতে হয় না, কেবল লক্ষ্য স্থির হইলেই হইল। লক্ষ্যে যাইয়া গোলার সম্মুখভাগ লাগিলেই গোলা ফাটিবে। কিন্তু এক এক সময়ে দেখা গিয়াছে যে প্লেকে যথেষ্ট ধাক্কা না লাগার দরুন গোলা ফাটে নাই, বিশেষতঃ গোলা যদি জলে কিম্বা কাদার মধ্যে পড়ে তাহা হইলে না ফাটিবারই সম্ভাবনা ; কিম্বা যদি আকাশপথে কোনও কারণে ভিতরের কল খারাপ হইয়া যায় এবং তাহার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না হয়, তাহা হইলেও গোলা ফাটিবে না।

গোলন্দাজকে সকল সময়েই কামানের সঙ্গে থাকিতে হয় ; শত্রুপক্ষ অন্যপক্ষের কামান লক্ষ্য করিয়াই অনেক সময়ে গোলা ছাড়ে সুতরাং গোলন্দাজকে সব সময়েই বিপদের মধ্যে থাকিতে হয়। সব গোলাই যে গায়ে আসিয়া লাগে তাহা নয় কিন্তু চারিদিকে গোলাগুলি পড়িতেছে ও ফাটিতেছে. ইহার মধ্যে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। যাহাতে এই বিপদ কিছু কম হইতে পারে তাহার জন্য অনেক সময়ে ইস্পাতের পাত দিয়া কামানের পিছনদিকে একটী ছাদ বা ঘর করিয়া দেওয়া হয়, ইহাকে steel cupola বলে। গোলন্দাজগণ ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া গোলা চালাইলে তাহাদের বিপদ কিছু কম হয়, যদিও একেবারে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কামান ছাড়িবার সময়ে গোলা বাহির হইয়া যাইবামাত্র কামান ধাক্কা খাইয়া পিছন দিকে সরিয়া আসে। বন্দুকেও এরকম পিছন দিকে ধাক্কা আছে, কিন্তু সে ধাক্কা সহজে সামলান যায় ; কামানের যে ধাক্কা তাহার বেগ খুব বেশী, সুতরাং এই ধাক্কা একটী কৌশল দিয়া আটকান হয়। এই কৌশলে বড় বড় কামানের ধাক্কার জোর অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। আবার যখন গোলা হুঙ্কার করিয়া কামান হইতে বাহির হয়, তখন আগুনের একটা হল্কাও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হয়। এই হল্কা দেখিয়া শত্রুপক্ষ অন্য পক্ষের কামান কোথায় আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারে ও সেই লক্ষ্যে কামান ছুড়িতে পারে। যাহাতে এই হল্কা বুঝা না যায় তাহার জন্য কোনও কোনও সময়ে কামানের সম্মুখে কিছু দূরে মাটি বা অন্য কোনও জিনিষের স্তূপ করিয়া একটা আড়াল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কোথা হইতে কামান ছোড়া হইতেছে তাহা শত্রুপক্ষ সহজে বুঝিতে পারে না। আবার কামান ছাড়িবার সময়ে ভয়ানক গর্জ্জন হয় এবং তাহাতে অনেকে কালা হইয়া যায়। এইজন্য গোলন্দাজেরা কাণ ঢাকিবার জন্য একরকম পটি ব্যবহার করে, ইহাতে কাণের কোনও ক্ষতি হয় না।

কামান অনেক রকমের হইলেও সবগুলি মোটের উপর একই প্রকারের। কিন্তু জার্ম্মানগণ এক অদ্ভুতপ্রকারের কামান প্রস্তুত করিয়াছে। কেহ কেহ ছ-নলী রিভল্‌ভার দেখিয়া থাকিবেন। ইহাতে একসঙ্গে ছয়টী গুলি রাখা যায় এবং কল ঘুরাইয়া শীঘ্র শীঘ্র সবগুলি ছাড়া যায়। জার্ম্মানগণ ইহার অনুকরণে ছ-নলী কামান প্রস্তুত করিয়াছে। ইহারও কল ঘুরাইয়া খুব শীঘ্র শীঘ্র গোলাবর্ষণ করা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই রকম একটী ছ-নলী কামান ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে এবং অনেকে ইহার ছবি ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় দেখিয়া থাকিবেন। ইহা যে কিরূপ ভয়ানক অস্ত্র তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কামানের কথা এখন এখানে শেষ করা যাক্‌।

(ক্রমশঃ)

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ] ফাল্গুন, ১৩২২। [১১শ সংখ্যা।

জয়-গান।

আমার দুয়ারে তুমি এলে শেষে
আরোহি আলোক-রথে,
ঘর হতে মোরে আনিলে বাহিরে
এ কেমন রাজপথে!
অবাক হইয়ে মূক বিস্ময়ে,
তব মুখপানে চাহিনু সভয়ে,
নীরব দাঁড়ায়ে নিমেষ হাসিয়ে
কি ভাবিলে মনে মনে,
হে রাজার রাজা দেবতা আমার
কেন দেখা তব সনে!

তব দরবারে হে অনাদি কবি,
আমি কি গাহিব গান!
কথার সুরেতে ব্যথা ফুটে উঠে
সব হয়ে যাবে ম্লান!
ভগ্নকণ্ঠ বুকে নাহি বল,
আমাকে কি কাজ এ কেমন ছল,

গুণী জন হায় হাসিবে হেলায়
চলে যাবে অনাদরে,
হৃদয়ের গান, জীবনের গান
গাহিব কেমন করে !

ভোরের গোলাপ রঙেতে রঙীন
গেয়েছিল সুখে ভাসি,
ঘোমটা খুলিয়া চেয়েছিল উষা
মুখে ছিল রাঙা হাসি !
নলিনী তখনো কহে নাই কথা,
শিশিরে লুকানো ছিল কার ব্যথা,
হেসে উঠেছিল তরু তৃণ লতা,
গানে গানে ভরা মন,
ভালবাসে যারে, তার হাত ধরে
গাহিয়াছে সর্ব্ব জন !

তার পরে মেঘ যখন উঠেছে
আঁধারে পড়েছে ঢাকা,
সাজে নাই গেহ, হাসে নাই কেহ,
আসে নাই পথ ফাঁকা !
আজ কেহ নাই তুমি আর আমি,
সেই ভালো বেশ, হে জীবনস্বামী !
নহে হরষিত পুলকিত চিত
বিকশিত উপবন,
দেবতা আমার, দেবতা আমার
বয়ে গেছে শুভখণ !

মরণের দূত মাঝে মাঝে আসে
ভেসে যায় খসে যায়,
হারানো রতন মনের মতন
প্রাণ ফিরে নাহি পায় ?
গোপন বেদনা দুই হাতে ঢাকি,
আকুল বিরহে কেঁদে লাল আঁখি,

জীবন মরণ একই মতন
প্রেমেতে নাহিক ভয়,
বুঝালে এবার নহে হারাবার
গাহিব তোমার জয়।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

লংফিল্ডে আমরা সকলেই ভোরে উঠিতে খুব ভাল বাসিতাম। সকাল বেলা সূর্য্য উদয় দেখিতে কি সুন্দর লাগিত। ছোট ছেলে মেয়েগুলি নূতন প্রাণ পাইয়া, নূতন ভাবে তাহাদের পায়রা, মুরগী ইত্যাদি লইয়া খেলা আরম্ভ করিত ও আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া বাবাকে দেখাইবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইত। জন ও উরসুল্লা কখনও তাহাদের আদরের ডাক বিরক্ত হইয়া অগ্রাহ্য করিতেন না, বরং তাহাদের সকল কাজেই উৎসাহ দিতেন।

জন কিন্তু সব শিশুদের মধ্যে মিউরিয়েলকে বেশী ভালবাসিতেন। ছেলেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া সকলের আগে বাপের সাড়া পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত, শুধু মিউরিয়েল ছায়ার মত বাপের পাশে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, একটীও কথা বলিত না। জন কাজ হইতে বাড়ী ফিরিলেই প্রথমে মিউরিয়েলকে খুঁজিতেন।

আজ সকালে মিউরিয়েলের ভয়ানক আনন্দ। বাবা সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকিবেন। বিকালে বাড়ীতে ভোজ দেওয়া হইবে।

উরসুল্লা চাকরদের সাহায্যে সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ বাহির করিলেন, জনও ব্যস্ত হইয়া যতটুকু সাহায্য করিতে পারেন করিলেন, পরে উরসুল্লার অনুরোধে ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করিয়া জন যুদ্ধের বিবরণ পড়িতে লাগিলেন।

মিউরিয়েল মন দিয়া শুনিতেছে, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাবা, যুদ্ধ লোকে করে কেন? আহা কত কষ্ট! এ কি থামবে না?"

ছেলেদের কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটা খুব ভাল লাগিল, তাহারা কেহ ফ্রেঞ্চ সাজিল, কেহ ইংরাজ সাজিল ও 'দুর্গজয়' খেলা আরম্ভ করিল।

জন। "তোমাদের আমি কখনও যুদ্ধ করিতে দিব না।"

মিউরিয়েল। "বাবা, 'শান্তি হওয়া' কাকে বলে?"

জন। "যুদ্ধের শান্তি হলে, বিদেশ হতে সকলের বাবা, দাদারা, সব বাড়ী ফেরেন, কাজ কর্ম্ম নিয়ম করিয়া আরম্ভ হয়, গরীবদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা হয়, কারণ জিনিষপত্র সস্তা হয়, বিষাদের ছায়া সরিয়া গিয়া পৃথিবী আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়।"

মিউরিয়েল বলিল, "বাবা, আমার যে সে দিন দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, আমি কি তত দিন বেঁচে থাকবো না?"

জন ও উরসুল্লা সব ছেলে মেয়ে বড় হইলে কি হইবে আলোচনা করিতেন, কিন্তু মিউরিয়েলের কথা কখন কেহ বলিতেন না। মিউরিয়েল যে কখন বড় হইবে এ ধারণা তাঁহাদের মনে আসিত না।

জন। "মিউরিয়েল—মা আমার, তুমি কি বড় হবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ? তুমি চিরকাল বাবার ছোট্ট মেয়ে হয়ে থাক্‌বে, তা কি চাও না?"

মিউরিয়েল। "চিরকাল ছোট্ট থাকতেই চাই।"

জন তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার অন্ধ চক্ষু দুটীর উপর চুম্বন করিলেন। তারপর সকলকে লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন।

বিকালবেলা নিমন্ত্রিত লোকে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে সকলে বাগানে ঘুরিতে লাগিলেন। উরসুল্লা সকলের সঙ্গে আলাপ করিলেন, দু' একজন ছাড়া সকলেই 'কর্ত্রী বড় ভাল' বলিয়া বেশ নির্ভয়ে কথাবার্ত্তা বলিল।

জন ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "উরসুল্লা, তুমি যে দেখছি নিজের ব্যবহারে সকলকে মোহিত করে দিয়েছ, তোমার ভিতর কি আছে বল তো?"

উরসুল্লা। "আমি সকলকেই খুব আপন বলে ভাবি, এবং গরীব হইলেও তাহাদের সকল চিন্তা ও কথার সঙ্গে সহানুভূতি রাখি, তাদের বুঝতে দি যে আমি সত্য সত্যই তাহাদের বন্ধু।" সত্যি, উরসুল্লার জীবনের ব্রতই যেন ছিল, কথা না বলিয়া শুধু কাজ করিয়া জগতের সেবা করা।

সন্ধ্যার সময় নিজের নিজের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যখন গাছতলায় সকলে একত্রিত হইলাম, তখন পর্য্যন্ত ছেলেদের খেলা ও হাসি বন্ধ হয় নাই।

উরসুল্লা। "আজ সকলেই খুব সম্ভোগ করিল, কাল আরও ভাল করিয়া কাজ করিতে পারিবে।"

জন। "নিশ্চয়ই।"

গুই। "হাঁ নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিবে।"

জন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করিয়া বুঝিলে গুই?"

শ্রীমান্ গুইর উত্তর যোগাইল না, সকলে হাসিতে লাগিলেন। বেচারা রাগে রাঙ্গা

হইয়া উঠিল এবং মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া তাঁর কাপড়ে মুখ ঢাকিল। উরসুল্লা একবার জনের দিকে তাকাইলেন।

জন বলিলেন, "আঃ সকলে গুইর উপর হাসছেন কেন? গুই তার মনের কথা বলে ফেলেছে বই তো নয়। গুই শোন, আমরা হাসছি বলে তোমার কি রাগ করতে আছে? তুমি বলিলে, লোকেরা নিশ্চয়ই ভাল করে কাজ করিবে, কিন্তু কেন করিবে ত তুমি নিজেই বুঝতে পারনি; কোন কথা না বুঝে কখনও তাতে বাহাদুরী করে সায় দিতে নাই। আজ তোমায় আমি কারণ বুঝিয়ে দিচ্ছি। এতদিন লোকেরা আমাদের বড় জানিয়া ভয়ে কাজ করিত, কিন্তু আজ আমরা বন্ধুর মত তাদের সঙ্গে মিশিলাম বলিয়া তারা আমাদের বন্ধুভাবে পাইল, ভবিষ্যতে তাহারা ভালবাসার খাতিরে কাজ করিবে; ভালবাসায় যে কাজ হয় সে খুব সহজে ও আনন্দে হয়।"

জন ও উরসুল্লা ছোট ছেলেদের কাছে ধর্ম্মের বড় বড় কথা খুব কমই বলিতেন। কেবল উভয়ে সব ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া সংক্ষেপে উপাসনা করিতেন এবং ধর্ম্ম উপদেশ পাঠ করিতেন; এবং সর্ব্বদা প্রাণপণে প্রার্থনা ও উপদেশ অনুসারে নিজেদের জীবন চালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, যেন তাহারা তাঁহাদের জীবন দেখিয়া বুঝিতে শিক্ষা করে যে যাহা চাই তাহা হওয়া চাই ও তাঁহাদের কথার উপর শ্রদ্ধা করিতে শেখে। ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন কখন তাহাদের সম্মুখে করিতেন না, কেবল বলিতেন যে তাঁহারা খ্রীষ্টান।

বাবার উপদেশ শুনিয়া গুইর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। মিউরিয়েল বলিয়া উঠিল, "বাবা কে যেন আসিতেছেন, আমি ফটক খোলার শব্দ পাইতেছি।" একটী দরিদ্র বালক আসিয়া দাঁড়াইল।

উরসুল্লা। "বাছা, তুমি কি চাও?"

বালক অভদ্রভাবে উত্তর দিল, "কি?"

উরসুল্লা। "কি চাও তুমি?"

বালক। "মিষ্টার জন বেনসকে চাই।"

উরসুল্লা। "তিনি ঐ ধারে সকলের সঙ্গে গল্প করিতেছেন।"

বালক দৌড়াইয়া পালাইয়া গেল। খানিক পরে খুব কোলাহল ও সঙ্গে সঙ্গে খুব কান্নাকাটীর শব্দ শোনা গেল। জন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। কি যে হইয়াছে বোঝা শক্ত হইয়া উঠিল। অনেক কষ্টের পর সব ভাঙ্গাচোরা এজাহারে এই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের অবর্ত্তমানে লর্ড লাক্সমোরের লোকেরা আসিয়া ভাড়া বাকী পড়িয়াছে বলিয়া সকলের সব জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে, এখন বাড়ী গিয়া শুধু ইট দেখিতে হইবে। কথা শেষ হইতে না হইতে স্ত্রীলোকেরা হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

জন ধমকাইয়া চুপ করিতে বলিয়া তখনি ঘোড়সওয়ার হইয়া তাহাদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া ঘোড়া আনিতে হুকুম করিলেন।

অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদের মুখ হইতে "ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন" বাক্য উচ্চারিত হইল। কেহ বৃদ্ধ রুগ্ন পিতামাতাকে, কেহ শিশুসন্তানকে ফেলিয়া আসিয়াছিল। জেকব ভয়ানক একটা মোটা লাঠী কাঁধে করিয়া বলিল, "একবার যারা আমাদের এই দশা করিয়াছে তাদের যদি দেখা পাইতাম।"

জন বলিলেন, "জেকব, লাঠী নামিয়ে রাখ। যতক্ষণ না আমি বাড়ী ফিরি, ততক্ষণ কেহ এ স্থল হইতে নড়িবে না। তোমরা সকলে কি তোমার প্রভুকে বিশ্বাস কর না?"

জেকব কেবলমাত্র একবার তাহার প্রভুর দিকে চাহিল, তাহার পর বাধ্য শিশুর মত লাঠী ফেলিয়া দিল। সেই নিপীড়িত দল ক্ষেপিয়া উঠিলে একটা ভয়ানক কাণ্ড করিতে পারিত। কিন্তু জনের ডাকে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, জন তাহাদের বুঝাইলেন, লর্ড লাক্সমোর এ রকম অত্যাচার করিয়া দেশের শান্তি ও নিয়ম ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যেন শান্তি ও নিয়ম ভাঙ্গার দোষে অপরাধী না হয়। তিনি বাকী ভাড়া দিয়া সমস্ত জিনিষ ফিরাইয়া আনিবেন, যদি আজ সমস্ত কাজ শেষ করা সম্ভব না হয়, পুরুষেরা কষ্ট সহ্য করিয়া বাহিরে বসিয়া রাত কাটাইবেন, মেয়েদের শোবার স্থান উরসুল্লা করিয়া দিবেন।

উরসুল্লা জনের কথায় খুব আহ্লাদের সহিত সায় দিলেন এবং নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন।

জন ঘোড়ায় চড়িলে, উরসুল্লা চাবুক ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, "সাবধানে যেও, শীঘ্র ফিরে এসো।"

উরসুল্লা মেয়েদের রান্নাঘরে লইয়া আসিলেন, এবং পুরুষেরা মাঠে বসিয়া আগুন সেঁকিতে লাগিল। ছেলেদের শুইতে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই নড়িল না।

তিন ঘণ্টা এইরূপে কাটিল। উরসুল্লা চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিনিয়স, উঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে না তো? লর্ড লাক্সমোরের লোকেরা কি গরীবদের উপর বেশী অত্যাচার করিয়াছে?"

ফিনিয়স। "না; তবে তাহাদের ভাড়া দিবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল, তাহা না করিয়া জোরজবরদস্তি জিনিষ লইয়া গিয়াছে। জন সব ঠিক করিতে পারিবেন, কিন্তু লর্ড লাক্সমোর ভয়ানক চটিবেন।"

উরসুল্লা যেন চিন্তিতা হইলেন। একটু পরেই বলিলেন, "না উনি ঠিক বলিয়া যাহা করিবেন, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহাতে সহায়তা করিবেন। ভাল কথা, মিউরিয়েল

কোথায় ?" "বাবা না ফিরিলে ঘুমাইব না" বলিয়া মিউরিয়েল বাহিরে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বাপের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মার গলা পাইয়া, বলিল "মা, বাবা কখন আসিবেন ?"

উরসুল্লা। "বাছা, তুমি হিমে আঁধারে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বাবা শীঘ্রই আসবেন, ভিতরে এস।"

মিউরিয়েল। "মা আমার তো হিম লাগছে না, আর আঁধার কাকে বলে মা ?"

সত্যি ! মিউরিয়েলের জীবনে যেমন বাহিরের আঁধার আলোকের পার্থক্য বুঝিবার সুযোগ হয় নাই, সেইরূপ মানসিক জীবনে দুঃখ কাহাকে বলে যেন কখনও বুঝিত না। চির শান্তিময়ী, চির আনন্দময়ী সে মূর্ত্তি ; তার দর্শনে যেন পৃথিবীর শোক দুঃখের ছায়া সরিয়া যাইত ; এখনও সে মূর্ত্তি মনে পড়িলে মন শান্ত হইতে চাহে। আমরা জোর করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম, কিন্তু সে দরজার চৌকাঠে বসিয়া রহিল, আর বাবার আসার শব্দ পাইবামাত্র সকলকে আসিয়া খবর দিল। উরসুল্লা দৌড়িলেন। একজন বৃদ্ধা ও একটী রুগ্ন শিশুকে লইয়া জন প্রবেশ করিলেন। উরসুল্লা ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কতটুকু কাজ হইয়াছে শুনিবার জন্য সকলে ছুটিয়া আসিল, জন বলিলেন, "ধৈর্য্য ধর, আজ আমি কিছুই করিতে পারিলাম না, কারণ জমীদার বাড়ী ছিলেন না, কাল তোমাদের সকলের টাকা শোধ দিয়া জিনিষ ফিরাইয়া আনিব, ভবিষ্যতে তোমরা আমার ভাড়াটে হবে।" লোকরা এইটুকু কথাতেই যেন খুব আহ্লাদিত হইল। বেচারারা রোজ আনে রোজ খায়, একটু কথার সহানুভূতি পাইলেই যেন কৃতার্থ হয়। সকলের জন্য শুইবার স্থান করিয়া দেওয়া হইল, কেবল রুগ্ন শিশু ও তাহার মাতার স্থানের জন্য উরসুল্লা যেন একটু চিন্তিত হইলেন। শিশুর মাতা কাঁদিয়া কহিল, "ওগো আমার ছেলের কিছু হয় নি, কেবল বাছা না খেতে পেয়ে এ রকম হয়েছে, আপনারা দয়া করে আমার ছেলেকে একটু থাকবার জায়গা দিন।"

উরসুল্লা মায়ের কাতর ক্রন্দন শুনে থাকতে পারলেন না, বলিলেন, "ভয় পাবার তো কোন কারণ নাই। গরীবের ছেলেদের আশ্রয় দিলে ভগবান্ আমার বাছাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন ; এস বাছা, তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে আমার ছেলেদের শোবার ঘরের পাশে যে ছোট্ট ঘরটুকু আছে সেখানে শোও। এত অধৈর্য্য হলে কি চলে ? সংসারে রোগ শোক, দুঃখ বিপদ্ তো আছেই।"

উরসুল্লা শোবার ঘরে প্রবেশ করিলেন, মিউরিয়েল জনের কোলে ঘুমাইতেছিল। এতক্ষণে যেন উভয়ে একটু সুস্থির হইলেন।

উরসুল্লা। "আচ্ছা, তুমি যে বলছিলে লর্ড লাক্সমোর খুব দরকারী কাজে বাহিরে গিয়াছেন, কি কাজে গিয়াছেন ?"

জন নীরবে লক্ষ্মীর প্রতিমা উরসুল্লার দিকে তাকাইয়া খানিক পরে বলিলেন, "আমরা চিরসুখী, ভগবান্ করুন, দুর্ভাগাদের দোষ যেন মস্ত হয়ে আমাদের চোখে না লাগে।"

উরসুল্লা। "জন, তবে কি কেরোলাইন সত্যি সত্যি—— ।"

জন। "সত্যি। আজ সকালে বারমিল লর্ড লাক্সমোরের সম্পত্তি যথাসাধ্য অপহরণ করিয়া, কেরোলাইনকে সঙ্গে করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, লর্ড লাক্সমোর তাহাকে ধরিবার জন্য গিয়াছেন।"

উরসুল্লা। "আর রিচার্ড বার্থউড ?"

জন। "সে দিনরাত মদ খাইতেছে, তাহাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে।"

সেই দিন হইতে ভবিষ্যতে এ গৃহে কেরোলাইনের নাম আর কখন উচ্চারিত হয় নাই।

তার পর দিন প্রায় সমস্ত দিন দৌড়ধাপ করিয়া সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া জন লোকগুলিকে বিদায় করিলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিকালে চা খাইতে বসিয়া রুগ্ন শিশুর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন।

উরসুল্লা। "ছেলেটীর অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু মেরী জানে যে এ ছোট ছেলের বাড়ী কোন আশঙ্কা থাকিলে কি বলিত না? আমি এ অবস্থায় তাহাদের চলিয়া যাইতেই বা কি করিয়া বলি?"

জন। "ব্যস্ততার কোন কারণ নাই, ডাক্তার জেসপ আসিলেই অবস্থা বুঝা যাইবে।" এই সময় মিউরিয়েলের গান শুনা গেল, ঠিক মনে হইল যেন সে স্বর্গের দূতদিগের সহিত কথা বলিতেছে। জনের মনটাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ফিনিয়স, আমি ডাক্তার ডাকিতে যাইতেছি, ছেলেমেয়েদের উপরে যাইতে দিও না।"

"জন, তোমার কি ভয় হইতেছে?"

জন। "না, অদৃশ্য হস্তের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; তবে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। সকলেই বসন্তের টীকা লইয়াছিল, সকলেরই উঠিয়াছে, কেবল মিউরিয়েলের ওঠে নাই! শুনিলাম, কিন্সবেলে খুব বসন্ত হইতেছে।"

জন চলিয়া গেল। আমার যেন কি অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক দুরদুর করিয়া উঠিল।

ডাক্তার আসিলেন, চলিয়া গেলেন। আমি জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলেটী তো ভাল আছে, তবে তার মা অত কাঁদছে কেন?"

জন। "কাঁদছে কেন? জেনে শুনে সে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

উরসুল্লা। "তবে কি তার ছেলের বসন্ত হইয়াছে?"

জন। "হাঁ, ভয়ানক শক্ত রকমের, বাঁচিবার কোন আশা নাই।"

উরসুল্লা। "কি ভয়ানক, তাকে বার করে দেও, বিলম্ব কোরো না।"

জন। "উরসুল্লা, যা হবার হয়েছে, আমরা ভগবানের মুখ চাহিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম, এখন জল ঝড়ের মাঝখানে মৃতপ্রায় শিশু শুদ্ধ তাড়াইয়া দেওয়া কি ঠিক হইবে? মনে কর, তোমার এই রকম অবস্থায় যদি কেহ এইরূপ ব্যবহার করিত।"

উরসুল্লা জনের কথা বুঝিল, নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "না, না, থাক।"

ছেলেটী মারা গেল। আমি শিশুদের ঘরের সঙ্গে নিজের ঘর বদল করিলাম। সকলে পরামর্শ করিলাম, রাত্রিবেলা শিশুদের অসাক্ষাতে মৃত শিশুর দেহ বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। মেরীকে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মিউরিয়েল ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও টমকে একলা ফেলিয়া কেন চলে যাচ্ছে?"

"টমকে স্বর্গের দূতেরা এসে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছেন।"

"স্বর্গ কাকে বলে? সে কি রকম জায়গা?"

"সেখানে অন্ধকার নাই।"

"সত্যি! বাবা, আমারও যে সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে, দূতেরা কবে আমায় নিতে আসবে?"

জন ভয় পাইয়া মেয়েটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ওকথা কি বলতে আছে।"

রাত হইল, আমি শুইয়াছি, হঠাৎ যেন মনে হইল আমার পায়ের নিকট হইতে কে যেন চলিয়া গেল, তারপর সেই মৃত-শিশুর গৃহে যেন কান্নার শব্দ পাইলাম। আমি সকল ভয় ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিলাম, দেখিলাম মিউরিয়েল টমের মাথার কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। ভয়ে আতঙ্কে আমি জনকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। মিউরিয়েল বলিল, "আমার টমকে আর দূতদের দেখতে বড় ইচ্ছা করছিলো, তাই এসেছি। এই কি টম? এর গা যে বড় ঠাণ্ডা।" জন এই সময় আসিয়া কোন কথা না বলিয়া আমার কোল হইতে শিশুকে ছিনিয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম পিতৃস্নেহ কি জিনিষ, তাই বুঝি লোকে ভগবানকে পিতা বলিয়া ডাকে।

পরে পরে সব ছেলে মেয়েগুলির বসন্ত হইল। হপ্তার পর হপ্তা রোগের মধ্যে কাটিয়া গেল। জন যেন মিউরিয়েলের জন্য বেশী চিন্তিত হইল; এতদিনে বুঝিলাম, সে মিউরিয়েলকে সকল অপেক্ষা ভালবাসে, অন্ধ মিউরিয়েল যে তার প্রাণের পুতুলি। মা বাপ রাতের পর রাত শিশুদের সেবায় কাটাইয়া দিলেন, কি অসীম ধৈর্য্য! ভগবানের কৃপায় বিপদের দিন কাটিয়া গেল, সকলে ভাল হইয়া উঠিল।

একদিন বৃষ্টির পর যখন সব সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল, সব শিশুগুলি ফাঁড়া কাটাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, উরসুল্লা অনেকদিন পরে নীচে নামিয়াছেন, চুপ করিয়া চেয়ারে শুইয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া নীরবে জল পড়িল। মিউরিয়েল আসিয়া মায়ের কাছে বসিল। রোগ যেন তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া দিয়া গিয়াছে। সে নিজ অভ্যাসমত বাজনা বাজাইতে লাগিল। সে

সুমিষ্ট বাদ্য ও সঙ্গীত শুনিয়া পিতা মাতা কৃতজ্ঞতাভরে আনন্দে বিধাতাকে প্রণাম করিলেন। ক্রমশঃ।

হিন্দু বিধবার রাজ্যশাসন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অহল্যাবাঈ ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্যে বহু অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বদান্যতা, ধর্ম্মানুরাগ কেবল তাঁহার রাজ্যের সীমা মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত না। ভারতের সকল প্রধান তীর্থস্থানে তাঁহার কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জগন্নাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে কেদারনাথ ও দক্ষিণে কুমারিকার সন্নিকটস্থ রামেশ্বর তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না। এই সকল তীর্থক্ষেত্রেই তাঁহার নিজ ব্যয়ে নির্ম্মিত দেবমন্দির ও নিয়মিত দান ধ্যান প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ষ্টুয়ার্ট (Captain Stuart) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেদার-নাথ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি, অহল্যাবাঈ তৎপ্রদেশস্থ জনগণের হৃদয়ে কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেই পার্ব্বত্য-প্রদেশে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত একটী ধর্ম্মশালা ও জলাশয় প্রস্তত করাইয়া দিয়াছেন। সেই ধর্ম্মশালার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কোনও জনমানবের বসতির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। গয়াতেও তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার স্বজাতির চক্ষে তিনি স্বর্গের দেবী—রামসীতার মূর্ত্তির পার্শ্বে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবমন্দিরের সাহায্যকল্পে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের সকল দেবমন্দিরের ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন গঙ্গাজল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিতে তাঁহাকে কিরূপ সুবন্দোবস্ত ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সকল কার্য্যকলাপ তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। তিনি প্রত্যহ বহুসংখ্যক দরিদ্রকে আহার করাইতেন। গ্রীষ্মকালে পথিকদিগের কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতেন, আবার শীতের প্রারম্ভে দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন। পশু, পক্ষী, এমন কি মৎস্য পর্য্যন্ত তাঁহার কৃপার বহির্ভূত ছিল না। তাহাদিগের জন্য আহারের ব্যবস্থা ছিল। মহেশ্বরের নিকটস্থিত মাঠে গ্রীষ্মকালে কৃষককে সময় সময় কার্য্য বন্ধ রাখিয়া অহল্যাবাঈএর

ভৃত্য কর্ত্তৃক আনীত জল গো মহিষাদিকে পান করাইতে হইত। স্থানে স্থানে শস্য-পরিপূর্ণ মাঠ তিনি পক্ষীদিগের জন্য রাখিয়া দিতেন।

জীবনের শেষাংশে তিনি নানা শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার জামাতার মৃত্যু হয় এবং তৎসঙ্গে তাঁহার কন্যা মুক্তাবাঈ মাতার সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পতির চিতানলে আপনার দেহ ভস্মীভূত করেন। এই শোকাবহ ঘটনা তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে তিনি কন্যা ও জামাতার স্মরণার্থ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন—ভারতে আধুনিক সময়ে তেমন বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মন্দির কমই নির্ম্মিত হইয়াছে।

অহল্যাবাঈ ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। তাঁহার আকৃতি নাতিদীর্ঘ ছিল এবং অত্যন্ত কৃশ ছিলেন। দেখিতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তাঁহার মুখের একটী বিচিত্র লাবণ্য ছিল। তাহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করিত। তিনি স্বয়ং গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারিতেন, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং অতি দ্রুত ও শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। যৌবনেই তিনি বিধবা হন এবং সেই সময় হইতে তিনি অন্যান্য হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। সংসারের সকল প্রলোভন পরীক্ষার মধ্যেও তাঁহার জীবনের ব্রত অটুট ছিল।

তাঁহার চরিত্রের এমন দৃঢ়তা ছিল যে, কেহ তোষামোদে তাঁহাকে ভুলাইতে পারিত না। একদা একটী ব্রাহ্মণ পারিতোষিক প্রাপ্তির আশায় তাঁহার প্রশংসাসূচক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। অহল্যাবাঈ ধীরভাবে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি গ্রন্থখানিকে নর্ম্মদা-সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন, বলিলেন, আমি পাপী ও নিতান্ত দুর্ব্বল, এরূপ প্রশংসার যোগ্য আমি নহি। এই ভাবে গ্রন্থকারকে বিদায় দিলেন। মালব দেশের ইতিহাসপ্রণেতা সার্ জন্ ম্যালকম (Sir John Malcom) মহোদয়ের উক্তি উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। এই ঐতিহাসিকের মতে এই মহিলা-চরিত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার বিমল চরিত্র ও আশ্চর্য্য কার্য্যদক্ষতার হিসাবে তাঁহার ন্যায় আদর্শ শাসনকর্ত্রী প্রায় দেখা যায় না। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যবোধ সংসারের সাধারণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে মানুষকে কতদূর সাহায্য করে, এই আদর্শনারী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সতী-মন্দির।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সরোজ কি লিখিতে লাগিল। আজ আর সে আহারাদি করিল না—তার সুন্দর ম্লান মুখখানিতে কি এক স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—সহসা দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম হয়! অবিশ্রাম সংগ্রামের পর বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হাস্যে তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তে অনাবিল, কুণ্ঠাহীন, অবাধ শান্তি ঢালিয়া দিয়াছেন!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। মাঠের পশ্চিমদেশে কাতর করুণ দৃষ্টিখানি নিক্ষেপ করিয়া করিয়া দিনমণি দিবসের নিকট বিদায় লইলেন। বিহঙ্গদল ডাকিয়া ডাকিয়া নীড়ের উদ্দেশ্যে উড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র পল্লীর উপর রজনীর নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল।

নির্জ্জনগৃহে একা সরোজ উদ্বিগ্নমনে যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে! কোথাও একটু শব্দ হইবামাত্র উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতেছে। যখন কিছুই দেখিতে পায় না, নিরাশ মনে ঘরে আসিয়া বসে। নির্জ্জন পল্লী সুপ্তিভারে ক্রমে অবশ হইয়া পড়িল, কিন্তু নিদ্রাহীন চক্ষে সরোজ বসিয়া আছে!

সরোজের একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রাঘোরে তার মনে হইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। "কই গো, দিদি, কই, হেঁই গো আমি এস্‌ছি গো"—এই বলিয়া অন্ধকারেই কৈবর্ত্তদের মেয়ে ঘরে ঢুকিল। সরোজ উঠিল, প্রদীপ জ্বালিল। নৈশ বায়ুভরে প্রদীপের শিখা ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, সরোজ জানেলাটা বন্ধ করিয়া দিল। সরোজের প্রাণও যেন ওই প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

বিছানার নীচে হইতে সে একখানা চিঠি বাহির করিল। কৈবর্ত্তদের মেয়ের কানে কানে কি বলিয়া দিল। অনুচ্চ কণ্ঠে পরে কহিল—"দেখিস, পারবি ত। আর যেন কেউ না দেখে, দেখিস, খুব সাবধান কিন্তু।" হাত মুখ নাড়িয়া সে কহিয়া উঠিল —"তা আর পারব নি, দিদি, কত লোকের কত কাজ করনু, এটা কি আর কাজের মধ্যি কাজ!" তাহার কথা শুনিয়া সরোজ শুধু হাসিল মাত্র, এবং গুণিয়া তাহার হাতে দশ টাকা গুঁজিয়া দিল! বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সে সরোজের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল—এক সঙ্গে অত টাকা হাতে পড়াতে তার হাত যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে যে আত্মহারা আনন্দের কম্পন! টাকা পাইয়া সরোজকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সে চলিয়া গেল! সরোজের আচরণ তার কিন্তু কেমন অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। এই দৌত্যের মধ্যে একটা বিপুল রহস্য আছে, সে ঠিক করিয়া লইল। তাই মনে মনে ভাবিল—"আমরা গরীব লোক গতর খাটিয়ে খাই, কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরের বিধবা; ওমা, ছি, ছি, কি নজ্জার কথা।"

গভীর রাত্রে পল্লীর সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিল—"আগুন, আগুন।" হাঁ, সত্যইত আগুন। বৃদ্ধ, যুবা সকলে ছুটিল। সরোজের গৃহে আগুন লাগিয়াছে। অগ্নি ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে—তাহার লেলিহান জিহ্বা লকলক্ করিতেছে। সকলে মিলিয়া যথেষ্ট গোল করিল, কিন্তু আগুন নিভাইতে পারিল না। গৃহ ভস্মীভূত হইল—নিকটে অন্য গৃহ ছিল না, তাই গ্রামখানি রক্ষা পাইল ভাবিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত হইলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পরে সকলে দেখিল যে সরোজের নশ্বর দেহও ভস্মীভূত হইয়াছে!

পরদিন প্রভাতে রতন ফিরিয়া আসিয়া সরোজের গৃহদাহ এবং মৃত্যুসংবাদ শুনিল। সে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কিছু বলিতেও সাহস পাইল না। রতন সরোজের গৃহের দিকে গেল। অশ্রুবাষ্পরুদ্ধনেত্রে তন্ময় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কাহার ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল যে কৈবর্ত্তদের মেয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। সে অন্যমনে জিজ্ঞাসা করিল—"কে দিয়েছে রে?" "হেঁই দাদাবাবু, সরোজ দিদি দেছল, আহা, কাল দেছল গো, তখন কে—" তাহাকে বাধা দিয়া রতন কহিল—"থাম্, থাম্, হয়েছে, তুই এখন যা।"

কম্পিতহস্তে রতন পত্রখানা খুলিল। পত্রে লেখা আছে:—

নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া কত উৎসাহ লইয়া তুমি কলিকাতায় গিয়াছ, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া কি দেখিবে? দেখিবে যে তোমার আশালতিকা নির্ম্মূল হইয়াছে। যখন বুঝিতে পারিবে আমিই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছি, আমি বেশ জানি তোমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে। আঘাত যতই প্রচণ্ড হউক, তোমাকে তাহা সহ্য করিতে হইবে। লোকে জানিবে অগ্নিদাহে আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু সেটা ঠিক নহে, আমি ইচ্ছা করিয়াই মরিলাম। কিন্তু আমার এই মৃত্যুকে দণ্ডের ন্যায় কঠিন বলিয়া গ্রহণ করিও না—গভীর ভালবাসার এই অকরুণ আত্মবিসর্জ্জন পূজার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র ও সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিও।

বেশী কথা বলা কোনদিনই আমার অভ্যাস নহে। আজ যখন অজ্ঞাত মহাযাত্রার পথে আমার ক্ষুদ্র জীবন তরণীর সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিলাম, তখন ভাসিবার আগে তোমাকে গোটাকতক কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে।

সেদিনকার ঘটনায় গ্রামের লোক বিশ্বাস করিয়াছে যে, পূর্ব্ব হইতে জমীদারের সঙ্গে আমার ষড়্ ছিল—তুমি বাধা দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ মাত্র। তুমি যখন নিকটে ছিলে তখন এ সমস্ত বিষয়ে আন্দোলন যে হয় নাই তাহা নহে, তবে তোমার ভয়ে লোকে বেশী কিছু করিতে সাহস করে নাই। আজ মাত্র কয় দিন তুমি এখানে নাই, এ কয় দিনে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তুমি বোধ হয় তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবে

না। আমি যে এ কয় দিন কতদূর সহ্য করিয়াছি, তাহা অন্তর্যামী জানেন! নারীর জীবনের মূল্য কি এতই হীন? তার চরিত্র-গৌরব এত ক্ষণভঙ্গুর কেন? সত্য কথাটা লোকে যে জানে না তাহাও ত বোধ হয় না, তবে আমার উপর এত চাপ কেন? এই সঙ্গে আর একটা কথা উঠিয়াছে—সেটা কি, বুঝিতেই পার। সে রাত্রির ঘটনায় যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া বেড়াইতেছে।

অপবাদের বোঝা বহন করিয়া সমাজের কাছে অপরাধীরূপে দাঁড়াইয়া আমার নারীমর্য্যাদাকে আমি খর্ব্ব করিতে পারিব না। আশ্রয়হীনা, অসহায়া বিধবাকে কেহ ত করুণার চক্ষে দেখে নাই। সংসার নির্ম্মম, কিন্তু তোমার হৃদয় কেন করুণাপূর্ণ? তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমি তোমাকে একথা বলিতেছি, তাহা নয়। দেখিয়াছি, পরের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে—সকলের সুখ দুঃখে তোমার কিছু না কিছু অংশ থাকে!

শুধু অত্যাচার অথবা অবিচারের ভয়ে আমি জীবন বিসর্জ্জন দিলাম, তা' নয়—কিন্তু! আত্মমর্য্যাদা এবং তোমার চরিত্র-গৌরবকে অটুট রাখিতে হইলে আমি দেখিলাম যে, সংসারের নিকট আমাকে বিদায় লইতেই হইবে; কেন না এই কলঙ্ক রটনার পরে তুমি আমাকে বিবাহ করিলে, উভয়ের কলঙ্কের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে! অশ্রুজলে আমার কলঙ্ক যাইবার নয়, শিরা-ছেঁড়া বুকের রক্ত তাই ঢালিয়া দিলাম—রক্তসিক্ত হৃদয়কমল দেখিয়া ভরসা করি সংসার বুঝিতে পারিবে যে, কোনোরূপ কালিমাতে সে ম্লান হইয়া পড়ে নাই!

সকলে একবাক্যে বলিবে ভালবাসায় আমার কোন অধিকারই নাই, কিন্তু মানুষ যে অধিকার দিতে নারাজ, দেবতা সেটা মুক্তহস্তে দিয়াছেন। আমার হৃদয়দ্বার তোমার শুভস্পর্শে মুক্ত হইয়াছে—কিন্তু কৈ তাহাতে ত আমার কপালে লজ্জার দাগ পড়ে নাই। আমার হৃদয়মন্দিরের এই পবিত্র পূজা সংসার ত কোন দিনই গ্রহণ করিবে না, সুতরাং আমি তোমাকে যতই ভালবাসি না কেন, সংসারের বিচারালয়ে আমাকে অপরাধিনীর মতন জীবন যাপন করিতেই হইবে এবং এমন কি তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেও আমি সম্ভবতঃ কোন দিন কুণ্ঠাশূন্য হইতে পারিব না। আমাদের ভালবাসাকে তারাই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে, জীবনে যারা প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদ পায় নাই। প্রচলিত নিয়মের বাহিরে, যত বড় সত্য থাকুক না কেন, তাহাকে লোকে মানিতে চাহিবে কেন?—তাই সমাজের নিক্তির ওজনে এত বড় খাঁটি জিনিস তুচ্ছ ও মূল্যহীন হইয়া যাইবে। সংসারের সঙ্গে এ বিবাদ আমারত মিটিবে না—সংসারে থাকার তবে প্রয়োজনই বা কি?

আমার দিকটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য কি না। বাঙ্গলা দেশে নারীর পক্ষে চলিবার পথ নাই বলিয়াই না তোমাদের চলিবার

পথ এত মুক্ত! আমাদের জন্য শুধু দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ক্ষমা নাই—আর তোমাদের বেলা কোনো দণ্ডই নাই। এই ওজনের বাটখারা এত অদ্ভুত কেন বল দেখি? সমাজের দুই চক্ষু থাকিলে দৃষ্টি সমান হইত—একটী চক্ষে সে বরাবরই একদিক দেখিয়া আসিতেছে।

যে আমায় সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে যে আমার চোখের সাম্‌নে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে জীবনে সেবা ও ত্যাগের দ্বারা শুধু অটলভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে, তাহাকে যদি আমি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিয়া থাকি, তাহা হইলে কি অন্যায় করিয়াছি? কখনই নয়। তোমার দৃষ্টান্তে, তোমার কার্য্যে, তোমার ব্যবহারে, আমার কতদূর উপকার হইয়াছে, অন্যে তার বিচার করিয়া কি বুঝিবে—আমি জানি তোমার সংস্পর্শে আমার মন উন্নত হইয়াছে, পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছি। লোকে তবু বলিবে আমার ভালবাসার মধ্যে পবিত্রতা থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি একথা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। আমার ভালবাসার চেয়ে সংসারে যে পবিত্রতর জিনিষ থাকিতে পারে, সে কথা আমি মানি না। আমার নারীমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমার এই প্রাণ বিসর্জ্জন, তাই বিধাতার নিকট দণ্ডনীয় হইব না, আমার মনে হয়—কেন না মহৎ ভালবাসার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সংসারের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলাম।

ছেলেবেলায় যখন সকলে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিত, 'সরোজ, দ্যাখ্‌লো, ওই তোর বর যাচ্ছে," বর কথাটা তখন শুনিতাম মাত্র, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতাম না। অবস্থা ও ঘটনার চক্রে আমি যে আবার এমন ভাবে ফিরিয়া আসিব তাহাত কখনও ভাবি নাই। যখন অসহায় অবস্থায় পড়িলাম, আমার অবস্থার হীনতা কেন তোমার প্রাণ স্পর্শ করিল? সকলে যাহার উপর অবিচার করিয়াছে, তুমি কেন সেখানে সংসারের জটিল চিত্রখানা চোখের সাম্‌নে সরল করিয়া তুলিলে? তুমি কে যে তোমার শুভ ইচ্ছা ও মঙ্গল কামনা দিয়া আমার জীবনের যাত্রাপথকে সহজ করিয়া দিলে? তুমি ঠিকই বলিয়াছ, এই যে আবার আমরা পাশাপাশি দাঁড়াইলাম, ইহার মধ্যে দেবতার ইঙ্গিত আছে—আমিও তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে এক বিচিত্র সুরে মিলনের সঙ্গীত উঠিয়াছে—সে সুর অথবা সঙ্গীত ত আমাদের নহে। মানবের শক্তির বাহিরে যে একটা অদৃশ্য শক্তি চিরদিন কাজ করিয়া আসিতেছে, সেই শক্তিই, আমাদের মধ্যে যে একটা ব্যবধানের পর্দ্দা পড়িয়াছিল, তাহাকে নিজের হাতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে—এই অতি সহজ সত্য কথাটা লোকে যদি বুঝিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে মিথ্যা কলঙ্কের দুর্ব্বিষহ বোঝাটা কি আমার ঘাড়ে এমন করিয়া চাপাইতে পারিত?

আমাদের কোনো ভুলই শোধরাইবার পথ তোমরা রাখ নাই। আমাদের কোনো

দিকটাই তোমরা স্বাধীনভাবে দেখিতে দিতে চাও না—তাই অতি সহজে কথায় কথায় কলঙ্কের বোঝা এবং রাশি রাশি অপমান আমাদের উপর চাপাইয়া দাও। গৃহস্থালীর সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে আমাদের বাহির করিয়া দিয়া, যখন সহস্র লোলুপদৃষ্টির মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দাও, তখন নারীর হৃদয়ের লজ্জাটুকু ঢাকা দিবার কিছুই থাকে না! আমরা স্ত্রীলোক বলিয়াই শুধু আমাদের উপর অত্যাচার কর—বাহির করিয়া দিবার দ্বার চিরমুক্ত রাখিয়াছ, কিন্তু বাহির হইতে ভিতরে আসিবার দ্বারদেশে লিখিয়া দিয়াছ—প্রবেশ নিষেধ! সমাজের পাষাণরুদ্ধ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অনুতপ্ত-চিত্তে মাথা ঠুকিলেও সে দ্বার আর কখনও খোলে না! তোমাদের ভুল আর আমাদের ভুল!—হিসাবের খাতা তোমাদের হাতে, তাই অঙ্কের ফলের এত পার্থক্য। আমাদের দুর্ব্বলতা এবং ভুলের মধ্যে যে কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে, তাহাতে তোমাদের কপালে কেন ছাপ পড়ে না? শীলমোহর নাই বলিয়া? সমাজের কারখানা ঘরে সে শীলমোহর যে কোনো দিন তৈয়ারী হইবে, তাহাও ত মনে হয় না!

তোমাকে এত কথা বলিতেছি কেন? চিরদিনের জন্য যে নীরব হইবে, তার পাঁজরাখসা বেদনা কাহিনী মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারে না—কেননা মৃত্যুর স্পর্শ যে অনুভব করে, তার দ্বিধা সঙ্কোচ সব কাটিয়া যায়। আর আমার শেষ নালিশ যদি তোমার কাছে না করিব, তা'হলে কার কাছে করিব বল? আমার বুকফাটা হাহাকারের প্রতিকার জীবনের রক্তবিন্দু দিয়া তোমাকে শোধ করিতে হইবে। নিষ্ঠুর অত্যাচারের পদতলে পড়িয়া আমার ন্যায় কত প্রাণী নিষ্পেষিত হইতেছে! সমাজের রথচক্রের তলে মরণের ভিড় কি চির অব্যাহত থাকিবে? আমাদের মিলনে তুমি যাহা বুঝিতে পারিতে না, আমি বিশ্বাস করি, আমার বিরহজনিত ক্লেশে তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। বাঁচিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও যে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে, সে তোমার নিকটে বিচারের প্রত্যাশা করে। অতি দুঃখেও মানুষ বাঁচিতে চায়, তাই বলি ইচ্ছা-মৃত্যুতে কতখানি দুঃখ থাকিতে পারে, ভাবিয়া দেখিও। তোমার হৃদয়ে সাহস আছে, কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে না কেন? সংগ্রাম আরম্ভ কর, জয়লাভ অবশ্য একদিন হইবে। সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় সত্য খাঁটি সোণার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যাহা মূল্যহীন তাহা ভস্ম হইয়া যাইবে।

তবু শেষবার বলি, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা করিতেছে না—কিন্তু কি করিব, উপায় নাই যে! তুমি যদি কাছে থাকিতে, তাহা হইলে আমি মরিতে পারিতাম না—তোমার মুখ দেখিলে আমার প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া যাইত। মরণের কূলে দাঁড়াইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি ভালবাসা—পাথেয় লইয়া ঝাঁপ দিলাম! মানুষের ন্যায় বোধ হয় দেবতা নিষ্ঠুর নহেন। বিশ্বদেবতার চরণ-ছায়াতলে তোমার আমার সকল বেদনা

ও অশ্রুজল একদিন শান্তিলাভ করিবে। আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব—মৃত্যুর পর্দ্দার মধ্যে প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে না।

ইহকাল ও পরকাল আমাদের কথা, কিন্তু অনন্তকালই ঠিক। আমরা অনন্তকালের যাত্রী—ভুলো না।

সরোজ।

চিঠি পড়া শেষ হইলে রতনের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, যখন হুঁস হইল, দেখিল বেলা অনেক হইয়াছে! ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেল।

সরোজের মৃত্যুরহস্য রতন ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না।

রতনের নিয়মিত কার্য্যের কোনো ব্যতিক্রম ঘটিল না। পূর্ব্বের ন্যায় সবই ঠিক রহিল। শুধু দেখা গেল তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সে এখন খুব গম্ভীর হইয়াছে। নিতান্ত দরকার ছাড়া বড় একটা কাহারও সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা কহে না। তার সদা প্রফুল্ল মূর্ত্তির উপর কঠিন প্রতিজ্ঞার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তার উজ্জ্বল বিস্ফারিত নয়নের আকুল করুণ দৃষ্টিখানি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় করুণায় পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে—সে কমনীয় দৃষ্টি সহজেই মর্ম্মস্পর্শ করে!

সরোজের গৃহ ভস্ম হইয়াছে—সেখানে রতন কুটীর নির্ম্মাণ করাইল। সরোজের ভস্মীভূত দেহ যেখানে পাওয়া গিয়াছিল, সেখানটা বিশেষ করিয়া চিহ্নিত করিল। এই নূতন গৃহেই রতন অবস্থান করিতে লাগিল—কেননা তাহার হৃদয়ের দেবীর আত্ম-বিসর্জ্জনের লীলাভূমি তাহার নিকট পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে! গভীর রাত্রে পল্লীভবন যখন সুপ্তিমগ্ন থাকে—সে শুধু সঙ্গিহীন একেলা এই শূন্য কুটীর ভবনে অব্যক্ত মর্ম্মন্তুদ বেদনা বহন করিয়া পবিত্র অশ্রুজলে দুর্ব্বিষহ জ্বালাময় জীবনের সমস্ত সন্তাপরাশি জুড়াইবার চেষ্টা করে। রতন প্রায়ই সরোজকে উদ্দেশ করিয়া বলিত—"দেবি, তোমার আজ্ঞা যতই কঠিন হউক, আমাকে পালন করিতেই হইবে। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ও কল্যাণ কামনা স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদের ন্যায় আমার উপরে আসিয়া পড়ুক।"

গ্রামের মধ্যে সত্যসত্যই রতন একটা দল খাড়া করিল; অল্পে অল্পে সে বেশ কাজও করিতে লাগিল। বিজ্ঞ বৃদ্ধ রক্ষণশীল দলের লোকেরা টিকি নাড়িয়া নিজেদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন করিলেন এবং এই বিদ্রোহী যুবকদলের যে পরিণাম জাহান্নমে, সে বিষয় তাঁহারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন। তবু যুবকদল দমিল না, পূরা দমে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রতনই তাহাদের নেতা—মৃত্যুর দ্বারা যে অত্যাচার প্রমাণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিয়া প্রতিকার করিবার ভার সে যে রতনের হাতে

নিশ্চিন্ত মনে দিয়া গিয়াছে—প্রেমের ঋণ পরিশোধ ত শুধু অশ্রুজলে নহে, কঠোর সংগ্রামেও বটে।

তিন বৎসর পরে গ্রামের সকলে দেখিল, যে রতন কুটীর ভাঙ্গিয়া, গ্রামের ছেলেদের লইয়া মহা ধুমধামে সেখানে কি একটা করিতেছে—দেখিতে দেখিতে সেখানে একটা মন্দির উঠিল। সরোজের অন্তিমশয্যা শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরে গ্রথিত হইল। ঠিক তাহারই উপরে আর একখানা শুভ্র প্রস্তর দণ্ডায়মান অবস্থায় স্থাপিত হইল—আবার তাহারই উপরে বড় বড় রক্ত অক্ষরে খোদিত হইল—সতী-মন্দির। জমকালো লাল অক্ষরগুলি হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, রতন যেন নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া লিখিয়া দিয়াছে!

বৃদ্ধেরা সত্যসত্যই ভয় পাইলেন এবং ক্ষুদ্র গ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। এই মন্দির যে বিপ্লবের কারখানা ঘর হইল তাহা ভালরূপই বুঝিলেন, সুতরাং তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া সমাজদ্রোহী, অনাচারী দাম্ভিক রতনের এবং তাহার দলের পারত্রিকগতি যতশীঘ্র সম্ভব হয়, অহোরাত্রি সেই কামনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যতই অভিসম্পাত দিতেন, যুবকদের উৎসাহ ততই বাড়িত। ক্রমে তাঁহারা হতাশ হইলেন, কালের দোষ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

যাদুকর।

আমার প্রাণে রং ঢেলেছে
তোমার হাতের ফাগ,
বেদনা মোর রঙ্গীন হাতে
ধর্‌ল রঙ্গীন রাগ!
কৃপণ হৃদয় হল উদার
পরশ পেয়ে প্রেমের সুধার,
জীবন ব্যাপি সুরু হল
কঠিন জীবন যাগ।
ধন্য হল এক নিমেষে
ব্যর্থ এ জীবন,
দুরন্ত এই আনন্দেতে
ভাস্‌ল হৃদয় মন!
নয়নজলে ডুব্‌ল আঁখি
তোমার হাতের প্রসাদ মাখি,

বিধুর প্রাণে পড়্‌ল তব
মধুর পায়ের দাগ!

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

ব্রহ্মবাদিনী মদালসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঋতধ্বজ।

নাগরাজ অশ্বতর বলিলেন, মুনিবর গালবের সহিত গমন করিয়া রাজকুমার কি করিলেন আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর। শুনিবার জন্য আমার প্রাণ অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে। তোমাদের কথা বিচিত্র বোধ হইতেছে।

পুত্রগণ বলিলেন, বীর কুবলয়াশ্ব গালবমুনির মনোরম আশ্রমে বাস করিয়া, ব্রহ্মবাদিগণের সমস্ত বিঘ্নের অপনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুনির আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, তাহা সেই মদগর্ব্বিত দৈত্য জানিতে সমর্থ হয় নাই। তন্নিবন্ধন সে শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-উপাসনা-নিরত মুনিবর গালবের প্রতি নিগ্রহ করিতে সমাগত হইল। সে উপদ্রব আরম্ভ করিবামাত্র মুনিবরের শিষ্যগণ তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নৃপকুমার কুবলয়াশ্ব তৎক্ষণাৎ শরাসন ধারণপূর্ব্বক সেই দেবদত্ত তুরঙ্গে সমারূঢ় হইলেন এবং সেই বরাহকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বচালনা করিলেন। চারুচিত্রশোভিতচাপ সবলে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সেই শূকররূপী দানবকে আহত করিলেন। দৈত্য আহত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, এবং গিরি ও পাদপসমন্বিত অটবী মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই বেগবান্ অশ্বও রাজকুমার কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, নক্ষত্রবেগে তাহার অনুসরণ করিল। তখন সেই দানব পবনগতিতে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, ভূগর্ভে এক গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইল। অশ্বারূঢ় নৃপতিসুতও সঙ্গে সঙ্গে সেই তিমিরাবৃত মহাগর্ত্তে নিপতিত হইলেন। দানব অদৃশ্য হইল। কুবলয়াশ্ব আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পাতালে প্রবেশ করিলেন। পাতালে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সহসা চমকিত হইলেন। তাঁহার প্রাণ বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল। এ কি! কি দেখিতেছেন? কি দেখিয়া এতদূর বিস্ময়? তাঁহার নেত্রসমক্ষে সুবর্ণরচিত শত শত প্রাসাদসঙ্কুল প্রাকারশোভিত অমরাবতীসদৃশ এক মনোহর পুরী প্রতিভাত হইল। বিস্ময়াপন্ন হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোথাও জনপ্রাণী নাই। চতুর্দ্দিকে বিস্ময়জনক ব্যাপার! মহৈশ্বর্য্যের প্রকাশ! কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টির কোন সৃষ্ট জীব সেখানে দৃষ্ট হইল না। পরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা ত্বরান্বিতা একটী রমণীকে

দৃষ্টিগোচর করিলেন। তাহাকে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোথায় যাইতেছ? সেই নারী কোন উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে প্রাসাদের উপরিতলে আরোহণ করিল। তখন রাজপুত্র অশ্বকে এক স্থানে বন্ধন করিয়া বিস্মিতনয়নে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার অনুসরণ করিলেন। তিনি সেই হর্ম্ম্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী সুরম্য প্রকোষ্ঠে হেমময় পর্য্যঙ্কে এক লাবণ্যময়ী ললনা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। রূপের আলোকে যেন গৃহ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। কুবলয়াশ্ব সেই সুশোভনা বালাকে অবলোকন করিয়া মনে করিলেন, ইনি বুঝি এই পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অনন্তর সেই মহাভাগা ললনা কুবলয়াশ্বকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং লজ্জা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিনম্রভাবে অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি কি দেবতা, না যক্ষ, না গন্ধর্ব্ব? অথবা ইনি উরগ বা বিদ্যাধর? কিম্বা কোন পুণ্যবান্ মানব এইস্থানে সমাগত হইয়াছেন?

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া সেই সুলোচনা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর কিরূপ করিয়া উঠিল। সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিতা হইলেন। রাজকুমার তদ্দর্শনে ব্যথিতচিত্ত হইয়া, তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনে নিয়োজিত হইলেন। যে রমণী প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিতা হইয়াছিল, সে এতক্ষণ সেই তরুণী বালার পার্শ্বে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এখন সে আকুলিতা হইয়া উঠিল, এবং তালবৃন্ত লইয়া বীজন করিতে লাগিল। অচিরে সেই ললনার মূর্চ্ছা অপনীত হইল। তখন কুবলয়াশ্ব তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই লজ্জাশীলা বালা লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার সখীকে সমস্ত বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। এতক্ষণ যে রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনিই তাঁহার সখী।

সখী বলিলেন, হে প্রভো, স্বর্গে বিশ্বাবসু নামে যে গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, ইনি তাঁহারই দুহিতা। ইঁহার নাম মদালসা। একদিন ইনি উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালবাসী উগ্রস্বভাব শত্রুহননকারী পাতালকেতু তমোময়ী মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক এই অসহায়া বালাকে হরণ করে। সে সময় কেহ নিকটে ছিল না, আমিও সেখানে ছিলাম না। আগামী ত্রয়োদশীতে সেই অসুর ইঁহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সেই দুরাত্মা কি ইঁহার যোগ্য? গতকল্য যখন ইনি আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় সুরভি বলিলেন যে, "এই অধম দানব তোমাকে পাইবে না। এ মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে, যে ব্যক্তি শরনিকরে ইহাকে বিদ্ধ করিবে, সেই ব্যক্তিই অচিরে তোমার পতি হইবে।" আমি ইঁহার সখী। আমার নাম কুণ্ডলা। আমি মনস্বী বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং বীর

পুষ্করমালীর পত্নী। আমার স্বামী শুম্ভ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, আমি পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া, দিব্যগতিপরায়ণা হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া থাকি। দুরাত্মা পাতালকেতু তপস্বিগণের ভয়ানক বিদ্বেষী। আজ সে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, মুনিদিগকে উৎপীড়ন করিতে গিয়াছিল। তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ তাহাকে বাণাঘাতে বিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য কি না জানিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিতা হইয়া গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম প্রকৃতই সেই দানবাধম কোন ব্যক্তি দ্বারা তাড়িত হইয়াছে। এখন ইঁহার মূর্চ্ছিত হইবার কারণ শ্রবণ করুন। আপনাকে দেখিয়া অবধি ইনি আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই দানবকে বিদ্ধ করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত ইনি ত আর কাহারও ভার্য্যা হইতে পারেন না। এই কারণেই ইনি মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, ইঁহাকে চিরজীবন দুঃখ-ভোগই করিতে হইবে। সুরভির বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। প্রভো, স্নেহবশতঃ দুঃখিত চিত্তে আমি ইঁহার নিকট আসিয়াছি। কারণ সখীদেহ ও নিজদেহে কোনই পার্থক্য নাই। এই শোভনা যদি মনোমত বীর পতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমি প্রফুল্লচিত্তে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, হে মহামতে! আপনি কে? এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনি কি দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, অথবা পন্নগ কিম্বা উরগ? কারণ, মানুষ এখানে আসিতে পারে না এবং মানবের দেহ এরূপ হয় না। অতএব আমি যেমন আপনাকে সমস্ত সত্য বলিলাম, আপনিও তদ্রূপ সমস্ত সত্য বলিয়া আমাদের সমুৎসুকচিত্তকে প্রকৃতিস্থ করুন।

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, হে অমলপ্রজ্ঞে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতেছি। আমি রাজা শত্রুজিতের তনয়। হে কল্যাণি, দানবের হস্ত হইতে মুনিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, আমি পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, গালবমুনির আশ্রমে সমাগত হই। সেখানে আমি ধনুর্ব্বাণহস্তে ধর্ম্মচারী মুনিদিগের তপোবন রক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময়ে কে শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে এবং তপোবন বিধ্বস্ত করিতে সমুপস্থিত হইল। আমি অর্দ্ধ-চন্দ্রবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলাম। সে আহত হইয়া প্রাণভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিল। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। দানব নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক গর্ত্তমধ্যে আসিয়া নিপতিত হইল। আমিও অশ্বসহ সেই ভূগর্ভে নিপতিত হইলাম। কিন্তু সেই শূকররূপী দানবকে আর দেখিতে পাইলাম না। একাকী সেই রন্ধ্রপথ অতিক্রম করিয়া যখন প্রকাশ্যস্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম, তখন এই মনোহর সুবর্ণপুরী আমার নেত্রপথে ভাসমান হইল। আমি বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে সেই দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময় শতগুণ বৃদ্ধি হইল, যখন আমি দেহধারী একটী জীবকেও এখানে দেখিতে পাইলাম

না। যাহা হউক, আমাকে অধিকক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিতে হইল না। পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনাকে জিজ্ঞাসা করায়, আপনি যখন কোন উত্তর দিলেন না, তখন আমি আপনার অনুসরণ করিয়া এই মনোহর প্রাসাদে উপস্থিত হই। হে হাস্যবদনে, আমি দেবতা, দানব, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নর কিছু নহি—আমি মানব। হে কুণ্ডলে, দেবাদি সকলে আমার বন্দনীয়। আমি মনুষ্য, আপনারা কোন বিষয়ে শঙ্কা করিবেন না।

নাগতনয়েরা তখন বলিলেন, হে তাত. এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই ললনা-কুলভূষণ মদালসা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সলজ্জভাবে সখীর সুন্দর আনন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছু বলিলেন না।

সখী কুণ্ডলা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মদালসাকে বলিলেন, হে সুরভি-বচনানুগামিনী, ইনি যথার্থই বলিয়াছেন। পরে কুবলয়াশ্বকে বলিলেন, হে বীর, আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য, এবং সংশয়বিরহিত। নতুবা আপনাকে দর্শন করিয়াই সখীর হৃদয় আপনাতে এতদূর স্থিরতা লাভ করিবে কেন? দেখুন, অধিক কান্তি চন্দ্রকেই পাইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্য ধন্য ব্যক্তিকেই লাভ করে, ধৃতি বীরকেই প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষমা উত্তমেরই হইয়া থাকে। অতএব আপনি যে সেই দানবাধমকে বিদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গো-মাতা সুরভি কখনই মিথ্যা বলিবেন না। আপনার সহিত এই আকস্মিক সম্বন্ধ হওয়ায় সখী ধন্য ও ভাগ্যবতী হইয়াছেন। সুতরাং হে বীর-পুরুষ, বিধি অনুসারে সময়োচিত কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হউন।

রাজকুমার বলিলেন, আমি পরাধীন, পিতৃ-আজ্ঞা ব্যতীত আমি এই বালাকে কিরূপে বিবাহ করিব?

কুণ্ডলা বলিলেন, আপনি ইহা বলিবেন না, ইনি দেবকন্যা, ইঁহাকে বিবাহ করুন।

রাজপুত্র তখন তথাস্তু বলিলেন।

সমস্ত স্থির হইয়া গেল। মদালসা স্বীয় কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করিলেন। তুম্বুরু স্মরণমাত্রে সমিধ্ ও কুশ গ্রহণ করিয়া, সেই মুহূর্ত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দান করিয়া বৈদিক বিধানানুসারে মদালসা ও কুবলয়াশ্বকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। এবং উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় আশ্রমে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।

তখন সখী কুণ্ডলা মদালসাকে বলিলেন, হে সখি, হে বরাননে, তোমাকে ইঁহার সহিত মিলিত দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। যাহাতে পুনরায় আমাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইতে না হয়, তজ্জন্য তীর্থরূপ জলে পাপ ধৌত করিয়া, একান্তচিত্তে তপস্যাচরণে রত হইব।

এইরূপ বলিয়া কুণ্ডলা সখীর স্নেহে অভিভূতা হইয়া রাজনন্দনকে বলিলেন, হে অমিতজ্ঞানসম্পন্ন, সুধীগণও আপনার ন্যায় কৃতী পুরুষকে উপদেশ দিতে অসমর্থ। আমি নারীজাতি, আমার ত কথাই নাই। আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না। কিন্তু সখীর স্নেহে আমার মন অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছে, এবং আপনার সহিত অসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিবার অধিকার পাইয়াছি, সেইজন্য, হে অরিসূদন, আপনাকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করাইয়া দিতেছি। শাস্ত্রে লিখিত আছে ঃ—পতি ভার্য্যাকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ভার্য্যা পতির সহায় হইলে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের সম্যক্‌সিদ্ধি হয়। ভার্য্যা ও স্বামী উভয়ে যখন পরস্পরের প্রেমে বশীভূত হয়, তখনই ধর্ম্মার্থ কামের সঙ্গতি হয়। ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ভার্য্যাতেই সমাহিত। সেইজন্য পুরুষ ভার্য্যা ব্যতীত কখনই ধর্ম্মার্থকাম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আবার ভার্য্যাও তদ্রূপ স্বামী ভিন্ন ধর্ম্মাদি সাধনে অক্ষম হয়। কারণ, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সম্যক্‌রূপে দাম্পত্যজীবনকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হে রাজনন্দন, ভার্য্যা না থাকিলে কেবল পুরুষ দেবতা, পিতা মাতা, ভৃত্য ও অতিথিদিগের সেবারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষেরা উপার্জ্জিত অর্থ গৃহে আনয়ন করিলে, স্ত্রী না থাকিলে তাহা কে রক্ষা করে? যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে, তবে ত্রয়ীধর্ম্ম অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। মানুষ যদি সাধ্বী স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তবে পিতৃগণ, অতিথিগণ এবং দেবগণ সকলেই সৎকার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হন। আপনাদিগের উভয়ের নিকট আমি এই নিবেদন করিলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি যথা অভিলষিত স্থানে গমন করি; আশীর্ব্বাদ করি, আপনি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া, ধন পুত্র সুখ এবং আয়ু দ্বারা বর্দ্ধিত হউন।

কুণ্ডলা এই কথা বলিয়া সখীকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং কুবলয়াশ্বকে নমস্কার করিয়া স্বীয় ঈপ্সিতস্থানে গমন করিলেন।

কুবলয়াশ্ব মদালসাকে সেই দেবদত্ত তুরঙ্গে আরোহণ করাইয়া, পাতাল হইতে যেমন নিষ্ক্রান্ত হইবেন, অমনই দানবগণ কিরূপে জানিতে পারিয়া, সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। "পাতালকেতু স্বর্গ হইতে যে কন্যারত্ন আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে কে হরণ করিতেছে" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর পাতালকেতু দানবসৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিল। দানবগণ পরিঘ, খড়্গ, গদা, শূল ও বাণ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কুবলয়াশ্বের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর্য্যশালী শত্রুজিৎতনয় হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে তাহাদের অস্ত্রসমূহ স্বীয় শরজালে ছেদন করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে শত্রুগণের ভগ্ন অসি, শক্তি, ঋষ্টি ও বাণসমূহে রণভূমি পরিপূরিত হইল। দানবগণ অস্থির হইয়া ।　তদনন্তর ঋতধ্বজ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দানবদিগের প্রতি নিক্ষেপ করি-

লেন। সেই অগ্নি-উদ্‌গীরণকারী ভীষণ অস্ত্র পাতালকেতু সহ দানবগণের অস্থিনিচয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। এবং তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগরসন্তানগণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ঋতধ্বজ দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়া স্ত্রীরত্ন সহ অশ্বারোহণে পিতৃরাজ্যে আগমন করিলেন। এবং পিতৃ-চরণে প্রণিপাত করিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

মহারাজ শত্রুজিৎ আত্মজের ঈদৃশ চরিত্র ও বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন, এবং পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বৎস, যাঁহা দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ মুনিগণ ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, আমিও সেই কুলপাবন সৎপুত্রদ্বারা উদ্ধার হইলাম। বৎস, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে বীরত্ব ও চরিত্রের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং আমি যে খ্যাতি বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম, হে পরাক্রমশালী বীর, তোমাদ্বারা তাহা আবার শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখ, পিতা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত যশ, বল অথবা ধন যে রক্ষা করে সে পুরুষ মধ্যম। আর যে ব্যক্তি প্রভূত বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উহাকে আরও বৃদ্ধি করে, সুধীগণ তাহাকেই নরোত্তম বলিয়া থাকেন। এবং যে ব্যক্তি পিতৃ-অর্জ্জিত যশ, বল বা ধনকে নষ্ট করে, সে অধম পুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। আমি ত কেবল ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তুমি পাতাল গমন, অসুর বিনাশ এবং ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়া তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছ; অতএব তুমি উত্তম পুরুষ। হে পুত্র, তুমি কৃতী, তুমি ধন্য! তোমার মত গুণাধিক পুত্রকে লাভ করিয়া, আমি পুণ্যবান্‌দিগের মধ্যে শ্লাঘার যোগ্য হইয়াছি। যে ব্যক্তি পুত্রদ্বারা এবং স্বীয় দান ও বিক্রমদ্বারা আতিশয্য লাভ না করে, সে ব্যক্তি পুত্র থাকিলেও সুখী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতার নামে লোকসমাজে পরিচিত হয়, তাহাকে কৃতী পুরুষ বলা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্রদ্বারা খ্যাতি লাভ করে, সেই ক্ষণজন্মার জন্ম সার্থক! যে নিজের নামে পরিচিত হয় সেই ধন্য! যে মানব পিতৃপিতামহ দ্বারা খ্যাতি লাভ করে সে মধ্যম, আর যে মাতৃপক্ষ দ্বারা খ্যাত হয় সে নরাধম। বৎস, তুমি ধন, বল ও সুখে বর্দ্ধিত হও। আর এই গন্ধর্ব্বতনয়া যেন তোমার সহিত চিরসংযুক্ত থাকেন, কখনও বিচ্ছিন্ন না হন।

কুবলয়াশ্ব পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ স্নেহে গৃহীত ও আলিঙ্গিত হইয়া পত্নী সহ অন্তঃপুরে মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং পরে মদালসার সহিত মিলিত হইয়া পিতৃভবন, সুরম্য উদ্যান, বন উপবন এবং পর্ব্বতের সানুদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। আর সেই শুভময়ী সুমধ্যমা মদালসাও প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া স্বামী সহ বিহার করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

কমলকুটীর। গণেশপ্রসাদ।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২১শ ভাগ]　　চৈত্র, ১৩২২।　　[১২শ সংখ্যা।

বর্ষ-বিদায়।

বরষের শেষ আলো　　মূরছি পড়েছে
গগণের কোণে,
বিদায়ের শেষ গীতি　　পাখী কুহরিছে
কুসুমের বনে।
চাঁদের কিরণ-মাখা পাণ্ডু মুখখানি,
বিদায় মাগিছে হের আজি চৈত্ররাণী।

মৃত্যুর জড়িমা তার　　দুনয়ন ভরা
আঁখি-তারা ম্লান,
কূলে কূলে পূর্ণ আজি　　আঁখি অশ্রু-তারা
সাঙ্গ গীত গান।
শিথিল সে কেশবাস, শিথিল চরণ,
ছুটিয়া চলেছে সতী লভিতে মরণ।

জীবনের নেশা তার　　কোথা হল লীন
পলকের মাঝে,
জীবন দুয়ারে আজ　　বিদায়ের দিন
তাপসীর সাজে।
ত্যাগের এ দিন তার মরণের বেলা,
যেতে হবে ফেলে রাখি এই ধূলা খেলা।

নূতন অতিথি আসি　　লবে সে আসন
নব রূপ ধরি,
নব খেলা দেখাইবে　　দিবস নূতন
নব বিভাবরী।
ছাড়িতে হইবে আজ সকলের সীমা,
হের হের দাঁড়াইয়া ত্যাগের প্রতিমা।

কপালে পড়েছে তার　গোলাপী আলোক
স্বরগের হাসি,
মরণের ছায়া তার　　ঘিরে আছে চোখে
ভরি অশ্রুরাশি।
দিয়েছে বরষ ভরে—কত সুখ দুখ,
কারও প্রাণে হাসি, কারও ভেঙ্গে গেছে বুক

অতীতের কোন পারে　　চলেছে ছুটিয়া
লভিতে বিরাম,
নাহি জানি যেতে হয়　　কোন পথ দিয়া
কিবা তার নাম

সেথা বুঝি আছে শুধু শূন্যতা বিরাট,
তপস্যা তাহার রাণী—সন্ন্যাসী সম্রাট্।

আঁচল খসিয়া হের পড়িয়াছে ভূমে,
কিছু নাই আর
গোপন হৃদয় খানি, ঢুলে আসে ঘুমে
আঁখি-তারা তার।
লাভের খাতায় তার কিছু আর নাই,
কাতর নয়নে বলে যাই যাই যাই।

কবে কারে কাঁদায়েছে, কারে দেছে ক্লেশ,
নাই তার মনে;
যা কিছু করেছে, আজ সকলেরি শেষ
বিদায়ের ক্ষণে।
শোকের এ দিন শুধু কাঁদিবার বেলা,
ভুলিবার দিন আজ জীবনের খেলা।

এ ধরণী হতে তার আজিকার ছুটি,
নহে বর্ষ শেষ;
দেখেছি দেখেছি ভরি আঁখি-তারা ছুটি
বুঝিয়াছি বেশ।
ধরণীর বক্ষ হতে কন্যা তাঁর যায়,
এ যেনগো বিজয়ার উমার বিদায়।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মিউরিয়েল বেশ ভাল হইয়া সারিয়া গিয়াছে। আমরা এনডারলীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। পুরাণ জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া পুরাণ স্মৃতিতে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। আমার ও জনের ছেলেবেলার বন্ধুত্ব, আর এখন জন চার ছেলে মেয়ের বাপ!

এনাডারলীতে ফিরিয়া আসিয়া জন মিলের উন্নতিতে মনোযোগ দিলেন। কাজ হইতে ফিরিয়া প্রায়ই মিউরিয়েলকে কোলে লইয়া মিলের গল্প করিতেন।

একদিন সকালে আমরা তিনজনে বসিয়া আছি, হঠাৎ জন জলের স্রোতের (যাহা দ্বারা কল চালিত হইত) দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কিছু যেন হইয়াছে, জল এত কম মনে হইতেছে কেন?"

আমি বলিলাম, "আমিও দু ঘণ্টা ধরিয়া দেখিতেছিলাম যে জল কমিয়া আসিতেছে, ভাবিলাম হয়তো তুমি কোন কারণে জল বাহির করিয়া দিতেছ।"

জন। "তুমি কি পাগল! আমি জল বাহির করিয়া দিতে যাব কেন? তোমরা বস, আমি দেখিয়া আসি ব্যাপারখানা কি।"

জন দু ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, লর্ড

আমমোর যে শক্রতা করিয়া এতদূর করিবেন তাহা কখনও মনে করি নাই, নদীর স্রোতের মুখ খাল কাটিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "অসম্ভব! লোকে কি এতদূর শক্রতা করিতে পারে?"

জন। "ধনীর.গরীবের বিরুদ্ধে সব করাই সম্ভব। তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। জল বন্ধ হইলে কল চালান অসম্ভব। শুধু যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে যত কুলীদিগের কাজ যাইবে, এবং তাহার ফল-স্বরূপ আমার বিরুদ্ধে সব ক্ষেপিয়া উঠিবে" বলিতে বলিতে জনের গলা একটু বদলাইয়া গেল। মিউরিয়েল আস্তে আস্তে বাপের কাছে আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ মানে কি বাবা? আমার বাবাকে কি কেউ রাগিয়ে দিয়েছে?" ঘরে একটু গোলমাল হইলেই যেন শান্তিময়ী মিউরিয়েলের প্রাণে বাজিত।

জন ভাবিলেন, হায় বালিকা, আমি যদি সকল অবস্থায় তোমার মত নির্ব্বিকার থাকিতে শিখিতাম। বলিলেন, "জল বন্ধ হইলে আমি ইঞ্জিনের সাহায্যে কল চালাইব।"

কল প্রস্তুত আরম্ভ হইল। একদিন বিকালে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মনে হইল কে যেন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। উরসুল্লা আগন্তুককে ভিতরে ডাকিলেন। একটী রোগা পীড়িত ছেলে বাহির হইয়া আসিল।

উরসুল্লা। "কে লর্ড র‍্যাবনেল? তোমার এ বেশ ও এ দশা কেন?"

র‍্যাবনেল। "জানেন না আমি ক্যাথলিক বলে বাবা আমায় গেরেপ্তার করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনারা কি ক্যাথলিক?"

উরসুল্লা। "না, আমরা ক্যাথলিক নই, কিন্তু তুমি আমাদের বাসায় নির্ভয়ে থাকিতে পার।"

র‍্যাবনেল। "আপনি আমায় স্থান দিবেন? আমার পিতা যাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমায় আপন জনের মত ভালবাসিয়া স্থান দিবেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? আপনি মানবী, না দেবী?"

উরসুল্লার এই সময় কেরোলাইনের কথা "র‍্যাবনেল যেন জানিতে না পারে তাহার বোন—" মনে পড়িল।

সেই দিন হইতে সে যাওয়া আসা আরম্ভ করিল। ছোট্ট অন্ধ বালিকা মিউরিয়েলকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহাকে বাজনা শিখান তাহার যেন দৈনিক কাজ হইয়া গেল।

গ্রীষ্ম অবকাশে উরসুল্লা লংফিল্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য সব গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। মিউরিয়েল যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে মা বাবা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমার চক্ষে তাহা পড়িল।

উরসুল্লা একদিন মিউরিয়েলকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিলেন এবং তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে বারণ করিলেন। মিউরিয়েল কিন্তু খুব আনন্দিত হইল, বলিল, "মা, আমি চাই আমার একটী বোন হয়, আমি তার নাম রাখবো মড, সে কি আমার মত হবে? আহা নূতন বোন হলে তোমরা আমায় ভালবাসিবে তো?"

মিউরিয়েল সেই দিন হইতে মোজা ইত্যাদি বুনিতে আরম্ভ করিল। একটী মোজা শেষ হইয়াছিল, আর একটী মোজা অর্দ্ধ বোনা অবস্থায় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। মিউরিয়েল কোথায়?

জন মিউরিয়েলকে মার সাহায্য করিতে দেখিয়া খুব সুখী হইলেন, বলিলেন, "মিউরিয়েল মার বড় মেয়ে, বড় হইলে মার ডান হস্ত হইবে, কি বল ফিনিয়স?"

আমি উত্তর না দিয়া শুধু হাসিলাম। হায় জন, তোমার আশা কি পূর্ণ হইবে?

একদিন মিউরিয়েল বাজনার সহিত সুমিষ্ট স্বরে গাহিতেছিল—

"প্রভু, শেষ হয়ে গেলে, এসে কোলে নিও তুলে, বিরাম আর কোথায় পাইব—"

গান বন্ধ হইল। আমরা গানটী শেষ করিতে বলিলাম। সে বলিল, "আজকে নয়, আর একদিন শেষ করিব।"

তার পরদিন এন্‌জিনে কাজ আরম্ভ হইবার কথা। সকলে উৎকণ্ঠিত ভাবে এন্‌জিন চালান দেখিতে গেলাম, ঘস্ ঘস্ শব্দ করিয়া কাজ আরম্ভ হইল, জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল বলিয়া সকলেরই আনন্দ।

মিউরিয়েল বাপের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছিল। কাজ শেষ হইয়াছে। লংফিল্ডে যাইবার জন্য বারাণ্ডায় বসিয়া সকলে গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার শব্দ কানে আসিল।

সকলে চাহিয়া দেখিলেন, লর্ড লাক্সমোর আসিতেছেন। উরসুল্লার রাগে কান লাল হইয়া গেল, কিন্তু তিনি ছেলে মেয়ে লইয়া সেখানেই বসিয়া রহিলেন।

লাক্সমোর নমস্কার করিলেন, উরসুল্লাও প্রতিনমস্কার করিলেন। এই সময় ভাড়াটীরা চেঁচাইয়া উঠিল, "ভগবান্ আমাদের প্রভু মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্সকে চিরসুখী করুন।" উরসুল্লার মুখে আনন্দের হাসি বহিয়া গেল।

লর্ড লাক্সমোর বুঝিতে পারিলেন, লোকেরা জনকে কত ভালবাসে। বলিলেন, "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, লোকেরা অমন করিয়া চেঁচামেচী করিতেছে কেন?"

জন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার এন্‌জিন শেষ হইয়াছে, সে জন্য আনন্দ করিতেছে।"

লাক্সমোর। "শুনিলাম এই এন্‌জিনে তোমার খুব সুবিধা হইবে।"

জন। "হাঁ, আর আপনার জলের জন্য হাঁ করিয়া থাকিতে হইবে না, এখন আপনি আপনার স্রোতকে যে ধারে ইচ্ছা সেই ধারে লইয়া যাইতে পারেন।"

লাক্সমোর জনের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে উরসুল্লাকে ছাড়াইয়া গেলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, আর একবার বলিবেন কি ?"

জন। "আপনি স্রোত বন্ধ করিয়া আমার অনিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমার মঙ্গলই হইয়াছে, সেজন্য আমি আপনাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ দিতেছি।"

লাক্সমোর কিছু না বলিয়া হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইলেন।

জন। "হা ভগবান্, ছেলেরা যে রাস্তায় ঘোড়া চাপা পড়িবে" বলিয়া ছুটিলেন। গুই পাশের বাগানে ফুল কুড়াইতেছিল, মিউরিয়েলের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

ঘোড়া অন্ধ মিউরিয়েলের উপর দিয়া চলিয়া গেল। জন জীবনে এই একবার অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। লর্ড লাক্সমোর অতি দুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। জনের কানে সে সময় বজ্রের শব্দও বোধ হয় ঢুকিত না। আস্তে আস্তে মিউরিয়েলকে জলের কাছে লইয়া গিয়া জলের ঝাপটা দিলেন। জ্ঞান হইল। চোখ খুলিয়াই বলিল, "বাবা, আমি ভাল আছি।"

লাক্সমোর একটু আশ্বস্ত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। জনের কানে তাহা প্রবেশ করিল না। কিন্তু গুই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চলে যান এখান থেকে, না হলে মেরে ফেলবো, আপনি যদি আমার দিদিকে মেরে ফেলতেন, তাহলে আমিও আপনাকে মেরে ফেল্‌তাম !"

লাক্সমোর গুইর তেজ দেখিয়া হাসিয়া একটী গিনি দিলেন, গুই রাগ করিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মিউরিয়েল ডাকিল, "কে, গুই ? রাগ কোরো না ভাই।" দিদির ডাক গুইকে শান্ত করিয়া দিল।

সকলেই মিউরিয়েলের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, আঘাত সাঙ্ঘাতিক রকমের। লংফিল্ডে আর যাওয়া হইল না, আমরা এনডারলী ফিরিয়া আসিলাম। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। মিউরিয়েল উঠিতে কিম্বা কথা বলিতে চেষ্টাও করে না। "অসুখ করিতেছে ?" জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "না, কেবল ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

জন একদিন ছেলেদের ধমকাইয়া বলিলেন, "তোমরা দিদিকে একলা ফেলে সব চলে যাও কেন ? দিদির কাছে বসে সব খেলা কর।"

মিউরিয়েল। "বাবা, ওদের খেলা করতে দিন। আমি একলা শুয়ে থাকতে ভালবাসি।"

জন। "মিউরিয়েলকে একা চুপ করে বসে থাকতে দেখলে তার বাবার বড় কষ্ট হয়।"

মিউরিয়েল এবার উঠিতে চেষ্টা করিল। অতি কষ্টে নামিয়া দাঁড়াইয়া চেয়ার টেবিল ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু একটু পরেই চোখ উল্টাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। জন দৌড়িয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। এত দিন জন যাহা বুঝেন নাই আজ বুঝিলেন। মিউরিয়েলের—তাঁহার আদরের মিউরিয়েলের—উপর মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। অনেক রকম গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া রুক্ষভাবে বলিলেন, "ফিনিয়স, তুমি তোমার ব্যবহারে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে উরসুল্লাকে মিউরিয়েলের অবস্থা বুঝিতে দিবে না।"

আমি খুব শান্তভাবে দু চারটি কথা বলিয়া চুপ করিলাম। খানিক পরে দেখিলাম, জন বুক ফাটান স্বরে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্, শেষে মিউরিয়েলকেই—যাকে আমি সকল অপেক্ষা ভালবাসি—তুলে নেবে?"

আশ্চর্য্য হইলেও জগতে দেখা যায় যে, সকলের প্রিয় ও আদরের বস্তুটীই সর্ব্বাগ্রে চলিয়া যায়। শোকে চূর্ণ বিচূর্ণ আত্মা কাতরে লুণ্ঠিত হইয়া বলে, "মা, সব নাও, কিন্তু এটী নিও না"। কিন্তু পাষাণী মা শুনেও শোনেন না, দেখিতে দেখিতে আদরের জিনিষ চলিয়া যায়। আবার সেই মাকেই মা বলিয়া ডাকিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়। জীবনে সকল পরীক্ষার ভিতর ইহা এক কঠোর পরীক্ষা। এ রকম পরীক্ষায় যাঁহারা বলিতে পারেন, "বিনাশ কর, তবুও বলিব তুমি আমাদের মঙ্গলময়ী মা" তাঁহারাই ধন্য। ভগবান্ জনকে এরূপ বিশ্বাস দিয়াছিলেন।

উরসুল্লা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, মাঝে মাঝে বলিতেন, "ভগবানের প্রসাদে মিউরিয়েল অল্প দিনেই উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে।" জন ও ফিনিয়স তাঁহাকে মিউরিয়েলের কাছে বেশী যাইতে দিতেন না। এক সপ্তাহের ভিতর উরসুল্লার খুকী হইল। জন আহ্লাদের সহিত মিউরিয়েলকে খবর দিলেন।

মিউরিয়েল। "বাবা, আমার শুনে খুব আহ্লাদ হচ্ছে।"

জন। "তবে মা, তুমি অমন চুপ করে রয়েছ কেন?"

মিউরিয়েল। "বাবা, তোমার আর একটী মেয়ে হয়েছে, কিন্তু তুমি তোমার বড় মেয়েকে মনে রাখবে তো?"

জন। "ওকি কথা! তোমার ভালবাসার ভাগিদার এসেছে দেখে বুঝি তোমার হিংসা হয়েছে।"

মিউরিয়েল হাসিল। জন দেখিলেন, সে হাসি পৃথিবীর হাসি নয়।

মিউরিয়েল। "বাবা, আজকের তারিখ কি?"

"১লা ডিসেম্বর।"

"তাহলে মড আমার জন্মমাসে হয়েছে। আমার জন্মদিনে প্রত্যেক বারে বরফ পড়ে, এবারে হয়তো বা আমি বরফে ঢাকা থাকবো। আমার এগার বৎসর পূর্ণ হবে,

এবার মড যখন আমার বয়সের হবে, তত দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমি কুড়ী বৎসরের হইতাম ; কল্পনাও করতে হাসি পায়।" এইরূপ গল্প করিতে করিতে মিউরিয়েল ঘুমাইয়া পড়িল।

রবিবারে সকলে খাইতে বসিলেন। মিউরিয়েলের জায়গা কেন হয় নাই জিজ্ঞাসা করাতে জনকে বলা হইল, বরফ পড়িয়া বেশী ঠাণ্ডা পড়াতে তাহাকে নীচে আনা সঙ্গত মনে হইল না। সকলেই অবস্থা বুঝিলেন, কেহ আর কোন কথা বলিলেন না।

উরসুল্লা বল পাইয়াছেন। নূতন শিশু কোলে লইয়া আহ্লাদে নামিয়া আসিলেন, কিন্তু মিউরিয়েলের আসন শূন্য দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিউরিয়েলের কি কোন অসুখ করিয়াছে ? তোমরা তো কেহই আমায় কিছু বল নাই।"

জন। "কিছু বলবার মত তো হয় নাই।"

ধাত্রী আসিতেই উরসুল্লা তাহার কোলে খুকীকে দিয়া মিউরিয়েলকে দেখিতে চলিলেন। মিউরিয়েল মার পায়ের শব্দ পাইয়া "কে, মা, এসেছো" বলিয়া মার কোলে মুখ লুকাইল, আনন্দে শিশুর চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

উরসুল্লা মিউরিয়েলের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও নিজেকে আশ্চর্য্য প্রকারে দমন করিলেন, বলিলেন, "কেঁদ না মা, কাঁদলে শরীর খারাপ হবে।"

মিউরিয়েল। "মা, মড কোথায় ?"

মা অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, "কে ?"

মিউরিয়েল।—"মড, আমার বোন, যে আমার জায়গা লইবে।"

জন কঠোর ভাবে বলিলেন, "মিউরিয়েল, তুমি কি বকিতেছ ?"

মিউরিয়েল হাসিল। ধাত্রী মডকে মিউরিয়েলের কোলে তুলিয়া দিল। সে হাত বুলাইয়া বোনের মুখ দেখিল। মা বলিলেন, "মিউরিয়েল, তোমার বোন তোমার মত হয়েছে, কেবল চোখ দুটী নয়।"

মিউরিয়েল। "মড তার দিদিকে দেখছে তো ?"

গুই। "বা ! বা ! দিদি, খুকুটা কেবলই তোমায় দেখছে।"

এডবিন। "খুকু বুঝি দেখতে পাচ্ছে, তুমি তো দেখছি ভারী বোকা, বেরালের ছানারা কতদিন দেখতে পায় না, আমাদের খুকুরও এখন দেখবার শক্তি হয় নি।"

গুই। "তুমি দেখছি মহা পণ্ডিত !—"

মিউরিয়েল মডকে বুকে করিয়া শুইয়াছিল। সে ছোট ভাই বোনদের গল্প শুনিতেছিল, কিন্তু সময় সময় তাহাকে খুব অন্যমনস্ক লাগিতেছিল, যেন সে অদৃশ্য রাজ্যের কথা ভাবিতেছে। এখনও মনে পড়ে আজকের দিন কত আহ্লাদে সকলে এক ঘরে খাইলাম।

মিউরিয়েল মডকে পাশে শোয়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আমরা দেখিতেছিলাম দুই বোনের চেহারায় কত সাদৃশ্য।

ছেলেরা চাঁদ দেখিতেছিল, হঠাৎ গুই বলিয়া উঠিল, "ঐ যা! চলে গেল।"

জন বলিলেন, "দিদি ঘুমাচ্ছেন, চুপ কর।"

মিউরিয়েল। "মা আমি ঘুমুচ্ছি না, কে চলে গেল?"

জন। "চাঁদ।"

মিউরিয়েল। "মড একদিন চাঁদ দেখতে পাবে। মা, মডকে আজ আমার কাছে ঘুমাইতে দেও, কাল আমার জন্মদিন—" বলিতে বলিতেই যেন তার ঘুম আসিতে লাগিল।

উরসুল্লা। "মড ও আমি দুজনেই তোমার কাছে থাকবো, আর তোমার একলা থাকতে হবে না।"

জন। "মিউরিয়েল, গুই ও এডবিন কি বড় গোলমাল করছে? বলতো তাদের নীচে নিয়ে যাই।"

মিউরিয়েল। "না বাবা, আমি আজকের দিনটা সকলকে কাছে চাই, তুমি পড়, গুই আমার কাছে এসে বসবে, সে সর্ব্বদা তার দিদির কথা শুনে।"

গুই একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "না আমি কতবার শুনি নাই, কিন্তু বড় হলে নিশ্চয়ই দিদির সব কথা শুনবো।"

জন "জোসেফ ও তাহার ভাই" গল্প পড়িতে আরম্ভ করিলেন। উরসুল্লা মডকে কোলে লইয়া দুলাইতেছিলেন, এডবিন ও ওয়ালটার তাহাদের বড় বড় চোখ বাহির করিয়া বাবাকে দেখিতেছিল। পড়া শেষ হইল। বাবা বলিলেন, "এবার সব ঘুমাইতে যাও।"

গুই দিদিকে চুমু খাইয়া চলিল। সকলেই জানিত মিউরিয়েল গুইকে সব ভাই বোনের মধ্যে বেশী ভালবাসে।

সকলে ঘুমাইতে গেলেন। আমি ও জন সেদিন সমস্ত রাত্রি জাগিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। উরসুল্লাকে বেশ শান্ত দেখিয়া আমরা তার সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে জন বলিলেন, "ফিনিয়স, তোমার ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘুমুতে যাও এবার।"

আমি চলিয়া আসিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত আমার ভাল করিয়া ঘুম হইল না। স্বপ্ন দেখিলাম, মিষ্টার মার্চ্চ মারা যাইতেছেন; মিউরিয়েল যেন আমার নিকট দিয়া চলিয়া গিয়া টমের গৃহে ঢুকিল ও সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছে; ভোরবেলা মনে হইল কে যেন দরজা খুলিল ও দূর হইতে মিউরিয়েলের গান বাজনার শব্দ কানে আসিতে লাগিল।

আমি ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই ছেলেদের গলা শুনিলাম, গুই বলিতেছিল, "দিদির আজ জন্মদিন, চল ভাই সকলে ফুল তুলে নিয়ে যাই।"

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া কি দেখিলাম, দেখিলাম মডকে বুকে লইয়া আমাদের শান্তিময়ী চিরনিদ্রায় অভিভূত। কি সুন্দর মূর্ত্তি!

সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনে বৈঠকে বসিয়াছিলাম, ছেলেরা ঘুমাইতে গিয়াছিল। উরসুল্লা মডকে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। জন মায়ের প্রাণের বেদনা বুঝিলেন, বলিলেন "উরসুল্লা, মডকে আমার কোলে দেও, তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে।"

উরসুল্লা। "না, না, ওকে আমার কাছে থাকতে দেও, ও কোলে থাকলে আমি অনেকটা ভুলে থাকি"।

আর কথা সরিল না, মায়ের প্রাণের গভীর বেদনা উথলিয়া পড়িল। জন উঠিয়া উরসুল্লার পাশে দাঁড়াইলেন—জনের বেদনা ভাষা-বিহীন।

উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। যেন মনে হইতেছিল, দুইটী প্রাণ এক হইয়া এ গভীর শোক সম্বরণের জন্য ভগবৎ চরণে বল ভিক্ষা করিতেছে।

এই সময় র‍্যাবনেল ঢুকিল। হায়! বালক, তুমি মিউরিয়েলকে কত ভালবাসিতে।

মা বাবা দুজনেই ডাকিলেন, "এস এস ভিতরে এস।"

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই কাঁদিলাম। তারপর উরসুল্লা মিউরিয়েলের চলিয়া যাওয়ার গল্প বলিলেন। মায়ের মুখে গভীর শোকের কাহিনী শুনিতে কি মিষ্ট।

তারপর সকলে মিউরিয়েলের দেহ দেখিতে চলিলাম। গুইয়ের ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। র‍্যাবনেল একবার পাগলের মত বলিল, "আমার ছোট্ট মিউরিয়েল, তুমি চলিলে?" তারপর ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। মা তাহার পেছনে পেছনে বাহিরে গেলেন।

জন ফিরিয়া আসিলেন, ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিলেন, জানিতেন না আমি ঘরে ছিলাম। তারপর নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে মূর্ত্তি দেখিলেন, শেষে হাঁটু গাড়িয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা আমার, আমার চখের মণি, তোকে যে আমি পৃথিবীতে সকল অপেক্ষা ভালবাসি, আমায় একা ফেলে চলে যাস্ নি, বাবার কোলে ফিরে আয়।"

কিন্তু কই মিউরিয়েল—যে বাবার একটুও কষ্ট দেখিতে পারিত না—তো আজ বাবার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ছেলে মেয়েরা সব বড় হইয়াছে। এডবিন, মড সকলেই বিবাহিত। কেবল গুই

অবিবাহিত। গুই যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তাহার সঙ্গে এডবিনের বিবাহ হইল। গুই যুদ্ধে চলিয়া গেল। অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহার চেহারায় আর চঞ্চলতা নাই। ঠিক মায়ের ছোট্ট ছেলের মত মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বলিল, "মা, তোমার গুই ফিরে এসেছে, তুমি আর ভাববে না, তোমার সব অসুখ এবার ভাল হয়ে যাবে তো ? আমি আর কখনও তোমায় ছেড়ে যাব না।"

এই সময় এডবিনের ছোট্ট মেয়ে লুইসা আসিয়া জেঠার কোলে উঠিয়া বসিল। র‍্যাবনেল ও মড আসিল, র‍্যাবনেল জনের জামাই।

আজিকার মিলন কত আনন্দের মিলন। কিন্তু কথা বলিতে বলিতে জনের চেহারা হঠাৎ বদলাইয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি একটী ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, কেবল আমি সঙ্গে ছিলাম। একটু সামলাইয়া বলিলেন, "ফিনিয়স, ভয় পাইও না, কিন্তু আজ তোমাকে একটা কথা বলিব, আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচিব না, হয়তো কোন দিন হঠাৎ তোমার বাবার মত চলিয়া যাইব। আমার এ অসুখ অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু আমি কখনও কাহাকেও বলি নাই। জানি আমাদের উভয়ের বন্ধুত্ব খুব গভীর। তুমি ভগবানের কৃপায় এ শোক সম্বরণ করিতে পারিবে, কিন্তু উরসুল্লাকে বলিতে আমার সাহস হয় নাই। তিনি প্রায়ই ভুগিতেছেন, আমার প্রাণের প্রার্থনা, তিনি আমার আগে চলিয়া যান, তারপর আমি যাইব। ফিনিয়স, এ সব কথা বলিতেছি বলিয়া কি তোমার বেদনা হইতেছে ?"

"না, না, বল।"

জন। "ফিনিয়স, মানুষের স্বভাব প্রাণের বেদনা কাউকে না কাউকে বলিতে ইচ্ছা করে ; যে সকল অপেক্ষা দৃঢ়চিত্ত, সকল বুঝিয়াও অটল থাকিবে, তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া সব বলিতে ইচ্ছা করে। আমি আমার অবস্থা জানি বলিয়া কখনও একলা বাহির হই না, এই দেখ কখন কি হয় বলিয়া আমি কার্ডে লিখিয়া রাখিয়াছি, 'বাড়ী গিয়া অতি সাবধানে আমার স্ত্রীকে এ শোক সংবাদ জানাইবে।' যাক্, ফিনিয়স, কে বলিতে পারে, হয়তো আমি অনেকদিন বাঁচিব। ভগবানকে ধন্যবাদ, গুই বাড়ী ফিরিয়াছে, উরসুল্লার আর কোন রকম ভাবনা নাই। এবার চল আমরা ঘুমুতে যাই।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ দেশে কিসের আনন্দধ্বনি ? চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল, আজ ইংরাজ জাতি দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া ঘরে ঘরে এত আনন্দ। সকলেই গৃহের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাজাইতেছিলেন, উরসুল্লা লুইসাকে সাজাইয়া দিলেন। এডবিন, তাহার স্ত্রী, মড ও র‍্যাবনেল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গুইও একটী মহিলার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তাহার চেহারাও আনন্দে পরিপূর্ণ।

জন দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উরসুল্লা দেখছো কি, ছেলেমেয়েরা সব বড় বড় হয়েছে নিজের নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছে ও নিচ্ছে. এবার দেখছি তুমি ও আমি একলা পড়িব ”

উরসুল্লা হাসিয়া বলিলেন, "সে তো খুব আনন্দের কথা, ওরা সব সুখে থাক এই প্রার্থনা।" জন সমস্ত দিন উরসুল্লার সঙ্গে অনেক কথা বলিলেন। বিকালবেলা ক্লান্তভাবে হাতজোড় করিয়া, টুপিটা চোখের কাছে টানিয়া, বিশ্রামের জন্য চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া আর কিছু বলিলাম না, কেবল নিজের গায়ের কাপড় ঢাকা দিয়াছিলাম, জন একবার চোখ খুলিয়া হাসিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। জন ঘুমাইতে লাগিলেন, আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। খানিক পরে মড ও র‍্যাবনেলকে আসিতে দেখিয়া বলিলাম, "বাবা ঘুমাইতেছেন, খুব আস্তে এস।" আমরা তিনজনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, তারপর "বাবার ঠাণ্ডা লাগিবে, এবার জাগিয়ে ভিতরে নিয়ে যাই" বলিয়া মড উঠিয়া বাবার জোড়হাতটী স্পর্শ করিল। কিন্তু এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল কেন? আমি গিয়া জনের টুপী সরাইলাম বুঝিলাম, দেখিলাম, জন আমাদের ফেলিয়া অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন।

উরসুল্লা শুনিলেন। চোক বুজিয়া মৃতের মত বিছানায় শুইয়াছিলেন, কিন্তু কি শান্তমূর্ত্তি! ছেলে মেয়েরা মায়ের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়াছিল।

আমার কানে বাজিতেছিল, "ফিনিয়স, আমার বন্ধু, আমার ভাই, তোমাকে অল্প-দিনের জন্য একলা ফেলিয়া চলিলাম, তুমি শীঘ্র এস।"

আমি চুপ করিয়া বসিয়া জনের দেবমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। মিউরিয়েলের মুখের সঙ্গে জনের মুখের সঙ্গে কত সাদৃশ্য। এই সময় কে যেন আসিয়া আমায় স্পর্শ করিল, চাহিয়া দেখিলাম উরসুল্লা। জানি না তিনি কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন, তিনি তো এক পাও চলিতে পারিতেন না, এতদূর আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া জনকে দেখিতেছিলেন।

আমি বসিবার জায়গা করিয়া দিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে উরসুল্লা বলিলেন, "ফিনিয়স, দেখতো ভাই, বোধ হয় ছেলেরা আসিতেছে।"

গুই আসিয়া মার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, "মা, বাড়ী চল।"

উরসুল্লা। "যাব বৈকি, এস সকলে তোমার পিতাকে দর্শন কর।"

সকলে বাপের চারিদিকে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু মার চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই, তিনি বলিতেছিলেন, "যখন আমি তোমার বাবার সঙ্গে মিলিত হই তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, আগামী মাসে আমাদের বিবাহের তেত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইত। আমরা খুব সুখী দম্পতি ছিলাম। তিনি শুধু আমায় ভালবাসিতেন না, আমার ভাল করিয়াছিলেন। তাঁহার ভালবাসা আমার শক্তি, আশা, শান্তি আনিয়া দিত। আমরা

পরস্পরকে পৃথিবীর সকল অপেক্ষা ভালবাসিতাম এবং আমাদের ভালবাসা উভয়কে ভগবৎ চরণে এক করিয়া দিয়াছিল। তোমাদের মার একটী প্রার্থনা চিরদিন স্মরণে রাখিবে—বাবার জীবন চিরদিন সম্মুখে রাখিয়া সকলে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কন্যা হইতে চেষ্টা করিবে।"

সকলেই মাকে ঘিরিয়া চুম্বন করিল। উরসুল্লা যেন মিউরিয়েলকে একবার খুঁজিলেন, তারপর বলিলেন, "মিউরিয়েলের কত আনন্দ, সে তার বাবাকে পাইয়াছে।"

গুই ফুঁফাইয়া বলিতেছিল, "মা, আমার মা, বাড়ী চল।"

মা গুইকে—তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে—আর একবার চুমু খাইলেন, তারপর বলিলেন, তোমরা সব বাহিরে যাও। আমরা সকলে বাহিরে আসিলাম, দূর হইতে কানে উরসুল্লার কাতর ডাক বাজিল, "জন, জন!"

আমরা বাহিরে বসিয়াছিলাম। কোন সাড়া শব্দ নাই, শেষকালটা গুই খোঁজ লইবার জন্য ভিতরে ঢুকিল। মা বাবার পাশে শুইয়াছিলেন। গুই ডাকিল, "মা, ওমা!" কিন্তু তার মা যে তখন অমরপুরে তার বাবার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

সমাপ্ত।

NURSING অর্থাৎ সেবা শুশ্রূষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেবাকারীর কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ চিকিৎসক সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ রোগীর সম্বন্ধে। চিকিৎসকের উপর সেবাকারীর বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা দরকার, তাহা না হইলে চিকিৎসকের আদেশ সকল সম্যক্‌রূপে পালন করিবার ইচ্ছা হয় না এবং অনিচ্ছায় কোন কার্য্য করিলে তাহা কখনও সুসম্পন্ন হয় না।

চিকিৎসকের আদেশের উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া রোগীর সেবা করিলে তাহা অতি সুচারুরূপে সাধিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিকিৎসকের আদেশগুলি প্রত্যহ একটী কাগজে লিখিয়া লওয়া উচিত। নিজের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিলে অনেক সময়ে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে এবং তাহাতে সেবাকার্য্যের বিঘ্ন হয়। আদেশগুলি লিখিত থাকিলে তদনুসারে কার্য্য করা অতি সহজ হয়। ইহাকে Routine অর্থাৎ রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের আদেশাবলী বলা যায়। ইহার একটী

উদাহরণ লিখিত হইতেছে। Routine অর্থাৎ রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের আদেশাবলী :—

প্রাতে ৭ ঘটিকায় মিক্শ্চার ১ দাগ।

৮ ঘটিকায় দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, বার্লী অর্দ্ধপোয়া, চিনি।

১০ ঘটিকায় মিকশ্চার ১ দাগ।

১২ ঘটিকায় ঈষৎ উষ্ণজলে গা মোছান।

১২ ঘটিকায় অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ, অর্দ্ধপোয়া বার্লি, চিনি।

১ ঘটিকায় মিকশ্চার ১ দাগ।

৩ ঘটিকায় ফল—ডালিম প্রভৃতি।

৪ ঘটিকায় মিকশ্চার ১ দাগ।

৫ ঘটিকায় অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ, অর্দ্ধ পোয়া বার্লী, চিনি।

৭ ঘটিকায় মিকশ্চার ১ দাগ

৯ ঘটিকায় দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া, বার্লী অর্দ্ধপোয়া, চিনি।

১০ ঘটিকায় মিকশ্চার ১ দাগ।

৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর টেম্পারেচার লইতে হইবে এবং ১০৩এর উপর যতক্ষণ জ্বর থাকিবে, ততক্ষণ ice bag দিতে হইবে। আর একটী কাগজে চিকিৎসককে জানাইবার জন্য রোগীর দৈনিক বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে Daily Report বা দৈনিক বিবরণ বলা হয়।

চিকিৎসক রোগী দেখিতে আসিলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, "সে কেমন আছে?" প্রথমতঃ যদি সম্ভব হয়, রোগীর মুখে তাহার অবস্থা জানিতে চেষ্টা করেন, পরে রোগীর আত্মীয়দের নিকটে অথবা যাঁরা তাঁর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের নিকটে রোগীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন; সুতরাং সেবাকারীরা যদি এই বিবরণ পরিষ্কাররূপে লিখিয়া রাখেন, তাহা হইলে চিকিৎসককে জানাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। এই বিবরণে চিকিৎসকের আদেশ গুলি কিরূপে পালিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন সকল লিখিত থাকা উচিত। পরে সেবাকারীর এই সকল বিষয়ের উপর মন্তব্য অর্থাৎ কি কি বিষয়ে তাহার অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সেবাকার্য্যে আরও সুবিধা হইতে পারে এই সকল মতামত চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিতে পারেন। সুতরাং এই বিবরণটী কথঞ্চিৎ সুবিস্তৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যতদুর সম্ভব সরলভাবে এবং সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে তাহা করা উচিত। এই বিবরণে ঔষধ সেবন, পথ্য গ্রহণ, শরীরের উত্তাপ নিরূপণ, মলমূত্র ত্যাগ এবং রোগীর অন্যান্য অবস্থার বিষয় লিখিত থাকে। চিকিৎসক আসিয়া এই বিবরণ দেখিয়া এবং রোগীকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তাহার নূতন ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন। এই ব্যবস্থাগুলি সেবাকারীর পুনরায় লিখিয়া লওয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করা উচিত।

আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় যে, অনেক বন্ধুবান্ধব রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, কিন্তু অনেক সময়ে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। সেবাকারীকে এই বন্ধুদিগের আগমন কথঞ্চিৎ নিয়মবদ্ধ করিতে হয়। চিকিৎসকের আদেশ অনুসারে তিনি এই সকল সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা ও সাক্ষাতের সময় নিয়মবদ্ধ করিয়া লইবেন। যদিও রোগকাতর অবস্থায় আত্মীয়তা ও সহানুভূতি মনের তৃপ্তিসাধন করে, তথাপি অনেক সময়ে তাহার পরিমাণ নিয়মিত না হইলে রোগীর পক্ষে বিরক্তিকর, ক্লেশদায়ক ও ক্ষতিজনক হয়। হঠাৎ কাহাকেও রোগীর ঘরে ঢুকিতে দেওয়া উচিত নয়, বিশেষতঃ যদ্যপি তাহার আগমনে রোগীর মনের কোনও প্রকার উত্তেজনার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময়ে রোগীর মনের ভাব ও শরীরের শক্তি বন্ধু সাক্ষাতের উপযোগী থাকে না. এই সকল বিষয়ে সেবাকারীর বিচারশক্তি বিশেষ প্রয়োজন। অথবা তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে যেন কোনও কাজ না করেন।

রোগীকে বন্ধুর নাম আগে জানান উচিত, পরে তিনি আসিতে বলিলে তবে সেই বন্ধুকে যেন আনা হয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, রোগী সব বন্ধুর আগমন ও সাক্ষাৎ প্রীতিকর মনে করেন না; সুতরাং রোগীকে আগে জানান বিশেষ প্রয়োজন। রোগীর সম্মুখে এরূপে বসিতে দেওয়া উচিত, যাহাতে বন্ধুর সহিত কথা কহিতে অথবা চোখো চোখী হইতে রোগীর কোনও পকার কষ্ট না হয়।

আগন্তুক ব্যক্তি রোগীর বিছানায় বসিবেন না। কিম্বা ঝুঁকিবেন না। কোনও প্রকার কষ্টদায়ক বিষয়ের আলোচনা করিবেন না। যাহাতে রোগীর মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করে, সেই সকল বিষয়েই গল্প করিবেন এবং যখনি রোগীর বিরক্তি অথবা শ্রান্তি হইতেছে দেখিবেন, তখনি বিদায় লইবেন। বিদায় লইবার সময় অধিক আড়ম্বর বা বিলম্ব করিবেন না। একসঙ্গে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া উচিত নয়, কিম্বা দিনের ভিতর অধিকবার ক্ষণে ক্ষণে রোগীর সাক্ষাৎকারীদের আগমন অতিশয় বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক। সাক্ষাৎকারীরা যতদূর সম্ভব শান্তভাবে ও মৃদুস্বরে রোগীর সহিত আলাপ করিবেন। কোনও প্রকারে রোগীকে উত্তেজিত হইতে দিবেন না এবং নিজেও উত্তেজিত হইবেন না। সাক্ষাৎকারী চলিয়া গেলে রোগীর অবস্থাপরিবর্ত্তন, কোনও পকার উত্তেজনা অথবা বিরক্তি ও শ্রান্তি হইয়াছে কি না সেবাকারীর দেখা উচিত। এই সকল পরিবর্ত্তন রোগীর পক্ষে হানিকর, কিন্তু অনেক সময়ে যে সকল রোগীর মনের অবস্থা কোনওরূপ বিশেষ শারীরিক কারণ ব্যতিরেকে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কাছে বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া যদি প্রফুল্লতা ও মনের জোর আনিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ

উপকার হয়। সেই জন্য এই প্রকার অবস্থাপন্ন রোগীদের নিকট উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবদের আগমন অতীব বাঞ্ছনীয়। যখন বন্ধুসাক্ষাতে উত্তেজনা নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন ও কারণে রোগী অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ করে, তখন সেবাকারীর তাহাকে কোনওরূপ বলকারক খাদ্য (গরম দুধ) দেওয়া উচিত। রোগীর খাবার সময়ে কিম্বা ঘুমাইবার সময়ে বন্ধুবান্ধবদের আগমন নিষিদ্ধ। তবে যদি এমন কোনও বন্ধু হন, যাঁর আগমনে রোগীর পথ্য বা ঔষধ সেবনে অথবা নিদ্রায় সহায়তা হইতে পারে, সেইরূপ বন্ধুকে আসিতে দেওয়া যাইতে পারে। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গৃহে বন্ধুবান্ধবদিগের আগমন আরও অধিকতররূপে নিষিদ্ধ। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাবধান না হইয়া এই সকল রোগীকে দেখিতে আসা বিপজ্জনক। এই সম্বন্ধে যখন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সেবার কথা বলা হইবে, তখন আলোচনা করা যাইবে।

সেবাকারীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য রোগীর সম্বন্ধে। প্রথমতঃ রোগীর গৃহসম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। রোগীর আরাম ও স্বচ্ছন্দতা যে কেবল গৃহের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, অনেক সময়ে রোগের আরোগ্যসাধনও ইহার উপর নির্ভর করে। ঘরটী বেশ প্রশস্ত উচ্চ এবং শীতল হওয়া উচিত। ইহার অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা জানালা থাকা উচিত। তাহা না হইলে যথেষ্টরূপে বায়ু গমনাগমন হয় না। রোগীর ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে আলো এবং রৌদ্র আসিবার উপায় থাকা দরকার, কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঘরটীকে অন্ধকার অবস্থায় রাখিবার প্রয়োজন হইতে পারে। আলো ও রৌদ্র যখন দরকার নয়, তখন পর্দ্দার দ্বারা বন্ধ করিবার উপায় যেন থাকে। সামনাসামনি জানালাগুলি যেন এরূপ ভাবে থাকে যাহাতে ঘরের বায়ুপরিবর্ত্তন ঠিকরূপে হইতে পারে ; কিন্তু রোগীকে এরূপ জায়গায় রাখা উচিত, যাহাতে তাহার উপর দিয়া হঠাৎ কোনওরূপ ঠাণ্ডা বাতাস না যাইতে পারে। ঘরটী একটু প্রশস্ত এবং জানালা দরজাগুলি সংখ্যায় একটু বেশী হইলেই এইরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। রোগীর ঘর সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ দিতে হয়।

প্রথমতঃ ঘরটী পছন্দ করা এবং তাহাকে রোগীর বাসোপযোগী করা। এই ঘরটী বাড়ীর মধ্যে কোনও একটী নিরিবিলি স্থানে হওয়া উচিত। তাহা হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোকদের কাছথেকে এবং বাড়ীর গোলমাল হইতে অনেক দূরে হইবে। বিশেষতঃ সংক্রামক রোগের সময়ে ইহা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু অন্যান্য রোগেও রোগীকে বাড়ীর গোলমাল হইতে যতদূর স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে, ততই তাহার আরাম হয়। রোগীকে ঘরে আনিবার পূর্ব্বে ঘরটীকে যথেষ্টরূপে পরিষ্কার করা উচিত। প্রথমে ঘরের সমস্ত জিনিষগুলিকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, তার পরে ঘরটীকে পরিষ্কার করিয়া এবং ঘরের মেজেকে কিঞ্চিৎ ফেনিল মিশ্রিত জল দিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। তার পরে কেবলমাত্র রোগীর আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি

বেশ করে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া আবশ্যক হইলে ধৌত করিয়া ঘরে আনা উচিত। বিশেষতঃ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাখিবার সময় কিম্বা যদি কোনও রকম বড় অস্ত্রচিকিৎসা (operation) হইবার কথা থাকে, তাহা হইলে এই ঘর সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাবধান ও বন্দোবস্ত করিতে হয়। ঘরের দেয়ালগুলিকে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লওয়া উচিত। লম্বা বাঁশের উপর একটী ঝাঁটা বাঁধিয়া কিম্বা অল্প ভিজা কাপড় বাঁধিয়া উপর থেকে মেজে পর্য্যন্ত মুছিয়া লইতে হয়। এই কার্য্য বিশেষ সতর্কতার সহিত এবং আস্তে আস্তে করা উচিত।

কার্ণিশ এবং অন্যান্য খোঁচখাঁচ হইতে কিম্বা যে সকল আসবাব ঘর থেকে সরান বেশী কষ্টকর, তাহাদিগের উপর হইতে উত্তমরূপে ধূলা সকল ঝাড়িয়া ফেলা উচিত এবং পরে অল্প ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া লওয়া উচিত। ঘরের মেজেকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত, পরে কাপড় দিয়া মুছিয়া লওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব ঘরের ভিতর হইতে আসবাব সকল স্থানান্তরিত করা উচিত এবং কেবলমাত্র রোগীর জন্য যে কাপড়টী দরকার সেইগুলি পরিষ্কৃত করিয়া রোগীর ঘরে রাখা উচিত। পশমী জিনিষে গন্ধ এবং রোগের বীজ সকল অতি সহজে লাগিয়া থাকে এবং সেই সকল পরিষ্কার করা সহজ নয়, কিন্তু সূতী কাপড় এই বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ত। দরজা অথবা জানালার পর্দ্দার জন্য পশমী কাপড় ব্যবহার না করিয়া সূতী কাপড় ব্যবহার করা উচিত। ঘরের মেজের কোনও প্রকার কার্পেট না রাখাই উচিত, কিন্তু সতরঞ্চি পাতা যাইতে পারে, যেহেতু ইহা সহজে তুলিয়া ফেলা যাইতে পারে এবং ধৌত করা যাইতে পারে। রোগীর বিছানা এরূপভাবে রাখা উচিত, যাহাতে তাহার উপর দিয়া এবং নীচে দিয়াও বাতাস যাইতে পারে। বিছানার কোনও দিকই একেবারে দেওয়ালে লাগাইয়া দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে বায়ু গমনাগমনের এবং সেবাকারীদের যাতায়াতের সুবিধা থাকে। রোগীর ঠিক সাম্‌নে কোন জানালা না থাকিলেই ভাল। অনেক সময়ে বাহিরের আলো অধিক পরিমাণে লাগিলে বিরক্তি বোধ হয়। এই সকল কারণে রোগীকে মেজেতে না শোয়াইয়া একখানি খাটে কিম্বা চৌকীর উপর শোয়ানই সুবিধাজনক। অনেক সময়ে রোগীর জন্য আর একটী খাট এবং বিছানা পাশাপাশি রাখিলে ভাল হয়। ইহাতে বিছানা বদলের কিম্বা পরিষ্কার করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। রোগীর খাট বিছানা ব্যতিরেকে একটী প্রশস্ত টেবিল ঘরে থাকা দরকার। এই টেবিলের উপর ঔষধ পথ্যাদি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সুন্দররূপে গুছাইয়া রাখিতে হয়। যখন রোগী উঠিয়া বসিয়া খাইতে পারে, তখন তাহার জন্য আর একটী ছোট টেবিল রাখা দরকার। রোগীর ঘরে বসিবার জন্য ২.১ খানি চেয়ার থাকা আবশ্যক। এই আসবাবগুলি এমন ভাবে তৈরী হওয়া উচিত যে অতি সহজেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে এবং পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে।

যখন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্ত ব্যবহৃত হইবে, তখন তাহাদিগকে উত্তমরূপে Disinfect করিয়া লওয়া উচিত।

রোগীর জন্ত কাঠের তক্তপোষ অপেক্ষা লোহার খাট ভাল, কারণ ইহা সহজে এবং উত্তমরূপে ধৌত এবং পরিষ্কৃত করা যায়। নেয়ারের খাট বড়ই অসুবিধাজনক, কারণ নেয়ার অতি সহজেই আল্গা হইয়া যায় এবং ঝুলিয়া পড়ে; আর তাহার ভিতরে ছার-পোকা সকল অতি আরামে বাস করিতে থাকে, ইহাতে রোগীর যন্ত্রণার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। খাটখানি ৬৷৷০ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া হওয়া উচিত, ইহা অপেক্ষা অধিক বড় হইলে সেবাকারীর রোগীর কাছে পৌছান অসুবিধা হইয়া পড়ে। খাটের উপর একখানি ছোবড়া কিম্বা তুলার গদি পাতা থাকিবে, তার উপরে একটী পাতলা তোষক এবং তার উপরে চাদর বিছান থাকিবে। চাদরখানি বেশ বড়সড় হওয়া দরকার এবং গদির চারিদিকে বেশ উত্তমরূপে গোঁজা থাকা দরকার। কোনও খানে কোঁচকান না থাকে, ইহা সেবাকারীর বিশেষরূপে দেখা দরকার; চাদর কোঁচকান থাকিলে রোগীর গায়ে ফুটিতে থাকে এবং অনেক সময়ে Bed-sore করিয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে বিছানার উপরে গায়ে দিবার জন্য একখানি পাত্‌লা চাদর দরকার হইতে পারে, শীতকালে লেপ থাকাই উচিত। যখন লেপ ব্যবহৃত হইবে তখন তাহা সাদা কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া যেন থাকে, কারণ এই ওয়াড় মাঝে মাঝে ধৌত করিবার জন্ত বদলাইবার দরকার হয়। বালিশগুলি পরিষ্কাররূপে সাদা কাপড়ের ওয়াড় পরান থাকিবে। রোগীর খাটের তলায় বাক্স পেট্‌রা বাসন কোসন কিম্বা জুতা ইত্যাদি কোনও দ্রব্যই রাখা উচিত নয়। আমাদের দেশে একটী মশারী বিশেষ প্রয়োজন। মশারীটী সাদা net এর হইবে। চালটীও net এর হওয়া উচিত। এবং বিছানার চতুষ্পার্শ্বে উত্তমরূপে গোঁজা দরকার। বেশ চোস্তভাবে মশারী টাঙ্গান থাকিলে তাহার ভিতরে উত্তমরূপে বায়ুর গমনাগমন হয়। বিছানাটী, যেখানে বেশ উত্তমরূপে বায়ুর গমনাগমন হয়, ঘরের সেই স্থানে রাখা উচিত, কিন্তু যেখানে হঠাৎ জোর বাতাস কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস আসিবার সম্ভাবনা, সেখানে যেন না রাখা হয়। আজকালকার দিনে অধি-কাংশ ঘরেই ইলেকট্রিক ফ্যান হইয়াছে। রোগীকে এরূপ স্থানে শোয়ান উচিত, যেখানে Fanএর বাতাস খুব জোরে রোগীর গায়ে না লাগে; এই বিষয়ে অসাবধান হওয়ার জন্ত অনেকরূপ বিপদ হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের জানালা দিয়াই অধিক পরিমাণে বাতাস আসে। শীতকালে কেবল উত্তর দিকের জানালা দিয়া বাতাস আসে, সুতরাং রোগীর বিছানার বন্দোবস্ত করিবার সময় এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

সচরাচর রোগীর মাথা দেওয়ালের দিকে এবং পা ঘরের মধ্যস্থলের দিকেই রাখিলে সুবিধা হয়। কিন্তু রোগীর খাট কোন দিকেই যেন একেবারে দেওয়ালে লাগিয়া না

যায় এবং রোগীর ঠিক সামনেই কোন জানালা দিয়ে যেন বাহিরের আলো সহজে প্রবেশ না করে। রোগীকে এরূপ স্থানে রাখা উচিত, যেন ঘরের দরজা খুলিলেই বাহির হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া না যায়। রোগীর ঘর অতিশয় গরম কিম্বা অতিশয় ঠাণ্ডা রাখা উচিত নয়। শীতকালে অনেক সময়ে কোনও কোনও দেশে ঘরকে গরম করিবার প্রয়োজন হয়। একটী গামলায় কিছু কাঠ কয়লার আগুন করিলেই ঘর আস্তে আস্তে গরম হইয়া যায়। গুলের আগুন ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহাতে মাথা ধরে। আর ঘর গরম করিবার সময় সমস্ত দরজা জানালা যেন বন্ধ না করা হয়। আমাদের দেশে অনেক সময়ে কাঠের আগুন জ্বালিয়া ঘর গরম করিবার প্রথা আছে, কিন্তু তাহাতে এত ধোঁয়া হয় যে বড়ই কষ্টবোধ হইতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকারে কাঠের আগুনে কিম্বা গুলের আগুনে ঘর গরম করিবার সময়ে দরজা জানালা বন্ধ থাকিবার দরুণ রোগী এবং তন্মধ্যস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিসকল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি কখনও কখনও কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অধিকাংশ সময়ে সূতিকাগৃহেই এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে।

বাংলাদেশে সচরাচর দিনের বেলায় দরজা জানালা খুলিয়া রৌদ্র এবং বাহিরের উত্তপ্ত বাতাস ঢুকিতে দিলেই ঘর বেশ গরম হইয়া যায়। কেবল কোনও কোনও শীতপ্রধানদেশে ঘর গরম করিবার জন্য আগুনের দরকার হয়। অনেক জায়গায় এই উদ্দেশে চিম্‌নীযুক্ত আগুন রাখিবার স্থানের বন্দোবস্ত আছে। ঘর ঠাণ্ডা করিবারও অনেক সময়ে আবশ্যক হয়। পাখা, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, খস্‌খস্‌ টাট্টি প্রভৃতি এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীকে সেবা করিতে গেলে প্রথমে একখানি পাখা হাতে করিয়া তাহাকে বাতাস করা হয়, যেন এই পাখার বাতাসেই রোগীর অনেক যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। এই জন্য কোনও বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়েরা রোগীকে দেখিতে আসিলে তাড়াতাড়ী একখানি পাখা লইয়া রোগীর মাথার কাছে নাড়িতে থাকেন; ইহাতেই যেন তাঁহাদের আত্মীয়তা ও ভালবাসার নিদর্শনের পরাকাষ্ঠা হইল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, সেই সময়ে হয়ত রোগীর পাখার বাতাসের কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার আরাম না হইয়া বরং কষ্টই হইয়া থাকে। আবার অনেক সময়ে রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য কারণের শ্রান্তি নিমিত্ত সেবাকারীর হাতের পাখা রোগীর শিরে অথবা মুখের উপর ২।১ ঘা লাগিয়া যায়। এই পাখা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। আজকাল কলিকাতা সহরে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রোগীকে এই পাখার কাছ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখা আবশ্যক। কারণ ইহার হাওয়া তাহার গায়ে জোরে লাগিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক

রোগী মাথার উপর ফ্যান ঘুরিলে আপনা হইতেই ভয় পান, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনেক সময়ে বাহিরের সূর্য্যের তাপ এত প্রখর হয় যে, রোগীর ঘরকে আরামপ্রদ শীতল অবস্থায় রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সেই সময়ে দরজা জানালায় খস্‌খসের টাট্টী লাগান আবশ্যক হয়। কিন্তু এই খস্‌খসের টাট্টী সকল ঘরের বাহির দিকেই লাগান হয় এবং মাঝে মাঝে তাহাদের উপর জলসেচন করিতে হয়। ঘরের ভিতরে ভিজা টাট্টী থাকিলে রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে।

পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে আলোক দান করিলেন এবং ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। জীবনের সহিত আলোকের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মৃত্যুর সহিত অন্ধকারের সেইরূপ। রোগীর গৃহে এই কথাগুলি বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার। অতি অল্প-সংখ্যক রোগেতে রোগীর ঘরকে অন্ধকার রাখিবার আবশ্যক হয়। চক্ষু উঠিলে এবং কোনও কোনও মস্তিষ্কের ব্যারামে এবং বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় আলোক সহ্য করিতে পারে না। কোনও কোনও রোগী যন্ত্রণার সময়ে কিম্বা রাত্রিকালে নিদ্রাভাবে দিনের বেলায় ঘুমাইবার ইচ্ছায় ঘরকে অন্ধকার করিতে চায়। সেবাকারীর এই বিষয়ে তাহার সাহায্য করা উচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দিবসের প্রখর রৌদ্রতাপ অসহ্য হইয়া উঠে, তখন অনেক সময়ে দরজা জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু ঘর যদি খুব প্রশস্ত হয় তাহা হইলে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিবার আবশ্যক হয় না। রোগীর নিকটস্থ এবং ঠিক সামনের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অন্য জানালা দিয়া আলো আসিতে দেওয়া উচিত। অনেক সময়ে বাহিরের আলোক কিম্বা উন্মুক্ত আকাশ এবং সুবিমল জ্যোৎস্না দর্শনে রোগীর মনে প্রফুল্লতা জন্মে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, রোগী সমস্ত রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে এবং ক্রমাগত ঘড়ি গুণিতেছে, কখন অন্ধকার রাত্রির অবসান হইবে ইহাই ভাবিতেছে। যখন উষার আলো স্নিগ্ধ সমীরণের সহিত জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে তখনই তাহার রোগ-যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশম হয়, এবং সে কিয়ৎপরিমাণে আরাম ও শান্তি লাভ করে। উজ্জ্বল আলোকে রোগের বীজ সকল বৃদ্ধি পায় না, এবং আজকাল নানা রকম রংয়ের আলোকের দ্বারা অনেক রোগের চিকিৎসা হইতেছে। ইহাকে Finsen Light Ray's Treatment বলে। রোগীর গৃহে আলোকের উপকারিতার কথা সর্ব্বদাআমা-দের মনে রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী মদালসা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মদালসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

নাগরাজ-তনয়েরা বলিলেন, কিছুকাল গত হইলে, একদিন রাজা শত্রুজিৎ ঋতধ্বজকে বলিলেন, বৎস, তুমি বিপ্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। এবং এজন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন কর। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই ঘোটকে আরোহণ করিয়া, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণের তত্ত্ব লইবে। এবং তাঁহাদের সমস্ত বিঘ্ন বিপদ অপসারিত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে। শত শত পাপাচারী দুর্ব্বৃত্ত দানব আছে, তাহারা যেন তাঁহাদের তপস্যা এবং আশ্রমের বিঘ্নস্বরূপ না হয়।

ঋতধ্বজ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে মুনিদিগের আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের কুশলাদি অবগত হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের সমুদয় বাধা বিপত্তি নাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলে, প্রথমে পিতৃচরণ বন্দনা করিতেন। তৎপরে পূজাবন্দনা ও স্নানাহারের পর, দিবসের অবশিষ্ট সময় মদালসার সহিত অতিবাহিত করিতেন।

একদিন অশ্বারোহণে এইরূপ বিচরণ করিতে করিতে, তিনি যমুনাতটে এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং সসম্ভ্রমে মুনিকে অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, স্বীয় কুশল জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার ও রাজ্যের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কে?

ঋতধ্বজ মুনিগণকে রক্ষা করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া তত্ত্ব লইতেছেন—ইত্যাদি বিষয় অবগত হইয়া পাতালকেতু দানবের অনুজ তালকেতু ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যমুনাতটে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিল। এবং বৈর-নির্য্যাতনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ঋতধ্বজের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ ঋতধ্বজ সেই ছদ্মবেশী পাপাত্মার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। এই মুনিপুঙ্গব আর কেহ নহেন, স্বয়ং ছদ্মবেশী তালকেতু।

তালকেতু পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া রাজপুত্রকে বলিল, রাজকুমার, আমি যাহা বলিতেছি যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা সম্পন্ন করুন। হে সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি কখনও কাহারও প্রার্থনা ভঙ্গ করেন নাই। আমি যজ্ঞ করিব এবং অভিলষিত ইষ্টি (যজ্ঞাঙ্গ বিশেষ) ও অগ্নিচয়ন করিব, কিন্তু আমার দক্ষিণা দানের শক্তি নাই। অতএব হে বীর, সুবর্ণ দানের জন্য আপনার কণ্ঠভূষণ আমাকে দান করুন। প্রজাদিগের মঙ্গলকারক বৈদিক বারুণমন্ত্রদ্বারা বরুণদেব ও যাদঃপতিকে (সমুদ্র) জলমধ্যে স্তব

করিয়া, যতক্ষণ প্রত্যাবৃত্ত না হই, ততক্ষণ আপনি আমার আশ্রম রক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই আগমন করিব।

ঋতধ্বজ সেই মুনিরূপধারী দানবকে প্রণাম করিয়া স্বীয় কণ্ঠভূষণ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, আপনি প্রসন্নচিত্তে গমন করুন। আপনি যতক্ষণ না আসিবেন, আমি আপনার আশ্রম রক্ষা করিব, কোন ভয় নাই। আপনি নিরুদ্বেগে অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করুন।

নাগরাজসুতগণ বলিলেন, হে তাত, সেই মায়াবী তালকেতু রাজতনয়কে এইরূপ কুহকজালে বিজড়িত করিয়া, যমুনাজলে নিমগ্ন হইল। রাজনন্দন সেই মায়ারচিত আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তালকেতু নদী হইতে উত্থিত হইয়া, রাজা শত্রুজিতের নগরে গমন করিল। এবং তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলিল, মহারাজ, ঋতধ্বজ আমার আশ্রম সমীপে তপস্বীদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি এক দুরাত্মা দানবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য ব্রহ্মবিদ্বেষী অসুরকে নিধন করেন। পরে সেই পাপাত্মা দানব মায়াজাল বিস্তার করিয়া, শূলদ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে। তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া এই কণ্ঠভূষণ আমাকে প্রদান করিলেন। মহারাজ, আপনার পুত্র ধন্য! তপস্বীদিগকে দানবদিগের কবল হইতে রক্ষা করিতে করিতে সমরশায়ী হইয়াছেন। বনমধ্যে শূদ্র তাপসগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অগ্নিসৎকার হইয়াছে। সেই সাশ্রুলোচন আর্ত্তহ্রেষারবকারী অশ্ব দানবের হস্তগত হইয়াছে। মহারাজ, এই নৃশংস সমস্তই দেখিয়াছে। কিন্তু বিধির লিপি কে খণ্ডন করিবে? এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় সম্পাদন করুন। এবং এই হৃদয়াশ্বাসদায়ক কণ্ঠভূষণ গ্রহণ করুন। আমরা তপস্বী, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি?

তালকেতু এই সমুদয় কথা বলিয়া কুবলয়াশ্বের কণ্ঠভূষণ পিতৃহস্তে প্রদান করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

এই নিদারুণ শোক সংবাদ রাজা ও রাজমহিষীর বক্ষে অকস্মাৎ যেন শত শত অশনিপাত হইল। তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অন্তঃপুর-চারিণী রাজললনাগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। আকাশ ভেদ করিয়া শোকের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ শোকে মুহ্যমান হইলেন। প্রজাগণের শোকাশ্রুনীরে ধরাবক্ষ অভিষিক্ত হইতে লাগিল। রাজ্যময় বিলাপধ্বনি। সকলের চক্ষে বারিধারা। চারিদিকে কেবল হাহাকার। অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এ সময়ে মদালসা কোথায়? এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে? সে কথা বলিতে রসনা আড়ষ্ট হয়; হৃদয় শতধা হয়। স্বামীর কণ্ঠভূষণ তাঁহার নিধন সংবাদ বহন করিয়া আসিয়াছে। মদালসার মস্তকের কিরীট আজ খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি লতার ন্যায় যে তরুকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, আজ সেই তরু

শত্রুর তীক্ষ্ণ কুঠারে ছেদিত হইয়াছে। পতিপ্রাণা সতী তবে এই ভারবহ জীবন আর ধারণ করেন কিরূপে? সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। সব শেষ হইল। শেষ নিঃশ্বাস অনন্ত বায়ুতরঙ্গে বিলীন হইল। চক্ষু আর খুলিলেন না। প্রাণশূন্য দেহপিঞ্জর পড়িয়া রহিল। হায়, মায়াবীর মায়াজালে নিমেষে কি হইয়া গেল! ভীষণ প্রতিহিংসা! ভয়ঙ্কর বৈরনির্য্যাতন!

রাজা শত্রুজিৎ ক্ষত্রিয়। তাঁহার ক্ষত্রিয়ের হৃদয় আছে। সে হৃদয় পুষ্প অপেক্ষা কোমল, আবার বজ্র অপেক্ষা কঠিন! বৃথা মোহে অভিভূত হইলেন না। সম্মুখ-সংগ্রামে মৃত্যুই ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তবে পুত্রের জন্য শোক করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন কেন? ঋতধ্বজ মুনিগণকে রক্ষা করিতে করিতে সেই গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পতিপ্রাণা মদালসা স্বামীর অনুসরণ করিয়াছেন। সমস্তই ক্ষত্রিয়োচিত হইয়াছে। রাজা শত্রুজিৎ সতীর পরিত্যক্ত দেহ অবলোকন করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বীতশোক হইয়া, সমীপবর্ত্তী অমাত্যবর্গ এবং জনসমূহকে বলিলেন, দৈহিক সম্বন্ধের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া, কাহারও রোদন করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র বা পুত্রবধূ কাহারও নিমিত্ত আমার শোক করা বিধেয় নহে। উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়াছেন বলিয়া উভয়েই অশোচনীয়। ঋতধ্বজ আমারই নিয়োগানুযায়ী দ্বিজগণকে রক্ষা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা ধীমানের উচিত নহে। যে দেহ নিশ্চয়ই স্থায়ী নহে, আমার পুত্র যখন সেই দেহ মুনিদিগের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর শোক করিবার কি আছে? আর এই সৎকুলসম্ভূতা ললনা যখন স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, তখন ইঁহার জন্যই বা কেন শোক করি? স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর অন্য দেবতা নাই। ইনি স্বামি-বিয়োজিতা হইয়া যদি জীবিত থাকিতেন, তবে সকলের শোকের বিষয়ীভূতা হইতেন। কিন্তু স্বামীর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া যখন সেই মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন ইনি পণ্ডিতগণের অশোচনীয়া। যে নারী স্বামীর নিধন হইলেও জীবন ধারণ করে, সেই শোকযোগ্যা। ইনি ভাগ্যবতী, তাই স্বামিবিয়োগজনিত শোকানলে ইঁহাকে দগ্ধ হইতে হইল না।

রাজমহিষী শোক সংবরণ করিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন, রাজন্, মুনিদিগকে রক্ষা করিতে করিতে সন্তান নিহত হইয়াছে, ইহাতে আজ যেরূপ সুখী হইয়াছি, মাতা বা ভগিনী কাহারও দ্বারা এপ্রকার সুখী হইতে পারি নাই। যাহারা শোকযোগ্য আত্মীয় বান্ধবগণের নিমিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতি দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহাদের মাতা বৃথা সন্তানজননী। যাহারা সাধু সজ্জনদিগের জন্য অকাতরে জীবন দান করে, তাহারাই মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহার নিকট অর্থী, মিত্র ও অরাতিগণ পরাঙ্মুখ হয় না, তাহার দ্বারাই পিতা পুত্রবান্ বলিয়া খ্যাত হন এবং মাতা বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পুত্র যখন,

সংগ্রামে নিহত হয় অথবা শত্রুজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখনই স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশের সফলতা লাভ হইয়া থাকে।

রাজমহিষী নীরব হইলেন।

অনন্তর রাজা শত্রুজিৎ পুত্রবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং স্নান করিয়া পুত্রের উদ্দেশে উদকাঞ্জলি দান করিলেন।

এদিকে পাপাত্মা তালকেতু সেইরূপ যমুনাজল হইতে উত্থিত হইয়া, রাজপুত্রকে বলিতে লাগিল, হে ভূপালসুত, আমি আপনার দ্বারা কৃতার্থ হইলাম। আপনি এই স্থানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার অভিলষিত বরুণের যজ্ঞ কার্য্য আমার মায়া দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এখন আপনি গমন করুন।

তখন রাজপুত্র মায়াবী তালকেতুকে প্রণাম করিয়া গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী সেই তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া পিতৃনগরে প্রতিগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

কমলকুটীর। গণেশপ্রসাদ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহিলা উকিল—যশোহরের স্বর্গীয় প্যারীমোহন গুহের কন্যা শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম, এ, বি, এল্ উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি আলিপুর জজ আদালতে ওকালতী করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা পত্র অনুমোদনের জন্য হাইকোর্টে প্রেরিত হইবে। অন্যান্য সভ্যদেশে মহিলাগণের এই অধিকার আছে। কিন্তু ভারতের মহিলাগণের মধ্যে এই অধিকারের জন্য এই প্রথম আবেদন। মহিলাগণের স্বভাবের সঙ্গে এই বৃত্তি কতটা সামঞ্জস্য লাভ করিবে তাহা বলা বড় শক্ত। ওকালতীতে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের অনেকেই সাধারণতঃ বলেন, ওকালতী ব্যবসায়টা সহজ সরল হৃদয়ের ধর্ম্ম নহে; অনেক সময়েই ইহা নানা জটিলতায় জড়িত থাকে। প্রেমপূর্ণ সরল হৃদয়ের এ পথে গতি দেখিলে কেমন যেন প্রাণে লাগে। তবে বর্ত্তমান কালে এইরূপ কয়েকটা প্রেমপূর্ণ সরল চিত্তের স্পর্শে যদি ওকালতী ব্যবসায়টা সহজ সত্য হইয়া আসে, তবেই দেশের পক্ষে মহা কল্যাণ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—গত ৪ঠা এপ্রেল পূর্ব্বাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকার সময় ভারতের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড স্ত্রী ও কন্যাচতুষ্টয় সহ বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনে ভারতবাসীমাত্রেই প্রাণের অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। বোম্বাই নগরে তিনি অনেক আশার কথা বলিয়াছেন। তিনি এদেশের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার পিতা ও পিতামহ বোম্বাইর সৈন্যদলে কাজ করিতেন। তিনিও এদেশে ইতিপূর্ব্বে ১৬ মাস সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি,

ভারতীয় রাজন্যবর্গ, প্রধান প্রধান নায়কগণ এবং প্রজা সাধারণের অটল রাজভক্তির সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভগবানের নিকট আমাদের কায়মনপ্রাণে এই প্রার্থনা, তাঁহার কার্য্যকালে এদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হউক এবং এদেশবাসীর রাজভক্তি অটুট ও অক্ষয় থাকুক।

সংক্রামক ব্যাধি—কিছুদিন হইল, মাণিকতলা মেইন রোডের পাঁচুদাস নামক এক ব্যক্তি তাহার বালিকা স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করে। স্ত্রী ইহাতে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিল। একদিন রাত্রি নয়টার সময়ে আহার শেষ করিয়া পাঁচু শয়ন করে। কিঞ্চিৎ পরে বালিকা বধূ ও তাহার শাশুড়ীও আহার শেষ করিল। তখন বালিকা এক কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিখানা কাপড় সুদৃঢ়রূপে শরীরে জড়াইয়া কেরোসিন দিয়া ভিজাইল। তৎপরে সে দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া আপনার অঙ্গে আগুন লাগাইয়া ছুটিয়া স্বামীর শয্যায় গমন করিল। বারাণ্ডায় থাকিয়া শাশুড়ী এই কাণ্ড জানিতে পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া কোঠায় প্রবেশপূর্ব্বক আগুন নিবাইলেন, স্বামী স্ত্রী দুইজনকেই আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে নেওয়া হইল। স্ত্রী রাত্রি পৌনে চারিটায় এবং স্বামী ৪॥০ টায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার পানিহাটীর পাটবাড়ী অঞ্চলে ১৮ বৎসর বয়সের এক বালিকা কাপড়ে কেরোসিন মাখাইয়া অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে। এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিলে কাহার না মনে দুঃখ হয়। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে আত্মহত্যাও সংক্রামক ব্যাধির মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে!

(সঞ্জীবনী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমরা আর এক বৎসর মহিলাগণের সেবা করিয়া ধন্য হইলাম। এজন্য প্রেমময় শ্রীহরির চরণে আমরা কৃতজ্ঞ। এবং যাঁহারা লেখা ও অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, সেই সকল গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলের নিকটও কৃতজ্ঞ। আমাদের ক্ষীণশক্তি, ক্ষীণ আয়োজন; তাহাতে অবশ্য নানা ত্রুটী হইয়াছে, অর্থের অভাবে সময় মত প্রতি সংখ্যা বাহির হইতে পারে নাই; কিন্তু পাঁচ মাসের মুদ্রাঙ্কণব্যয় ধার রাখিয়া বৎসরের ভিতরেই যে সব সংখ্যা বাহির করিবার সুযোগ হইল, ইহাতে কতকটা সফলতা মনে করিতেছি। আমরা এবৎসর গ্রাহকগণের নিকট যেরূপ সাহায্যের আশা করিয়াছিলাম, তদনুরূপ সাহায্য পাই নাই। পাইলে এই ঋণজালে জড়িত হইতে হইত না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দাম যাহা বাকী ছিল, তাহা বাদ দিয়া কেবলমাত্র এই এক বৎসরের দামটা চাহিয়াও অনেকের কাছে এখনও পাই নাই। আশা করি, সকলে মহিলার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন এবং দেয় মূল্যটা অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত করিবেন। সম্পাদক।